মাকড়সা - আতঙ্ক

পত্র ভারতী

মাকড়সা-আতঙ্ক

অদ্রীশ বর্ধন
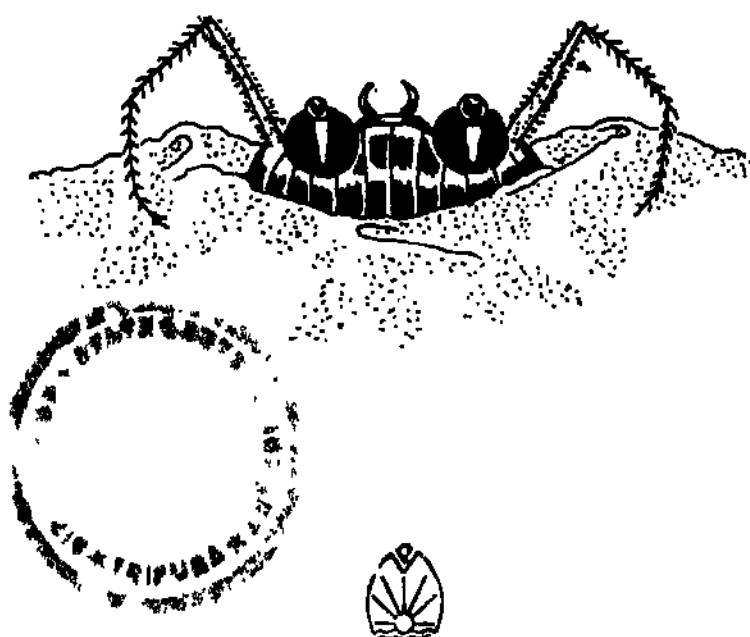
পত্র ভারতী

৩/১ কলেজ রো

কলকাতা ৭০০ ০০৯

MAKARSHA ATANKA
by
Adrish Bardhan

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

ওঙ্কারনাথ

*পত্র ভারতীর পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস,
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত। কম্পোজিং : প্রিন্ট ও কম্প।*

পুত্রবধূ রঞ্জনাকে

অদ্রীশ বর্ধন

শুরুর আগে . . .

আটপেয়ে মাকড়সাদের কাণ্ডকারখানাকে ম্যাজিক বলেই মনে করতো গ্রীক দেশের মানুষ। গল্পও বানিয়েছিল - এককালে নাকি মাকড়সা ছিল ভারি মিষ্টি একটা মেয়ে, বোনাবুনির কাজে তার জুড়ি ছিল না। স্বর্গের এক দেবীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসেছিল সেই মেয়ে ! দেবী ভয়ানক রেগে গেলেন। আস্পর্ধা তো কম নয় ! ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিলেন মেয়েটার হাতের কাজ। মনের দুঃখে গলায় ফাঁস দিয়ে মরতে গেল মেয়েটা। দেখে রাগ জল হয়ে গেল দেবীঠাকরুণের। তিনি ফাঁসির দড়িকে বানিয়ে দিলেন মাকড়সার জাল, মেয়েটিকে বানালেন মাকড়সা।

সেই থেকে বুনেই চলেছে মাকড়সা। বোনাবুনির কাজে আজও তার জুড়ি নেই এই পৃথিবীতে। তবে হ্যাঁ, প্রায় ৪০ হাজার প্রজাতির মাকড়সাদের সব জাতের মেয়েদেরই একটা বিচ্ছিরি অভ্যাস আছে - ছেলেদেব ধরে খেয়ে ফেলে। মানুষ-মেয়েদেব মতো তারা রঙচঙে নয় — উল্টে মাকড়সা-ছেলেরাই হয় রঙবেরঙের, নাচেও ভাল, কিন্তু গুণপণায় মাকড়সা-মেয়েদের ধারেকাছেও আসতে পারে না বলেই শেষ পর্যন্ত যেতে হয় মেয়েদের পেটে।

বিচিত্র এই মাকড়সারা যেদিন তাদের আশ্চর্য বাহাদুরি দিয়ে গোটা পৃথিবীকে কব্জা করবে, সেদিন কি হবে ? মানুষ যাবে মাকড়সার পেটে ... জিইয়ে রাখবে, গোলাম বানিয়ে রাখবে, খিদে পেলে জ্যান্ত ... খাবে।

... কড়সা তো আর পোকা নয়, মানুষ তো নয়ই, অমানুষের চাইতেও ... দুপেয়ে মানুষরা কি পারবে আটপেয়েদের সঙ্গে ?

... ন কি হবে ? . . .

... তবড় দুঃস্বপ্নেও যা ঘটে না, তাই ঘটবে। এবং সেই সব ঘটনা ... পড়তে মাথার চুল খাড়া হয়ে যাবে

... ই আগেভাগেই সাবধান করে দেওয়া গেল। ভয় পাওয়ার ইচ্ছে ... এ কাহিনী পড়া যেতে পারে, নইলে নয়।

... বধান ! মাকড়সাকে সাবধান !

অদ্রীশ বর্ধন

... লকাতা

□ এক □

গর্তের মুখে চাপা দেওয়া পাথারটার ফাঁক দিয়ে ভোরের কনকনে হাওয়া ফিস্‌ফিস্‌ করে গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়তেই ফাটলে কান পাতল নিপুল। মনের সমস্ত শক্তি জড়ো করল কানের পর্দায়।

আর তখনি কানে ভেসে এল খুব আবছা একটা আওয়াজ। বালির ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একটা বড় পোকা। উট মাকড়সা নিশ্চয়। আওয়াজের ধরনটা সেইরকম। মহাপেটুক। দিনরাত খেয়েই চলেছে। খিদে না থাকলেও খাবে। যতক্ষণ না পেট ফুলে উঠে চলবার ক্ষমতা হারাচ্ছে, ততক্ষণ খেয়েই যাবে। আধখাওয়া শিকার ফেলে রেখেই বিদ্যুৎবেগে দৌড়াবে নতুন শিকার দেখলেই।

নিপুল ভুল করেনি। মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে কান খাড়া করলেই ওর মাথার মধ্যে পট করে একটা আলো জ্বলে ওঠে। খুব ছোট্ট আলো। মাথার ভেতরটা তখন একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। অনেক দূরের খুটখাটি আওয়াজও তখন ও স্পষ্ট শুনতে পায়।

ফাটল দিয়ে উঁকি দিতেই দেখা গেল দানব মাকড়সাকে। লোমশ পিপে-দেহ চকচক করছে রোদ্দুরে। প্রকাণ্ড চোয়ালে ঝুলছে একটা আধ-খাওয়া গিরগিটি।

চকিতে দৃষ্টিপথ থেকে সরে গেল চলন্ত বিভীষিকা। কানে ভেসে এল শুধু ইউফোরবিয়া ক্যাকটাসের ডালপালায় হাওয়ার শব্দ।

নিপুল কিন্তু নিশ্চিত হয়েছে। পেটুক উট মাকড়সা যেখান দিয়ে হেঁটে যায়, সেখানে জ্যান্ত প্রাণী কেউ থাকে না। বিছে আর বাঘা গুবরেও নেই ধারে কাছে।

হাত দিয়ে বালি সরিয়ে পথ করে নিল নিপুল। উপোষী শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল গর্তের বাইরে। দিগন্তে সূর্য উঁকি দিচ্ছে। রাতের ঠাণ্ডায় বালি এখনও কনকনে। পঞ্চাশ গজ দূরে দেখা যাচ্ছে ক্যাকটাস ঝোপের তলায় ওয়ারু গাছের সবুজ পাতা। ঠিক যেন একটা কাপ। সারা রাত ধরে শিশির জমা হয়েছে কাপে।

এই শিশির চুমুক দিয়ে খাবে বলেই পুরো একটা ঘন্টা কাঠ হয়ে শুয়ে থেকেছে নিপুল। গর্তেব খোঁদলে অবশ্য জল আছে। পিঁপড়েদের সংগ্রহ কবা জল। মরুভমিব ওপরকার বালি থেকে পঞ্চাশ ফুট নিচে খোঁদলে জমা রয়েছে সেই জল একটু লালচে রঙের। স্বাদ খনিজ জলের মতন। সে তুলনায় ওয়ারু গাছের কাপের জল অমৃত বললেই চলে। কিনারায় ভাসছে ববফেব কৃস্ট্যাল।

হাঁটু গেড়ে বসে কাপে ঠোঁট ঠেকালো নিপুল। এক চুমুকেই কাপ খালি করে দিতে পারত। কিন্তু রেখে দিল অর্ধেকটা।

তার কারণ আছে। সব জল খেয়ে নিলে ওয়ারু গাছ বাঁচবে কি করে? তারও তো জল চাই। ওই তো সরু সরু শেকড়– বালির গভীরে ঢোকবার ক্ষমতা নেই। জল নিতে হয় আকাশ থেকে—সারা রাত ধরে। সারা দিনের গরম সামলায় সেই জল দিয়ে।

ঠাণ্ডা জলে ক্লান্তি কেটেছে নিপুলের। পেশীগুলো আর তেমন আড়ষ্ট হয়ে নেই। আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত। সোনালী যুগের কথা মনে পড়ছে। সে যুগে জলের অভাব ছিল না। মানুষ ছিল পৃথিবীর প্রভু। পোকামাকড়ের মত মরুভূমির গর্তে লুকিয়ে থাকতে হত না।

স্বর্ণযুগের স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেছিল বলেই প্রাণটা বেঁচে গেল নিপুলের। কাপ থেকে মুখ সরিয়ে আনতেই চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল বেলুনটাকে। ভেসে আসছে ধূসর পুব দিগন্ত থেকে। দূরত্ব এখনও

আধ মাইল। কিন্তু আসছে খুব জোরে—এই দিকেই।

আতঙ্ক অবশ করে তুলেছিল নিপুলের সর্বাঙ্গ পলকের জন্যে। মূহূর্তের মধ্যে সামলে নিল নিজেকে। আতঙ্ক হটিয়ে দিল মন থেকে। আগেই মনটা প্রশান্ত ছিল বলেই তা সম্ভব হল।

একটুও নড়ল না নিপুল। হামাগুড়ি দিয়ে একইভাবে বসে রইল সত্তর ফুট উঁচু অরগ্যান-পাইপ ক্যাকটাসের ছায়ায়।

বেলুন ভেসে এল ঠিক ওর ওপরেই। মনকে শিথিল করে দিয়েছে নিপুল। বেলুনের কথা ভাবছে না। বেলুনে যে করাল প্রাণীটা বসে রয়েছে, তার কথাও ভাবছে না। মনকে ভয়মুক্ত রেখেছে বলেই ভয়ের বিচ্ছুরণ বাইরে ধেয়ে যাচ্ছে না। বেলুনের কদাকার প্রহরীও তা টের পাচ্ছে না। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির ঢেউ ধেয়ে আসছে বেলুন থেকে। নিপুল নিজে ভয় পেলে এই ইচ্ছাশক্তি এখুনি ওকে অসাড় করে তুলবে— পায়ের তলায় গর্তের মধ্যে যারা অঘোরে ঘুমাচ্ছে, তারাও নিস্তার পাবে না।

তাই নিশ্চল দেহে পড়ে রইল নিপুল। দমকে দমকে বৈরী ইচ্ছাশক্তির ধারা বয়ে গেল ওর ওপর দিয়ে—ওর চারধার দিয়ে—এতটুকু প্রতিক্রিয়া দেখাল না নিপুল। দেখালেই শব্দহীন আর্তনাদের মতই তা ধেয়ে যেত ওপর দিকে। বেলুনের মূর্তিমান আতঙ্ক নিমেষে টের পেয়ে যেত ঠিক কোনখানে বালির সঙ্গে নিজের শীর্ণ শরীরটাকে মিশিয়ে রেখেছে নিপুল। যে কোনো প্রাণীর ভেতর থেকে আতঙ্ককে খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিতে পারে এরা– এই কদাকার বিভীষিকারা।

নিপুল তাই ওয়ারু গাছের কাপে জমা জলের মতই নিস্তরঙ্গ স্থির করে রাখল নিজের মনটাকে।

কু-ইচ্ছের ঢেউ কিন্তু ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়েছে নিপুল-এর বাবাকে—গর্তের মধ্যে। কাঠ হয়ে শুয়ে রয়েছে। পাশে নিপুলকে না দেখে উৎকণ্ঠা চরমে উঠেছে।

সেকেন্ড কয়েক পরেই কুটিল ইচ্ছের প্রবল স্রোতটা সরে গেল আশপাশ থেকে। সিকি মাইল দূরে মরুভূমির ওপরে পৌঁছে গেছে বেলুন। ইচ্ছাশক্তি সার্চলাইটের মত সামনের দিকের মরুভূমির প্রতিটি বালুকণা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। নিথর হয়ে শুধু দেখে গেল নিপুল।

তারপরেই হুড়মুড় করে নেমে এল গর্তের মধ্যে। বাবার ঘুম আগেই ভেঙেছিল। এখন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসে পড়ল সামনের দিকে ঝুঁকে।

—কি হয়েছে রে ?

মাকড়সা বেলুন।—ফিস্‌ফিস্ করে বললে নিপুল।

—কোথায় ?

—চলে গেছে।

—তোকে দেখেছে ?

—মনে তো হয় দেখেনি।

লম্বা নিশ্বাস ফেলে উৎকণ্ঠাকে হাল্কা করে দিলে নিবল—নিপুলের বাবা। গুটি গুটি গর্তের মুখে গিয়ে উঁকি দিল বাইরে। সূর্য এখন দিগন্ত ছাড়িয়ে উঠে এসেছে। আকাশ নীলচে-সাদা। মেঘ নেই।

নিপুলের দাদা নিজয় বলে উঠল কোণ থেকে,—ব্যাপার কী ?

শিকারে বেরিয়েছে, খুঁজছে আমাদের।—ফিসফিস করে বললে নিবল।

কারা শিকারে বেরিয়েছে, তা আর বলতে হল না নিজয়কে। মারণ-মাকড়সা টহল দিচ্ছে। এর চাইতে ভয়ানক ব্যাপার আর হতে পারে না। গুটি কয়েক মানুষ গর্তে ঢুকে টিকিয়ে রেখেছে প্রাণগুলোকে। মারণ-মাকড়সা বেরিয়েছে তাদের টেনে বের করতে। নিজয় জানে, মানুষকে শিকার করে খায় বিছে, বাঘা গুবরে এবং আরও অনেক পোকামাকড়। কিন্তু মারণ-মাকড়সা টেক্কা মেরেছে সবাইকে। গুবরে আর মশা মহাশত্রু সন্দেহ নেই—মাঝেমধ্যে তাদেরকেও খতম করা যায়। কিন্তু মারণ-মাকড়সারা অজেয়। পৃথিবীর অধীশ্বর তারা। একটা মারণ-মাকড়সা খুন হলেই তার বদলা নেওয়া হবে নির্মম ভাবে।

নিপুল-এর ঠাকুরদার বাবা জোমো জানে প্রতিহিংসাটা হয় কি ধরনের। মাকড়সাদের গোলাম হয়ে থাকতে হয়েছিল তাকে সারা জীবন—স্বচক্ষে দেখেছে লোমহর্ষক সেই দৃশ্য। জনা তিরিশেক মানুষের দল খতম করেছিল মাত্র একটা মারণ-মাকড়সাকে। হাজার হাজার মাকড়সা বেরিয়ে পড়েছিল তাদের খোঁজে। দশ মাইল লম্বা লাইন করে তারা কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে এসেছিল মরুভূমির ওপর দিয়ে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে এসেছিল শ'য়ে শ'য়ে মাকড়সা বেলুন। ধরে নিয়ে গেছে তিরিশ জনকেই—ছেলেমেয়ে শুদ্ধ। মৃত্যু-রাজার শহরে নিয়ে গিয়ে সবার সামনে তাদের গায়ে স্নায়ুবিষ ফুঁড়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। পক্ষাঘাতে অনড় হয়েছে প্রত্যেকেই। জ্ঞান টনটনে থেকেছে—কিন্তু চোখের পাতা আর চোখের মণি ছাড়া শরীরের কোনো প্রত্যঙ্গ নাড়াতে পারেনি।
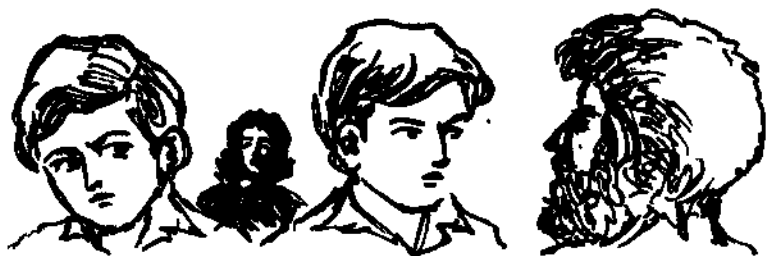
এই অবস্থায় তাদের একটু একটু করে অনেকদিন ধরে খাওয়া হয়েছে। দলপতি বেঁচে ছিল দু'সপ্তাহ। শেষের দিকে তার হাত পা কিচ্ছু ছিল না, ধড়টাকে খুবলে খুবলে খাওয়া হয় সব শেষে।

মাকড়সারা মানুষদের কেন যে দু-চক্ষে দেখতে পারে না, কেউ তা জানে না। জোমো নিজেও জানে না। সারা জীবন মাকড়সাদের গোলামি করেও জানতে পারেনি। শেষকালে পালায় মাকড়সাদেরই একটা বেলুনে চেপে।

জোমো শুধু জানে, শিকারী মাকড়সারা সারা জীবন ধরে শুধু মানুষ শিকার করে যায়। সংখ্যায় তারা কয়েক লক্ষ। মানুষের মাংস সবচাইতে উপাদেয় ওদের কাছে—নইলে এভাবে মানুষ খুঁজে বের করবে কেন ?

যুক্তিটা কিন্তু অকাট্য নয়। কেন না, জোমো নিজেই দেখেছে, মাকড়সারা মানুষ পোষে।। মানুষই মানুষের সংখ্যা বাড়িয়ে নেয় ওদের তদারকিতে। মোটাসোটা মানুষ ওদের সবচেয়ে বেশি পছন্দ। এমন নধর হবে যাতে হাঁটিতে চলতেও না পারে।

তা যদি হবে তো মরুভূমির উপোষী মানুষ শিকারের জন্যে কেন এভাবে এরা হন্যে হয়ে টহল দিচ্ছে দিনের পর দিন ? নিশ্চয় অন্য কোনো কারণ আছে। মানুষকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে মাকড়সারা সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

নিপুলের মা উঠে পড়েছে। ওর দুই ছোট বোন মারু আর রুবা ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করেছে। ওরা জানে না বাইরে কারা টহল দিচ্ছে।

চোখে চোখে কথা হয়ে গেল বাপ ছেলেদের মধ্যে। বড় ছেলে উঠে গিয়ে গর্তের ভেতর দিকে নিয়ে এল একটা লাউ-এর খোলা। ভেতরে মিষ্টি পায়েসের মত থকথকে বস্তু। অর্টিস গাছের রস। এর গুণ অনেক। একটু খেলেই গাঢ় ঘুম আসে। মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

প্রত্যেকেই খেল একটু একটু করে। বাচ্চাদুটো ঘুমিয়ে পড়ল পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। ঘুমোবে সারাদিন।

নিপুলের নিজেরও মাথা এখন শান্ত। ও বেশি খায়নি ইচ্ছে করেই। জিভ দিয়ে চেটেই ছেড়ে দিয়েছে। ঘুমোলে চলবে না। মাকড়সাদের

গতিবিধি দেখা দরকার।

আর ঠিক তখনি সন্ধানী সার্চলাইটের মতই সন্ধানী আতঙ্ক ঢুকে পড়ল গর্তের মধ্যে। ঠিক যেন সশরীরে মাকড়সারাই হানা দিয়েছে গর্তের মধ্যে। পাতাল ঘরের প্রত্যেকেই ভয়ে সিঁটিয়ে গেল তক্ষুনি। নিপুলের নিজের মাথাও গোলমাল হয়ে গেল সেই মুহর্তে। অদৃশ্য এই আতঙ্ক অবয়বহীন, অথচ করাল কুটিল। আর একটু হলে চেঁচিয়ে উঠত ওর মা। হাত বাড়িয়ে মুখে থাবা চেপে ধরল বাবা। মাকড়সাদের এই এক আশ্চর্য ক্ষমতা—দূর থেকেই মানুষকে ভয় পাইয়ে দিতে পারে--তারপর ভয়ের উৎস টের পায়—ধরে নিয়ে যায় শিকারদের।

ভয়ানক এই মুহূর্তে চকিতে মাথা সামলে নিল নিপুল। মনটাকে জড়ো করলো একটা বিন্দুতে। পট করে মাথার মধ্যে জ্বলে উঠল আলো।

এখন ও নির্ভয়। ধীর, স্থির, শান্ত।

ভয়ের ঘূর্ণপাক সরে গেল গর্ত থেকে। ঠিক যেন একটা গুমগুম আওয়াজ মিলিয়ে গেল দূর হতে দূরে।

এই হল শুরু। সারাদিনে মোট পাঁচবার টহল দিয়ে গেল মারণ-মাকড়সারা। দুপুরে এল একবার—কয়েক'শ বেলুন নিয়ে। বিকেলে একবার। সন্ধ্যে হওয়ার ঠিক আগে আর একবার। ঝাঁকে ঝাঁকে বেলুন প্রায় মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে গেল এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তের দিকে। এত নিচে নেমে বেলুন উড়ে যেতে কখনো দেখেনি নিপুল। মাটি থেকে মাত্র বারো ফুট ওপরে ভাসছে প্রতিটি বেলুন। লাইন দিয়ে উড়ে আসছে পাশাপাশি। যাতে একজনের সন্ধানী ভয় যদি ধরতে না পারে বিবরের মানুষদের খবর, অন্যটা পাবে।

কিন্তু অটল রয়ে গেল এই কটি মানুষ। অর্টিস গাছের রস তাদের ঝিমিয়ে রেখেছিল সারাদিন।

শুধু নিপুল মাথার মধ্যে মুহুর্মুহু আলো জ্বালিয়ে অচঞ্চল রাখল নিজেকে। ফলে, অদ্ভুত একটা আত্মতৃপ্তি বিভোর করে রাখল মাথার কোষগুলোকে। মাকড়সাদের দিশেহারা অবস্থা ও বুঝতে পারছে। মাকড়সাদের মনের খবরও যেন ওর মনে পৌঁছে যাচ্ছে।

আচমকা রাত নামল মরুভূমিতে। মাকড়সা রাতে আর আসবে না। গর্তের মধ্যে জ্বলে উঠল পোকার তেল দিয়ে তৈরি প্রদীপ।

ভাঙা গলায় বললে নিপুলের বাবা, -কালকেই পালাতে হবে এ অঞ্চল থেকে।

মাথা হেলিয়ে সায় দিল নিপুল। পালাতেই হবে কেননা, নিপুল নিজেই খুন করেছে একটা মারণ-মাকড়সাকে।

তাই ওরা প্রতিহিংসা নেবেই।

নতুন এই গর্তে দশ বছর আগে এসে ঢুকেছে নিপুলের ফ্যামিলি। তার আগে থাকত বিশ মাইল দক্ষিণে—বিশাল উপত্যকার একটা গুহার মধ্যে। পাথর দিয়ে গুহার মুখ বন্ধ করে রেখেও গরম ঠেকানো যেত না। একশ ডিগ্রী টেম্পারেচার উঠে যেত দিনের বেলা। খাবার পাওয়া যেত না। পেটের জ্বালায় হন্যে হয়ে ঘুরতো ব্যাটাছেলেরা। জোমো খান কয়েক ছাতা বানিয়ে নিয়েছিল মাকড়সা বেলুনের কাপড় দিয়ে। এই বেলুনে করেই চম্পট দিয়েছিল জোমো। ছাতার দৌলতে দুপুরের হল্কা সইয়ে নিতে পেরেছিল। প্রতিটি দিন বড় কষ্টে কেটেছে। অনাহারে, পিপাসায় আর জ্বলন্ত উনুনের মত রোদ্দুরের আঁচে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

একদিন গুহা থেকে অনেক দূরে খুব ভোরের দিকে শিকারী পুরুষরা দেখেছিল পেল্লায় আকারের একটা বাঘা গুবরে সাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল পাতাল-বিবরে। উপত্যকার গুহার তুলনায় এ জায়গাটাকে স্বর্গ বললেই চলে। ওয়ারু গাছ যখন রয়েছে, তষ্ণার জল পাওয়া যাবে। রয়েছে সবুজ অ্যালফা ঘাস। তার মানে, রাত হলেই হাল্কা কুয়াশার আকারে টেনে আনবে আর্দ্রতা। অ্যালফা ঘাস পাকিয়ে দড়ি দিয়ে ফাঁদ তৈরি হবে। ঝুড়ি আর মাদুরও তৈরি হবে এই ঘাস থেকে। ফোস্কা গুবরের খোলা থেকে তেল বের করা যাবে—জ্বলবে রাতের পিদিম।

রোদের আঁচে এলিয়ে পড়েছিল শিকারী পুরুষরা। তাই তক্ষুনি বাঘা গুবরেকে ঘাঁটাতে সাহস হয়নি। বাঘা গুবরের চোয়ালের জোর তো কম নয়, যে-কোনো মানুষের হাত বা পা দু-টুকরো করে দিতে পারে।

এত জোর দৌড়োয় যে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। খেতেও পারে বটে। নিপুল নিজেই দেখেছে, বারোটা অতিকায় মাছিকে কব্জায় এনে আধ ঘন্টার মধ্যে পেটে পুরেছে একা একটা বাঘা গুবরে।

কাজেই দরকার একটু সময় আর একটু বুদ্ধি। তবেই দখল করা যাবে ওর গর্ত।

প্রথমেই তাই জড়ো করতে হয়েছে তাড়া তাড়া আলকাতরা গুল্ম। তারপর জড়ো করেছে অ্যালফা ঘাস।

গর্ত থেকে মুখ বাড়িয়ে বাঘা গুবরে দেখেছে এদের কাণ্ড। একবার ধারালো চোয়াল বাড়িয়ে ছোঁ মেরে কেটে নিতে গেছিল নিবল-এর হাত। বেঁচে গেছে অল্পের জন্যে।

ক্ষিপ্রগতি এই গুবরেকে খতম করার পথ একটাই : গর্ত থেকে বেরোতে হয় তাকে হাঁচরপাচর করে। বিদ্যুতের মত তখন ধেয়ে যেতে পারে না। ঠিক সেই সময়ে ঘায়েল করতে পারলেই গর্ত এসে যাবে দখলে।

দল বেঁধে ক্যাকটাসের ছায়ায় লুকিয়ে থাকতে হয়েছে অনেকক্ষণ। বিকেলের দিকে নিবল বলেছিল,—এবার চড়াও হওয়া যাক।

প্রথমেই জ্বালিয়েছিল অ্যালফা ঘাসের স্তূপ। সূর্য তখন এমনই গনগনে যে আগুনের শিখা দেখা যায়নি। তার পরেই আলকাতরা গুল্মে আগুন দিতেই ঘন কালো ধোঁয়া উঠে গেল ওপর দিকে। ভয়ে কাঠ হয়ে গেছিল প্রত্যেকেই। টহলদার বেলুন যদি দূর থেকে দেখে ফেলে এই ধোঁয়া—তাহলেই সর্বনাশ !

তাই কাজ সারতে হয়েছে ঝড়ের বেগে। জ্বলন্ত গুল্মের শেকড় ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বল্লমের খোঁচায় গর্তের মুখের পাথর সরিয়েই ভেতরে ছুঁড়ে দিয়েছে নিবল। সরে এসেছে চকিতে।

আধ মিনিটও গেল না—বেরিয়ে এল বাঘা গুবরে। হকচকিয়ে গেছে ধোঁয়া আর আগুনে। চোখে ভাল করে দেখতেও পাচ্ছে না।

ঠিক এই সময় দু'হাতে ধরা প্রকাণ্ড পাথরটা ছুঁড়ে দিয়েছিল নিবল। পাথর আছড়ে পড়েছিল বাঘা গুবরের গলায়—ড্যাবডেবে চোখ দুটোর ঠিক নিচে।

কয়েক গজ দূরে আছড়ে পড়ে চিৎ হয়ে মিনিট পাঁচেক ছটফট করে নিস্তেজ হয়ে গেছিল গর্তের মালিক।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গর্তের বাইরে বেরিয়ে এসেছিল বাগা গুবরের বিধবা বউ। সঙ্গে ছ'টা বাচ্ছা। প্রত্যেকেই দু-ফুট লম্বা। তড়িঘড়ি গর্ত থেকে বেরিয়েই চম্পট দিয়েছিল দূরের শুকনো খালটার দিকে।

এরাও আর তাড়া করেনি।

কিছুক্ষণ পরে গর্তে নেমেছিল শিকারী পুরুষরা। এখন আর সেখানে ধোঁয়া নেই। গর্ত বেশ গভীর। বাঘা ! গুবরের গর্ত তো এত গভীর হয় না। পাতাল গুহা বললেই চলে। গুবরের লালা আর বালি দিয়ে দেওয়াল শক্ত করা হয়েছে। দুটো বাচ্ছা গুবরে গর্তের একদম ভেতর দিকে মরে

পড়ে রয়েছে—বিষাক্ত ধোঁয়া সহ্য করতে পারেনি। দুটোকেই টেনে বাইরে ফেলে দিয়েছিল নিবল। গুবরের মাংস অখাদ্য। তারপর গর্তের মুখে পাথর টেনে দিয়ে ঘুমিয়েছিল সারারাত।

উপত্যকার গুহা থেকে অন্য সবাই চলে এসেছিল পরের দিন।

□ দুই □

সেই থেকে এখানেই আছে নিপুল। দশ বছর কাটিয়েছে এখানে। কত অ্যাডভেঞ্চার করেছে। প্রত্যেকটা বিপদ ওর ভেতরকার অজানা শক্তিকে একে-একে জাগিয়ে দিয়েছে।

নইলে মারণ-মাকড়সাকে মারবার দুঃসাহস ওর হত না !

সাত বছর বয়েসে এই গর্তে এসে বড় একা-একা কাটাতে হয়েছে নিপুলকে। শহুরে মানুষের কাছে জায়গাটা নিছক মরুভূমি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু মরুবাসীদের কাছে তা নন্দনকানন বললেই চলে। ঝোপঝাড়ে বিস্তর কাঁটাওয়ালা ফল—সাবধানে তুলে এনে খোসা ছাড়ালে খেতে চমৎকার। একরকম বাদামী গাছের ডালপালাগুলো দেখতে শুকনো নলের মত—কিন্তু মট করে ভাঙলেই ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে জলের মত রস—একটু তেতো বটে—কিন্তু খেতে খারাপ নয়।
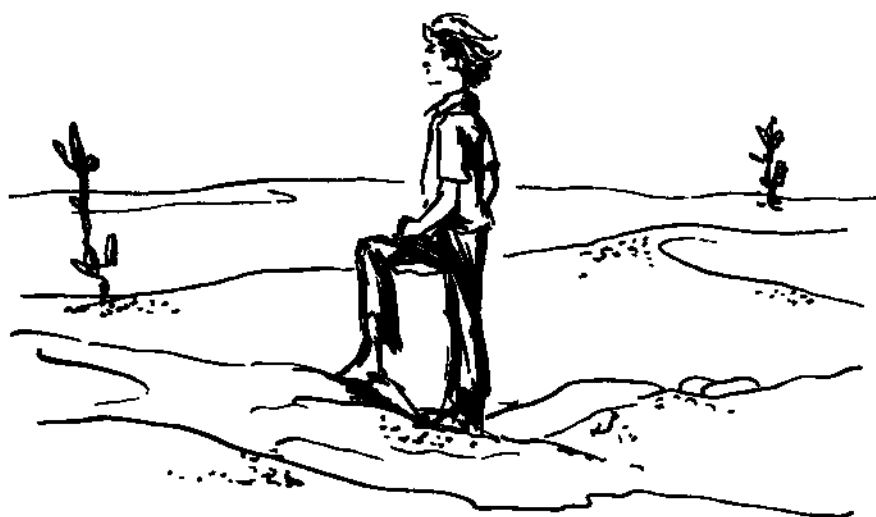
নিপুলকে গর্ত থেকে বেরোতে বারণ করলেও ও তা শুনতো না। বড়দের পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেলেই গর্তের মুখ থেকে ডালপালা আর পাথর সরিয়ে বেরিয়ে আসত বাইরে। একটা উঁচু পাথরে বসে অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখত—কত রকমের বিদঘুটে বিকট পোকামাকড় আর প্রাণী যাচ্ছে আশপাশ দিয়ে। মাঝে মাঝে অতিকায় কেঁচো গর্তের মধ্য ঢুকতে এলেই পাথর ছুঁড়ে মারত নিপুল। গর্ত বেওয়ারিশ নয় বুঝতে পেরে সরে পড়ত হানাদাররা।

সব ছেলেমেয়েদের মতই নিপুলের বিপদবোধ ছিল একটু বেশি মাত্রায় এবং অবাস্তব রকমের। প্রথম প্রথম চলমান কিছু দেখলেই আঁৎকে উঠতো। পরে বুঝল, বেশির ভাগ মরুপ্রাণী অজানাকে ভয় পায়—ঝামেলা এড়িয়ে যেতে চায়। মনে সাহস এল তখন থেকে। একদিন তো মরতে মরতে বেঁচে গেছিল বেশি সাহস দেখাতে গিয়ে।

গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে ভেবেছিল ওয়ারু কাপ থেকে এক চুমুক জল খেয়ে এলেই তো হয়। গিয়ে দেখলে, কাপ খালি। নিশ্চয় কোনো মরুপ্রাণী ওর আগেই তেষ্টা মিটিয়ে গেছে।

তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে চেয়েছিল মরুভূমির দিকে। আরও ভাল করে মরুভূমি দেখবে বলে ক্যাকটাস ঝোপের মধ্যে দিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বালুপ্রান্তরের এপাশে। কয়েকশ গজ দূরে রয়েছে আর একটা ক্যাকটাস ঝোপ। রকমারি চেহারার। ঝুলছে থোকা থোকা ফল। যাবার ইচ্ছে হয়েছিল তক্ষুণি—এইটুকু বালি পেরিয়ে গেলেই হয়—ভয়টা কী ?

এই পর্যন্ত ভাবতে না ভাবতেই বিপদের কালো ছায়া উঁকি দিয়েছিল ওর মনের মধ্যে। স্পষ্ট মনে হয়েছিল, সামনের রোদ্দুরে জ্বলা ওই সমতল বালুকাভূমি বিপদহীন নয়।

কেন বিপদহীন নয়, তা জানবার জন্যেই একটা পাথর তুলে নিয়ে গায়ের জোরে ছুঁড়ে দিয়েছিল নিপুল। পাথরটা বালি ঘষটে লাফিয়ে উঠতে না উঠতেই ভয়ঙ্কর একটা আকৃতি চকিতে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেছিল বাতাসে।

গা ছমছম করে উঠেছিল নিপুলের। বালি তেতে গিয়ে হাওয়া কাঁপছে বলেই কি মরীচিকা দেখল আচমকা ?

এতটুকু না নড়ে পুরো একটা ঘন্টা ঠায় বসে থেকেছিল নিপুল। মসৃণ মরুবুকে আর সেই চকিত বিভীষিকা আবির্ভূত হয়নি। তবুও নিপুলের মনে হয়েছে জায়গাটা নিরাপদ নয় মোটেই। কুটিল করাল কিছু

একটা বিরাজ করছে সেখানে—তাকে চোখে দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু সে রয়েছে।

এক ঘন্টা পরে উল্টো দিকের ক্যাকটাস ঝোপ থেকে গুটি গুটি বেরিয়ে এসেছিল সবুজ-কালো ডোরাকাটা একটা গুবরে। নিরীহ প্রাণী। ব্যাঙের মত মুখ বের করে খুঁটে খুঁটে খাবার খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে এল বিপদ-থমথমে বালির ওপর দিয়ে। আর ঠিক তখনি চোখের পলক ফেলার আগেই একটা গোলমত ঢাকনি খুলে গেল বালির ওপরে—নিমেষে ঠিকরে এল একটা কালো কুৎসিত আকৃতি—খপ করে গুবরেকে ধরেই ফের মিলিয়ে গেল বালির গর্তে—গর্তের মুখ বন্ধ হয়ে গেল গোল ঢাকনি নেমে আসতেই।

গুবরেকে কামড়ে ধরে গর্তে ঢুকতে তার খুব সামান্য সময় লেগেছিল। চোখের পাতা ফেলতেও অত সময় লাগে না। কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যেই নিপুল দেখে ফেলেছিল নারকীয় চেহারাটা।

কালো লোমওয়ালা একটা মাকড়সা। শুধু ধড়খানাই প্রায় তিনফুট।

দিন সাতের পরের ঘটনা। বাবার ভয়ে গর্তের মধ্যেই শুয়েছিল নিপুল ঘাসের বিছানায়। গর্তের মুখে চাপা দেওয়া ডালপালার মধ্যে অল্প আলো আসছে ভেতরে। চারদিক নিস্তব্ধ। আচমকা মনে হল কেউ যেন ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

বুকটা ধড়াস করে উঠলেও চুপ করে শুয়ে রইল নিপুল। ওর মন বলছে, চোরা-গর্তের মাকড়সা বেরিয়ে এসেছে শিকারের খোঁজে। গর্তের মুখে দাঁড়িয়ে দেখছে ভেতরের দিকে।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় নিপুল। বল্লম বাগিয়ে পাথরের ধাপ বেয়ে উঠে গেল গর্তের মুখে।

না, কেউ কোথাও নেই। হয়ত ছিল একটু আগে ওর পায়ের আওয়াজ শুনেই পালিয়েছে।

ফিরে এসে ঘাসের বিছানায় ঘন্টাখানেক শুয়ে থাকতে না থাকতেই আবার ধক্ করে উঠেছিল বুকের ভেতরটা।

এবার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে গর্তের ভেতরেই। কে যেন দেওয়াল আঁচড়াচ্ছে।

কাঠ হয়ে শুয়ে থেকেও আওয়াজ থামেনি। বরং বেড়েই চলেছে। বল্লম বাগিয়ে পা টিপে টিপে আওয়াজ শুনে শুনে গর্তের ভেতর দিকে ঢুকেছিল নিপুল। গর্ত তো নয়—লম্বা সুড়ঙ্গ। একদম শেষে দেওয়াল ফুঁড়ে আওয়াজটা বেরিয়ে আসছে ঘনঘন

দেওয়ালে কান পেতেছিল নিপুল।

প্রথমে মনে হয়েছিল, শিকারী মাকড়সাটা নয় তো ? নিজের গর্ত থেকে এই গর্তে ঢোকার ফিকিরে আছে বালির মধ্যে দিয়ে সুড়ঙ্গ বানিয়ে।

মনটাকে গুটিয়ে এনে এক জায়গায় করতেই পট করে মাথার মধ্যে জ্বলে উঠেছিল আলো। চোখে না দেখলেও ও যেন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল বালির তলার প্রাণীটাকে।

মাকড়সা নয়—একটা গুবরে। খুঁটে খুঁটে খাবার খুঁজছে।

আচমকা আওয়াজ সরে গেছিল দূর হতে দূরে। তার কারণ আছে। মনে মনে নিপুল তাকে বলেছিল,—দূর হ ! দূর হ ! দূর হ !

নিপুলের হুকুম শুনেছিল সে। অদৃশ্য আদেশ মাথা পেতে নিয়ে সরে গেছিল অন্যদিকে।

আর সেই প্রথম নিপুল সমস্ত অন্তর দিয়ে বুঝেছিল—আর পাঁচটা মানুষের মতন সে নয়। সে বিপদের গন্ধ পায়, চোখ বুজে মাথার মধ্যে দূরের বিপদকে দেখতেও পায়। অদ্ভুত একটা আত্মবিশ্বাসে ভরে উঠেছিল ভেতরটা। নিজেকে মনে হয়েছিল অনেক বড়, অনেক শক্তিমান--বাবা, দাদা, ঠাকুর্দার বাবার চেয়েও ক্ষমতাবান।

যেদিন থেকে হাঁটতে শিখেছে নিপুল, সেদিন থেকেই ওকে শেখানো হয়েছে আকাশের দিকে চোখ রাখতে। মাকড়সা বেলুন দেখামাত্র যেন বালির মধ্যে নিজেকে পুঁতে ফেলে। অতটা সময় যদি না থাকে, তাহলে যেন বালির দিকে চোখ নামিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। সমস্ত মন দিয়ে যা হয় কিছু একটার দিকে তাকিয়ে থাকলেই হয়— মাকড়সা বেলুন যেন মনে ঠাঁই না পায়।

কারণটা বুঝিয়ে বলেছিল বাবা। মারণ-মাকড়সাদের চোখের জোর ধারালো নয় মোটেই। দূরের জিনিস দেখতে না পেলেও, শিকার ধরে স্রেফ ইচ্ছাশক্তি দিয়ে। ভয়ের গন্ধ ধরে ধরে এগিয়ে আসে লুকিয়ে থাকা শিকারের দিকে।

ভয়ের গন্ধ ! ভয়ের আবার গন্ধ হয় নাকি ?

বাবা তখন বুঝিয়ে দিয়েছিল, ভয় জিনিসটাও বাতাসে কম্পন তোলে—আর্তনাদের কম্পনের মতন। মারণ-মাকড়সাদের অনুভূতি তা টের পায়। তাই মাথার ওপর দিয়ে মাকড়সা বেলুন উড়ে গেলেও যদি মন আর দেহকে নিথর নিষ্কম্প রাখা যায়, মাকড়সারা টের পায় না। ভয় পেলেই মাকড়সাদের কাছে তা লাফঝাঁপের সমান। ঠিক চলে আসবে সেখানে।

কাজটা কঠিন। কিন্তু হাজার প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে প্রাণটাকে টিঁকিয়ে রাখতে গিয়ে নিপুলকেও শিখতে হয়েছে মনকে নিমেষে নিস্তরঙ্গ করার বিদ্যে। শেখবার পর অবশ্য কঠিন মনে হয়নি। বরং মন সংহত করতে গিয়ে আরও একটা ক্ষমতা এসে গেছে মনের মধ্যে। আশ্চর্য সেই ক্ষমতার গল্প বলা হবে একটু পরেই।

মা ছাড়া আর কেউ মাকড়সাদের গল্প বলত না নিপুলের কাছে। তাও চেপে চেপে বলত। মাকড়সারা কেন ধরে নিয়ে যায় মানুষদের? গোলাম বানিয়ে রাখবে বলে। আর কিছু বলত না। আড়ালে আবডালে কিন্তু ফিসফাস করত বড়দের সঙ্গে। সেইটুকু শুনেই নিপুল জেনেছে, মাকড়সারা শুধু মাংসখেকো নয়—ভয়ানক নিষ্ঠুর।

ছোট বোন মারু যখন জন্মালো, নিপুলের বয়স তখন এগারো। বোন এসে যেতেই বড় হয়ে গেল নিপুল। শিকারে বেরোনো শুরু করল বড়দের সঙ্গে। প্রচণ্ড গরমে রোজ কুড়ি মাইল হাঁটতে গিয়ে জিভ বেরিয়ে যেত বেচারীর—তবুও হাজারো বিস্ময় ভুলিয়ে দিত পথের কষ্ট। সবচেয়ে বড় কথা, বহুদূর থেকে চোখে না দেখেই ও বুঝতে পারত—বিপদ কোথায় ঘাপটি মেরে আছে।

বড়রাও জেনে গেছিল নিপুলের বিপদ টের পাওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতার ব্যাপারটা। কোন দিকে মাকড়সা বেলুন দেখা দিতে পারে, অথবা বালির ফাঁদে শিকারী মাকড়সা ওৎ পেতে রয়েছে কোথায়, অথবা হলদে সরু-বিছে হুল উঁচিয়ে ঘাপটি মেরে রয়েছে ঠিক কোনখানে—আগে থেকেই টের পেত নিপুল।

একদিন স্রেফ এই ক্ষমতার জন্যেই প্রাণে বেঁচে গেল পুরো দলটা।

কাঁটা গাছের একটা ঝোপের দিকে যাচ্ছিল বড়রা। আগের দিন সেখানে পাখি ধরার ফাঁদ পেতে গেছিল। সেদিন কিন্তু নিপুল যেতে চাইল না। ভেতর থেকে একটা বাধা যেন ওকে সামনে যেতে দিতে চাইছে না—পেছনে ঠেলে দিচ্ছে।

ওর গোঁ দেখে সেই মুহূর্তে কেউ আর কাঁটাঝোপে ঢোকেনি। কাঁটা ঝোপকে বেড় দিয়ে চলে গেছিল ক্যাকটাস ফলের ঝোপে। ফেরবার সময় দেখা গেল ঝোপের আতঙ্ককে।

তখন সন্ধ্যা নামছে। একটা গঙ্গাফড়িং আচমকা বিশ ফুট লাফ মেরে কাঁটাঝোপের ভেতর থেকে ঠিকরে গেল আকাশের দিকে। কিন্তু পালাতে পারল না। তার চাইতেও ক্ষিপ্র একটা দানব পোকা খপ্ করে বর্ম-দাঁড়া

বাড়িয়ে শূণ্যপথেই লুফে নিল তাকে। বর্মের গায়ে বড় বড় বল্লমের ফলার মত খোঁচা। মুখখানা অতিকায়। চোখদুটো বিশাল এবং নিষ্প্রাণ। চোয়াল ভর্তি দাঁতের সারি। এক কামড়েই ফড়িং -এর টুটি কেটে দিয়ে তখুনি বসে গেল তেল খেতে। দশ ফুট উঁচু সেই দানব-পোকাকে দেখে তো মনে হল ফড়িং -এর জাতভাই। কিন্তু মুখখানা বিছের মত নয় মোটেই, আরও কুটিল আর কদাকার।

পা টিপে টিপে দূরে সরে গেছিল পুরো দলটা। খাওয়া শেষ হলে যদি পেট না ভরে ? তেড়ে এলে বাঁচার উপায় তো নেই।

গর্তে ফিরতেই জোমো সব শুনে বললে,—বেঁচে গেছো। ফড়িং -ই বটে। তবে একশ গজ লাফিয়ে যেতে পারে !

খাবারের সন্ধানেই না এত বিপদ। তা নিপুল যদি আগে ভাগেই বিপদের গন্ধ পেয়ে সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিতে পারে, তাহলে উত্তরে গেলেই তো হয়।

কিন্তু উত্তরেই যে মারণ-মাকড়সাদের ঘাঁটি। মাঝে আছে অবশ্য একটা সমুদ্র। মরুভূমির ঠিক পরেই। বেলুনে চেপে জোমোর বাবা এই সমুদ্র পেরিয়েই এসে পড়েছিল মরুভূমির ভেতরে।
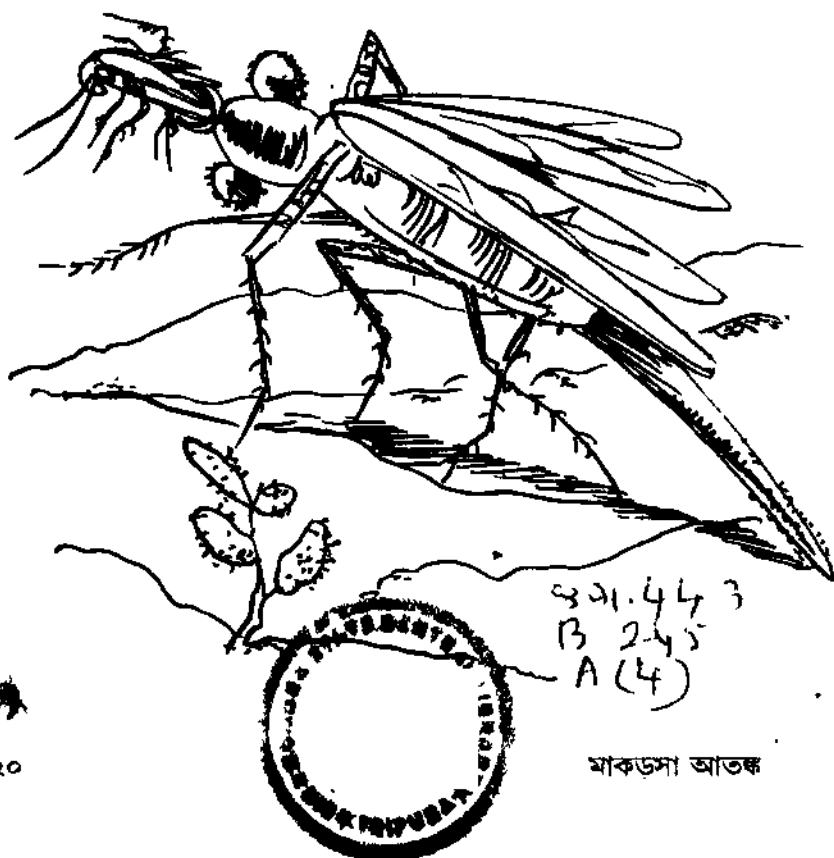
জোমোর মুখেই শুনেছিল নিপুল, উত্তর-পুবে আছে ঘন জঙ্গল। খাবারের অভাব নেই সেখানে। মানুষকেও খাবার বানানোর মত গাছপালা আর পোকামাকড় আছে বিস্তর।

নিপুলের মন টেনেছিল কিন্তু উত্তর দিকেই। যেদিকে রয়েছে সমুদ্র। পথে পড়বে অনেক খাবার। না খেয়ে এভাবে এত কষ্ট করে মরুভূমির গর্তে থাকতে সে রাজি নয়।

তাই একদিন দাদা আর বাবাকে নিয়ে নিপুল রওনা হল উত্তর দিকেই।

কিন্তু পথকষ্ট যে এমন অসহ্য হবে তা তো বুঝতে পারেনি। ভোরবেলা বেরিয়ে দুপুর নাগাদ নিপুল বুঝল আর হাঁটতে পারছে না। বালির বদলে এদিকে লালচে পাথর বেশি—তেতে আগুন হয়ে রয়েছে। খাদ পড়ছে বিস্তর। পেরিয়ে যেতে গিয়ে প্রাণ গলায় এসে ঠেকছে। দাদা আর বাবা মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে ওর অবস্থা দেখে। সঙ্গে না আনলেই ভাল হত।

চোখে যখন ধোঁয়া দেখছে, ঠিক সেই সময়ে ওর মনকে জড়ো করল একটা বিন্দুতে—কষ্টবোধের জায়গা সেখানে নেই।

সঙ্গে সঙ্গে শরীর থেকে যেন আলাদা হয়ে গেল নিপুল। শরীর ধুঁকছে, কিন্তু ওর নিজের আর কোনো কষ্ট নেই। বড় হাল্কা, বড় ঝরঝরে মনে হচ্ছে নিজেকে। আশ্চর্য সেই অনুভূতি নিপুলের জীবনে সেই প্রথম। কষ্ট না পেলে জানতেও পারত না নিমেষে শরীরের কষ্ট থেকে নিজের মনকে আলাদা করে নেওয়ার ক্ষমতাও ওর আছে।

ওর শান্ত মুখের দিকে শুধু অবাক হয়ে চেয়েছিল নিবল আর নিজয়—ওর বাবা আর দাদা। দিনে দিনে আরো কত ক্ষমতা দেখাবে পুঁচকে এই ছেলেটা!

আবার শুরু হয়েছিল পথচলা। এবার দাদা আর বাবার চাইতেও জোরে হেঁটেছে নিপুল। নিপুলের স্পষ্ট মনে হচ্ছে, আরও সামনের দিকে গেলে টাটকা জল পাওয়া যাবে। সে জল খাওয়া যায়। বাবা আর দাদাকে তা বলতে চোখ কুঁচকে শুধু ওর দিকে চেয়ে থেকেছে। মুখে কিছু বলেনি।

দিনের শেষে সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছেছিল ঝিরঝিরে একটা নদীর ধারে। চওড়ায় হাত ছয়েক। হাঁটুজল লালচে রঙের। তলার পাথরও লাল। ওদের পায়ের আওয়াজে নিঃশব্দে এদিকে ওদিকে সরে গেছিল কতকগুলো প্রাণী। ছ'টা করে ঠ্যাঙ তাদের। লম্বায় দু-ফুট। মুখগুলো তেকোনো। কিন্তু হিংস্রতা নেই। চোয়ালের হাড়টা ঠিক গোঁফের মত।

সভয়ে বলেছিল নিপুল,—এরা কারা ?

হেসে বলেছিল ওর বাবা, - পিঁপড়ে।

—কামড়ে দেবে নাকি ?

—না। সামনে দাঁড়া, তাহলেই বুঝবি।

নিজয় ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা লাল পিঁপড়ের সামনে। পিঁপড়ে ওদের ভ্রুক্ষেপ করেনি। পাশ কাটিয়ে চলে গেছে যেদিকে যাচ্ছিল সেই দিকেই।

সারাদিন ধরে রোদে জ্বলা শরীরগুলোকে ঠাণ্ডা করার জন্যে তিনজনেই ঝাঁপ দিয়েছিল নদীর জলে। শরীর মন যখন জুড়িয়ে এসেছিল, তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে চারদিক।

পাথার ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। একটা খোঁদলে ঢুকে বসেছিল তিনজন।

অমনি মা-কে মনে পড়েছিল নিপুলের। সমস্ত মন দিয়ে মা-এর কথা ভেবেছিল।

পট করে মাথার মধ্যে জ্বলে উঠেছিল আলো।

মা যেন সামনেই রয়েছে। খুবই উদ্বিগ্ন মুখ। ভাবছে এদের তিনজনের কথা।

সারা দিনের অ্যাডভেঞ্চারের কথা বলে গেছিল নিপুল। আরামে স্নান সেরেছে জীবনে এই প্রথম—এই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উদ্বেগ মিলিয়ে গেল মায়ের মুখ থেকে।

মায়ের মুখটাও মিলিয়ে গেল নিপুলের মন থেকে। আবার চেষ্টা করলে দেখতে পেত—সে আত্মবিশ্বাস ওর তখন এসে গেছে।

কিন্তু সে চেষ্টা করেনি। বড় ঘুম পাচ্ছিল।

ভোর হলে পাখির গানে ঘুম ভাঙল নিপুলের। তাল মিলিয়ে কটমট খিটমিট করছে পোকারা। বাবা আর দাদারও ঘুম ভেঙেছে। কিন্তু এখনও আলিস্যি ভাঙছে।

নিপুলের তর সইল না। নতুন জায়গা ওকে যেন চুম্বকের মত টানছে। হামাগুড়ি দিয়ে এল খোঁদলের মুখে। ডালপালা সরাতে যাচ্ছে, এমন সময় চোখ গেল আকাশের দিকে।

[illegible] ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে একটা মাকড়সা বেলুন। [illegible] পেছন দিকে। এত কাছ থেকে মাকড়সা বেলুন [illegible] নিপুল।

[illegible]ক উঠলেও মনকে শান্ত করেছিল তক্ষুনি। নিজেও নড়েনি। দাদা [illegible]র বাবাকে কিচ্ছু বলেনি। বললেই তো আঁৎকে উঠবে। মারণ-মাকড়সা

ঠিক টের পাবে।

নিজের মনকে তাই তালা চাবি দিয়ে একদৃষ্টে উড়ন্ত বেলুনকে দেখে গেছিল নিপুল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দিগন্তে হারিয়ে গেল আকাশের বিভীষিকা।

দাদা আর বাবাকে ডেকে বলল নিপুল।

যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। ভয়ে সিঁটিয়ে গেল দুজনেই। ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল বাবা,--কত নিচে নেমেছিল ?

—ওই তো গাছের ওপর।

—কপাল ভালো তোর।

দাদা বলেছিল,--শুধু ওর নয়, আমাদের তিন জনেরই।

খোঁদল থেকে বেরিয়ে তিনজনেই আগে মাথা ডুবিয়ে স্নান করেছিল নদীর জলে। জলের কি অপচয় ! মরুভূমির সেই গর্তে একফোঁটা জলের জন্যে গাছের রস কেড়ে খেতে হয়--আর এখানে তা হুড়হুড় করে বয়ে যাচ্ছে। আসছে দূরের পাহাড় থেকে। পাহাড়ের ওদিকে আরও গাছ, আরও জঙ্গল। তারপর সমুদ্র। তারপর মারণ মাকড়সাদের শহর।

☐ *তিন* ☐

স্নান সেরে উঠে গাছের ফল খেতে গিয়ে ঘটল বিপদ। কোন্ ফলটার কি স্বাদ। কোনটা বিষাক্ত আর কোনটা সুখাদ্য—তা তো জানা নেই। এদিকে খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

ঠিক তখনি দেখা গেল কালো পিঁপড়েদের। মানুষ সমান উঁচু এক-একজন। সার বেঁধে যাচ্ছে। প্রত্যেকের মুখে একটা করে গোল ফল।

দাদার পেছন পেছন গেছিল নিপুল। সবার পেছনে বাবা। ফলের গাছ থেকে কালো পিঁপড়েরা সামনের দুটো শুঁড় দিয়ে ফল ছিঁড়ে নিচ্ছে। এদের তিনজনের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। একই গাছ থেকে এরাও ফল ছিঁড়েছিল। ভেতরে লাল শাঁস, জল আর ছোট ছোট বীচি। পিঁপড়েরা কিচ্ছু বলেনি। নিজেদের নিয়েই ওরা ব্যস্ত।

ফেরবার পথে কত অদ্ভুত প্রাণী দেখেছিল। মরুভূমির গর্তে যার কৈশোর কেটেছে, ক্যাকটাস ফল আর বালি-ইঁদুর খেয়ে যে বড় হয়েছে—এ জায়গা তার কাছে স্বর্গ বলে মনে হয়েছে। দানবিক ফড়িং গুলো মানষের মত লম্বা—কিন্তু নিরীহ।

সন্ধ্যের দিকে যখন অবসন্ন দেহগুলো নিয়ে মরুভূমির গর্তে ঢুকছে তিনজনে—দূরে দেখা গেল দুটো মাকড়সা বেলুনকে।

হুড়মুড় করে গর্তে ঢুকে পড়ে মাথার ওপর পাথর টেনে দিয়ে ফাটলে চোখ রেখেছিল নিপুলের বাবা। বেলুন মাথার ওপর দিয়ে ভেসে গেছিল। গর্তের প্রত্যেকেই তখন মন শান্ত করে চুপচাপ চেয়ে রয়েছে মেঝের দিকে। মারণ-মাকড়সাদের বেলুন মিলিয়ে গেছিল দূরে।

ঘাসের বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে সারাদিনের গল্প শুরু করেছিল নিপুল।

গল্প শেষ হতেই মিমির ছেলে সুনা বলেছিল,—খুব সুন্দর জায়গা ?

নিপুল বলেছিল,—ইচ্ছে করছে ওখানেই থাকি এখন থেকে।

ধমকে উঠেছিল জোমো,—মরবার ইচ্ছে হয়েছে ?

—কেন ? অত জল আর খাবার যেখানে, সেখানে মরব কেন ?

—মাকড়সা বেলুন ওখানে টহল দেয় সকাল-সন্ধ্যে, দিনে দুবার। এখানে আসে মাসে দু'বার। আগে যেখানে ছিলাম মরুভূমির মধ্যে—সেখানে কখনোই যায় না।

মিমি বলে উঠেছিল,—আমি যেখানে থাকতাম, সেখানে আসে সপ্তাহে একবার।
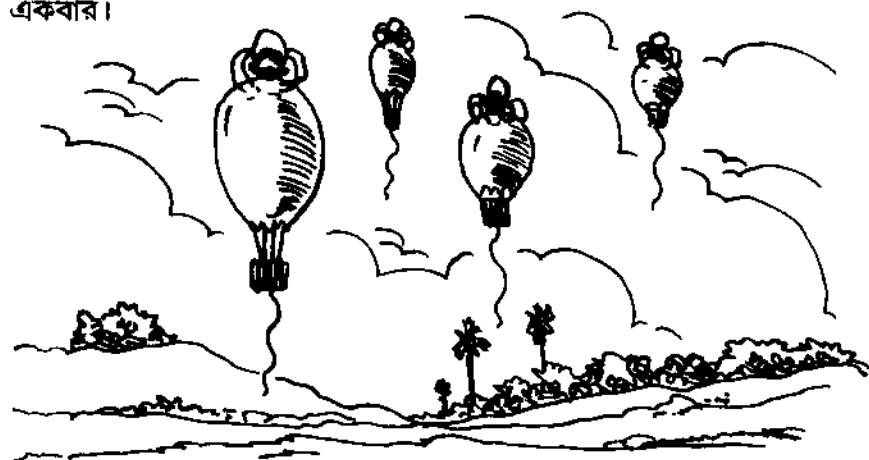
অবাক হয়ে গেছিল নিপুল। মিমি তো একসঙ্গেই থাকে—ছোটবেলা থেকে তাই দেখেছে।

জিজ্ঞেসও করে ফেলেছিল,—আগে থাকতে ? কোথায় ?

—দক্ষিণ দিকে—ধ্বংসস্তূপের মধ্যে।

—ধ্বংসস্তূপ ! সেটা কী ?

—আগে মানুষ থাকতো সেখানে—মাকড়সাদের রাজত্ব শুরু হওয়ার

আগে।

মাকড়সাদের রাজত্ব শুরু হওয়ার আগে—উঠে বসেছিল নিপুল।

—কিংবদন্তী তাই বলে। মানুষ আগে পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে। হাজার হাজার মানুষ থাকত ধ্বংসস্তুপে।

হাজার হাজার !—চোখ বড় হয়ে যায় নিপুলের। অসম্ভব !

—উই-এর ঢিবি দেখেছিস ? ওই রকমভাবে থাকতো মাটির ওপর। এখন সব ভেঙেচুরে পড়ে আছে।

—তুমি থাকতে সেখানে ?

—হ্যাঁ। সেখান থেকেই তো এলাম এই বিচ্ছিরি জায়গায়। —ঘেন্নায় নাক কুঁচকোয় মিমি।

—এখান থেকে কতদূরে ?

—তিন দিনের পথ।

—মাকড়সাদের হামলা নেই সেখানে ?

—এখন তো সব ভেঙেচুরে গেছে। আগে মাকড়সারা এত বড় ছিল না।

—কত বড় ছিল ?

—শুনেছি আমার এই মুঠোর মত ছোট্টা। মানুষকেই ভয় পেত।

—আমাকে নিয়ে যাবে ?

কড়া গলায় দাবড়ানি দিয়েছিল জোমো,—না ! সুখে আছিস এখানে—মরবার পালক উঠেছে দেখছি !

কিন্তু এমন একটা ঘটনা ঘটল, যারপর মিমিকে নিয়েই যেতে হল রহস্যময় সেই ভাঙাচোরা দেশে।

মাকড়সারা আগে ছিল মুঠোর মত ছোট্ট—এখন কিন্তু পেল্লায় সাইজের প্রত্যেকেই। কেন ?

পরের দিন কথাটা জোমোকে জিজ্ঞেস করেছিল নিপুল।

জোমোর পা তখন বেশ টাটিয়েছে। চার বছর ধরে ভুগছে এই পা নিয়ে। তাই আজকাল খাবার খুঁজতে যায় না। শরীর ম্যাজম্যাজ করছে এই অজুহাতে নিপুলও আজ এগোয়নি। ইচ্ছে ছিল জোমোর পেট থেকে কথা বের করা।

প্রশ্নটা শুনে জোমো চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। নিপুলও চেয়ে রইল একদৃষ্টে। মনের মধ্যে দাপাদাপি চলছে প্রশ্নটার ঃ মাকড়সা এককালে ছোট্ট ছিল—বড় হয়ে গেল কিভাবে ?

অনেকক্ষণ পরে বলেছিল জোমো.—জানি না।

মানুষকে ভয় করতো—এখন করে না কেন ?—নিপুলের প্রশ্ন।

—তাও জানি না। তবে মানুষও কম অত্যাচার করেনি।

—অত্যাচার ! কিভাবে ?

—অনেক লড়াই হয়ে গেছে মানুষ আর মাকড়সায়। মানুষ-রাজা মরুভূমির মধ্যে দূর্গ বানিয়ে থেকেছে—ঠেকিয়েছে মাকড়সাদের আক্রমণ। তারপর মাকড়সাদের শহর পুড়িয়ে দিয়েছে আর এক মানুষ-রাজা। এর পরের রাজা মরুভূমিব মাকডসাদের শিখিয়ে পড়িয়ে গুপ্তচর বানিয়ে পাঠিয়েছে মারণ-মাকড়সাদের দেশে।

সে কি !—নিপুল এবার বোঝে, কেন মাকড়সারা এত ঘেন্না করে মানুষদের। তারপর মানুষ বুঝি হেরে গেল ?

—নিজেদের দোষে হেরে গেল। মানুষই শিখিয়ে দিল মাকড়সা-রাজাকে কিভাবে মানুষের মনের চিন্তা বুঝতে হয়।

—শিখিয়ে দিল ? কিভাবে ?

—একজন পণ্ডিত মানুষেব বড ইচ্ছে হয়েছিল রাজা হওয়ার। তাকেই রাজা করার লোভ দেখিয়ে মাকডসা-রাজা শিখে নিল কিভাবে মানুষের কথা টের পাওয়া যায। মানুষদের ধরে এনে সামনে দাঁড করিয়ে মাকডসা-রাজা তার মনের খবর জানত। তাবপব জিজ্ঞেস করে জেনে নিত সব মিলছে কিনা। সবশেষে খেয়ে ফেলত মানুষটাকে।

—পিশাচ !

—পিশাচ তো বটেই। তবে ওবা মানুষ খায় আর একটা কারণে। মানুষকে পুরোপুবি হজম না করলে নাকি মানুষের শক্তি পাওয়া যায় না।

—তারপর ?

—মানুষের মনের খবর যে জানতে পারে তার শক্তি মানুষের চেয়ে বেশি তো হবেই। একদিন হাজার হাজার কালো মাকড়সা গভীর রাতে আচমকা হানা দিল মানুষদের শহরে। হাজার হাজার মানুষকে খেয়ে ফেলল কালো মাকড়সারা। দখলে আনল মানুষদের সমস্ত কিছু—শুধু একটা জিনিস ছাড়া। একটা সাদা মিনার।

—সাদা মিনার ! মানে ?

—খু-উ-ব লম্বা একটা বাড়ি। আকাশ ছোঁয়া জিনিস। গাছের চাইতেও উঁচু। কিছুতেই দখলে আনা গেল না মিনারটাকে। গোলন্দাজ গুবরেদের

দিয়ে মিনার উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেও যখন কিছু হল না, তখন প্রাণের ভয়ে এগিয়ে এল এক বুড়ি। তার স্বামীকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে বলবে কিভাবে ঢোকা যায় সাদা মিনারে। পণ্ডিত লোকটা ডেকে নিয়ে এল বুড়ো স্বামীকে। এককালে সে সর্দার ছিল এই শহরেরই। সে বললে সাদা মিনারে ঢুকতে হলে মনকে তৈরি করতে হবে সেইভাবে। মিনারের দেওয়ালটাই একটা তালা। চাবি হচ্ছে মানুষের মন। দেওয়ালের মধ্যে মনের চাবি ঢুকিয়ে দিলেই দেওয়াল গলে যাবে ধোঁয়ার মতন। তার আগে একটা ম্যাজিক লাঠি ঠেকাতে হবে দেওয়ালে। তবেই দেওয়াল শুনবে মনের হুকুম।

—তারপর ? তারপর ?

সর্দারের কাছেই পাওয়া গেল ম্যাজিক লাঠি। কিন্তু তার মনের হুকুম শোনেনি সাদা মিনারের দেওয়াল। ম্যাজিক লাঠি ঠেকিয়েও কিছু হয়নি। পণ্ডিত বিশ্বাসঘাতক নিজেই তখন এগিয়ে গেল ম্যাজিক লাঠি হাতে। কিন্তু মিনারের দেওয়াল ছোঁওয়ার আগেই একটা অদৃশ্য শক্তির ধাক্কায় আছড়ে পড়ল মাটিতে। আবার এগোতে যেতেই ঠিকরে গেল আরও দূরে। তখন রেগেমেগে ম্যাজিক লাঠি ছুঁড়ে মেরেছিল সাদা মিনারের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বাজ ঠিকরে এসেছিল দেওয়ালের মধ্যে থেকে। ভীষণ আওয়াজে ঢুকে গেছিল পণ্ডিতের শরীরের মধ্যে। পুড়ে কালো হয়ে গেছিল তক্ষুণি। রেগেমেগে মাকড়সা-রাজা সেই থেকে মানুষদের দিয়ে গোলামি করায়।

—সেই ম্যাজিক লাঠিটা ?

—কেউ জানে না কোথায় আছে।

—মাকড়সা-রাজা মানুষের মনের খবর জানতে পারে বলেই মানুষদের হারিয়েছে। ঠিক উল্টোটা যদি হয় ?

—কি বলতে চাস ?

--মানুষ যদি মাকড়সাদের মনের খবর জানতে পারার ক্ষমতা পায়?

চোখ বড় বড় করে ধমকে উঠেছিল জোমো,—পাগল হয়ে গেলি নাকি? মাকড়সার মনের খবর পাবে মানুষ ?

—ইচ্ছে করলে পারে বইকি। সেইদিন কিন্তু মাকড়সা হেরে যাবে মানুষের কাছে ! মানুষ আবার রাজা হবে পৃথিবীর।

—নিপুল !

চেঁচিও না।—নিপুলকে যেন অন্য এক শক্তি ভর করেছে আজকে।

সমান তেজে বলে গেল গলার শির তুলে ঃ মানুষ কেন পালিয়ে বেড়াবে ? কেন পোকামাকড়ের ভয়ে লুকিয়ে থাকবে ? মাকড়সাদের মনের ক্ষমতা তো একদিনে আসেনি ? দেখোনি ওরা কিভাবে জাল পেতে শিকার ধরে? নিজে নড়ে না। দুনিয়ার সমস্ত জীব ছুটে গিয়ে শিকার ধরে। মাকড়সা কিন্তু শিকার টেনে আনে জালের দিকে। মনের জোরে টেনে আনে। মনের জোর বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে তাকে হাতিয়াব হিসেবে ব্যবহার করছে। পোকামাকড়কে যেভাবে টেনে এনে জালে ফেলে, সেইভাবে মানুষকেও ভয় পাইয়ে টেনে আনছে গর্তের বাইরে। ভয় পেলে বাতাসে কাঁপন ছুটে যায়। মরুভূমির মাকডসা জালের মধ্যে দিয়ে এই কাঁপন টের পায়। কালো মাকডসা টের পায় ওদের মন দিয়ে। সমস্ত শরীর দিয়ে।

নিপুল কখনো এত কথা বলেনি। চুপচাপ ছেলেটার মুখে আজ যেন তুবড়ি ছুটছে। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে জোমো। এত ভাবতেও পারে ছেলেটা ?

আপন মনেই বলে যায় নিপুল,—কালো মাকড়সাদের মনেব ভেতবে ঢোকবার ক্ষমতা আমিও পেতে পারি-- যদি ইচ্ছে করি।

—তুই মরবি। ওদেব ইচ্ছেশক্তিই তোকে তুলে আছাড মারবে।

সত্যি সত্যিই তাই হয়েছিল। ইচ্ছেশক্তি দিয়ে কালো মাকডসাদের রাজা নিপুলকে শূন্যে লোফালুফি করে আছড়ে ফেলেছিল মাটিতে। কিন্তু সে অনেক পরে ঘটনা।

তার আগে অবশ্য যেতে হয়েছিল মিমি-র ভাঙাচোবা মরু-দেশে।

□ চার □

সুযোগটা এল কিন্তু বড় মর্মান্তিকভাবে।

আর্টিস গাছের রস নিয়ে কথা হচ্ছিল। মন শান্ত করতে এ রসের জুড়ি নেই। কালো মাকড়স্যাদের ইচ্ছাশক্তিকে রুখে দেওয়ার মস্ত দাওয়াই এই আর্টিস রস।

কিন্তু রস আনতে গেলে যেতে হবে উত্তর-পূবের জঙ্গলে। সে বড় ভয়ানক জঙ্গল। এক্কেবারে অজানা জায়গা। জোমো নিজেও জঙ্গলে ঢোকেনি। বেলনে চেপে জঙ্গল টপকে এসেছে।

তবে শুনেছে ওই জঙ্গলেই আছে আর্টিস গাছ। দেখতে বড় সুন্দর। কাছে গেলেই কাপের মধ্যে টুপ করে গড়িয়ে পড়ে একফোঁটা রস। সে রসের গন্ধেই মাতাল হয়ে যেতে হয়। গন্ধই টেনে নিয়ে যায় গাছের দিকে। তারপর ওই একফোঁটা রসে জিভ ঠেকানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম নামে চোখে। আর্টিস গাছ তখন তাকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে মস্ত কাপের মধ্যে টেনে নিয়ে ডালা বন্ধ করে দেয়। হজম না করা পর্যন্ত ডালা খোলে না।

পোকামাকড় থেকে আরম্ভ করে ছোটখাট জন্তুও ফাঁদে পড়ে এইভাবে।

মানুষ অবশ্য অনেক চালাক। ফাঁদে পা না দিয়েও রস সংগ্রহ করতে পারে। ফাঁদ কেটে বেরিয়েও আসতে পারে—যদি খুব বেকায়দায় না পড়ে।

ছোট আর্টিস গাছ খুঁজে নেয় মানুষ। তারপর টোকা দেয় আঙুল দিয়ে। যেই গড়িয়ে পড়ে এক ফোঁটা রস, টুক করে তুলে নেয় লাউ-এর খোলায়।

পরের দিন ভোরেই রওনা হয়ে গেল নিবল, সুনা আর কাড়ু। নিপুল সঙ্গে গেছিল কিছুদূর। বাপের ধমক খেয়ে ফিরে এল গর্তে।

পরের দশ-দশটা দিন যে কিভাবে কেটেছে, তা ভাষায় বোঝানো যাবে না। নিজয়কে নিয়ে নিপুল যেতে চেয়েছিল বিপদভরা সেই জঙ্গলে—যেতে দেয়নি মা।

দশ দিন পরে একা ফিরল নিবল। যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে। চোখের চাহনি ঘোলাটে। মুখ পিঠ বুকে রক্তাক্ত ক্ষত। যেন হাজার মুখ দিয়ে রক্ত

টেনে নেওয়া হয়েছে হাজার ফুটো দিয়ে।

হাতের লাউ-এর খোলাটা এগিয়ে দিয়ে ঘাসের বিছানায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল নিবল। নিঝুম হয়ে পড়েছিল সারারাত—পরের দুটো দিন।

তারপর শোনা গেল লোমহর্ষক সেই কাহিনী।

গন্ধের নেশায় বুঁদ হয়ে আর্টিস গাছের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল সুনা আর কাড়ু দুজনেই। নিবল একা পারেনি দু'জনকে টেনে আনতে। পাথরের ছুরি দিয়ে শুঁড় কাটতে গিয়ে আরও বিপদে পড়েছিল নিবল। আষ্টেপৃষ্টে জাপটে ধরেছিল আরও শুঁড়। পাগলের মত শুঁড় কেটে ছিটকে এসে দেখেছিল সুনা আর কাড়ু দুজনকেই কাপের কোটরে ঢুকিয়ে নিয়েছে পাশের আর্টিস গাছ।

এ গাছের কাপ থেকে যতটুকু রস পাওয়া যায়, জোগাড় করেছে নিবল। কাড়ু-র বর্শায় খতম করতে হয়েছে পুরো গাছটাকে।

শেকড়ের ছোবলে আর বিষে তখন ও ধুঁকছে। টলতে টলতে হাঁটতে হয়েছে ফেরার পথে। হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল কতবার। ভেবেছিল, এই শেষ। আর্টিস শেকড়ের ছোবল যে এত প্রচণ্ড হয়, তা তো জানা ছিল না। মাংস কেটে কেটে বসে গেছে। হু-হু করে রক্ত বেরিয়ে গেছে শরীর থেকে। শুঁড় কেটে টুকরো টুকরো করার পর নিবল দেখেছে নিজেরই রক্ত—গলগল করে বেরিয়ে আসছে শুঁড়ের মধ্যে থেকে।

রক্ত জল করা এই কাহিনী কিন্তু এক নিঃশ্বাসে বলতে পারেনি নিবল। সমানে কেঁদে গেছে মিমি। রস আনতে গিয়ে গেল তারই ছেলে আর স্বামী? কাদের নিয়ে আর থাকবে সে এই পচা গর্তে ?

যাবোটা কোথায় ?—কড়া গলায় বলেছিল জোমো।

যেখান থেকে এসেছি।—ফুঁসে উঠেছিল মিমি।

—কে নিয়ে যাবে ? নিবল ধুঁকছে, আমার পায়ে ব্যথা।

আমি যাবো ? দাদাকে নিয়ে ?—লাফিয়ে উঠেছিল নিপুল।

না !—চোখ জ্বলে উঠেছিল জোমোর ঃ সঙ্গে একজন বড় না গেলে যাওয়া হবে না।

কিন্তু নিবল যে এত ভুগবে, তা কেউ ভাবেনি। এক-আধদিন নয়। পুরো দুটো বছর গেছে শরীর থেকে আর্টিস বিষ বের করতে। এই দুটো বছর সমানে ঘ্যানঘ্যান করে গেছে মিমি। তারপর আর সইতে না পেরে জোমো বলেছিল নিপুলকে,—তুই যা বাবাকে নিয়ে।

নিপুলের বয়স তখন সতেরো। পরের পর রক্ত হিমকরা অভিজ্ঞতার শুরু হল তখন থেকেই।

লটবহর নিয়ে ভোর বেলাই বেরিয়ে পড়ল নিবল, নিপুল আর মিমি। বড় স্বার্থপর মেয়ে। এতদিন যেখানে কাটিয়ে গেল, সেখান থেকে চিরকালের মত চলে যাওয়ার আগে চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও বেরুলো না।

যাওয়ার পথে একটা হলুদ বিছের ওপর মনের শক্তি পরখ করেছিল নিপুল। সারা রাত শিকারের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে ঝোপে ঢুকে বসেছিল বিছেটা। তিন জনকে দেখেই মতলব ছিল বেরিয়ে আসার। কিন্তু দূর থেকেই মনে মনে বলেছিল নিপুল—খবরদার ! বেরোলেই জখম করব- -হাতিয়ার তৈরি !

দ্বিধায় পড়েছিল বিছেটা। তারপর আর বেরোয়নি।

মনটা নেচে উঠেছিল নিপুলের। যে কোনো প্রাণীর মনের ভেতরে ঢুকে গিয়ে হুকুম চালানোর ক্ষমতাটা একটু একটু করে বেড়েই চলেছে ওর মধ্যে।

গরম প্রচণ্ড। বালি কমছে, পাথর বাড়ছে। তারপর শুরু হল ছোট টিলা। তারপর বড় পাহাড়। পাহাড় ঘুরপাক দিয়ে যেতে দেরি হবে বলে টপকেই যেতে হল।

সারারাত কাটল পাহাড়ের ওপরে—একটা গুহায়। ভোর হতেই পা টিপেটিপে পাহাড় টপকে নিচে নেমে আসতেই একটা মস্ত পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একদল মানুষ।

দূর থেকে দেখেই থমকে গেছিল নিপুল আর নিবল।

প্রত্যেকেই ভীষণ ঢ্যাঙা। সুপুরুষ। গায়ের কাপড়চোপড়ও অনেক ভালো। নিপুল আর নিবল-এর মত আধাউলঙ্গ নয়। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে নিজেকে বড় ছন্নছাড়া মনে হয়েছিল নিপুলের।

সংখ্যায় তারা দশজন। দলপতি একজন জোয়ান পুরুষ। মুখে মিষ্টি হাসি। এগিয়ে এসে সে বললে,—খবর পেয়েই দৌড়ে এসেছি।

জোয়ান পুরুষের নাম বল।

বিকেলের দিকে আবার শুরু হল পাহাড়ি পথ। বড় বড় চাঙর আর টিলা। দশজন আগে আগে যাচ্ছে পথ সাফ করতে করতে। আড়াল থেকে হঠাৎ কোনো দানবপোকা যেন বেরিয়ে এসে চড়াও না হয়।

হটাৎ পথ শেষ হয়ে গেছিল একটা খাড়াই পাথুরে দেওয়ালের সামনে। পাহাড় এখানে মসৃণ পাঁচিলের মত উঠে গেছে অনেক উঁচুতে। ঘাড় বেঁকিয়ে দেখতে হয় ওপরের চূড়া।

কিন্তু পথ কোথায় এখানে ? সামনের দলটা কিন্তু এই বিশাল পাঁচিলের সামনেই দাঁড়িয়ে হাতের বোঝা নামাচ্ছে—যেন এখুনি খুলে যাবে পাথরের পাল্লা।

হলোও তাই। অবিশ্বাস্য সেই দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাস করতে পারত না নিপুল।

বল দলছাড়া হয়ে কেন যে একটা পাথরের আড়ালে ঢুকে গেল, তা দেখবার জন্যেই পেছন পেছন গেছিল নিপুল। গিয়ে দেখল, মাটিতে হাঁটু পেতে বসে একটা বড় চাকি পাথর টেনে সরাচ্ছে বল। তলায় বেরিয়ে পড়ল একটা সরু গর্ত। খুব জোর একটা ইঁদুর ঢুকতে পারে।

কিন্তু ইঁদুরের গর্তে মুখ রেখে ওকি করছে বল ? অত জোরে কথা বলছে কেন ?

বল বলছে,—নিকু, সামা, মাদু, দরজা খোলো। আমি বল বলছি।

খুব ক্ষীণ গলায় পাতাল থেকে ভেসে এল জবাবটা—খুলছি।

চাকি পাথর টেনে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল বল। পেছন ফিরেই দেখল, চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে আছে নিপুল।

হেসে ফেলল বল। বেশ হাসে এরা।

বল বললে, —ফুটো দিয়ে বলেদিলাম আমরা এসে গেছি। নইলে দরজা খুলবে না।

চমকে উঠেছিল নিপুল একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ শুনে। পাথরের পাঁচিলের চৌকোনা খানিকটা জায়গা একটু একটু করে হেলে পড়ছে পেছন থেকে। যত হেলছে, ততই ভেতরে দেখা যাচ্ছে একটা মস্ত গহ্বর। তারপর দমাস করে বিশাল পাথরটা আছড়ে পড়ল মাটিতে। গুম গুম করে শব্দ ছড়িয়ে গেল গহ্বরের ভেতর দিকে। পায়ের তলার মাটিও কাঁপতে লাগল থরথর করে।

বল বললে,— এসো ভেতরে।

পুরো পাহাড়টা ফাঁপা। বাইরে থেকে যাকে নিরেট পাহাড় বলে মনে হয়, তার ভেতরে একটা পেল্লায় হলঘর। দেওয়ালের গায়ে জ্বলছে সারি সারি মশাল। কাঠকুটো জ্বালিয়ে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালাতে জানে নিপুল, কিন্তু এরকম অবিরামভাবে জ্বালিয়ে রাখতে হয় কি করে তা জানে না।

বিশাল হলঘর তখন গমগম করছে এদের পায়ের আওয়াজে। নিপুল বোকার মত জিজ্ঞেস ক... ফেলেছিল, -কাঠের আঁটি ওরকম জ্বলছে কেন? নিভে তো যাচ্ছে না।

আলকাতরা মাছের রসে ডুবিয়ে নিয়ে শুকিয়ে নিতে হয়। তারপর তেল-পোকার রসে ভিজিয়ে নিলেই জ্বলবে ঘন্টার পর ঘন্টা। -বলেই ঘুরে দাড়ালো বল ঃ দরজা বন্ধ করো।

দরজা বন্ধ করার কায়দাটা এবার দেখল নিপুল।

পেল্লায় চৌকোনা পাথরটা মেঝের ওপর শোয়ানো ছিল। ছ-জন ষণ্ডামার্কা লোক দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। পরনে কৌপিন ছাড়া কিছু নেই। গুলি-গুলি মাংসপেশী বেয়ে দরদর করে ঘাম নামছে। তারা একসঙ্গে ধাক্কা দিতে ভারি পাল্লা একটু একটু করে উঠে গিয়ে বসে গেল পাথুরে দেওয়ালের চৌকোনা খোপে।

পাথর তোলার গুম গুম আওয়াজে সমস্ত গহ্বর তখন কেঁপে কেঁপে

উঠছে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বল বললে,—এসো।

হতভম্ব নিপুলের হাত ধরে এগোলো নিবল। আগে আগে যাচ্ছে মিমি আর দশজন ঢ্যাঙা মানুষ। গহ্বরের শেষের দিকে একসারি চওড়া সিঁড়ি নেমে গেছে পাতালে। দেওয়ালে দাউ দাউ করে জ্বলছে মশাল। কর্কশ পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে ফিসফিস করে বললে নিপুল,—বাবা, যাচ্ছি কোথায় ?

জবাবটা দিল বল,—মাটির তলার রাজ্যে।

নিপুল আর কথা বলেনি। দু'চোখ ভরে শুধু দেখে যাচ্ছে। কিন্তু যা দেখছে, তা এই সতেরো বছরের জীবনে কল্পনাও করতে পারেনি। পাথুরে সিঁড়ি শেষ হয়েছে একটা বিরাট চওড়া গলিপথে। টানা লম্বা অলিন্দ চলে গেছে দূরে . . দূরে . . . বহুদূরে . . শেষ দেখা যাচ্ছে না। দু'পাশে পাথরের দেওয়াল কেটে তৈরি হয়েছে দরজার পর দরজা। প্রত্যেকটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সুদর্শন নর এবং নারী, ছেলে এবং মেয়ে, বুড়ো এবং বুড়ি। স্বাস্থ্য আর সুখ ফেটে পড়ছে প্রত্যেকের চোখেমুখে। দৈন্যদশার ছাপ নেই কোথাও।

ভিড় ক্রমশঃ বাড়ছে। দশ জোয়ান ঠেলেঠুলে পথ করে দিচ্ছে তিনজনের। যতই দেখছে, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছে নিপুল। এতো মানুষও আছে এখানে ?

ওদের নিয়ে যাওয়া হল প্রথমে একটা ঘরে। পাশাপাশি পাতা দুখানা বিছানা। নিবল আর নিজয় থাকবে এখানে। মিমি চলে গেছে মেয়েদের মহলে।

বিছানায় বসতে না বসতেই বাপ-বেটাকে নিয়ে যাওয়া হল স্নানঘরে। মস্ত চৌবাচ্চায় অঢেল জল সেখানে। গা ডুবিয়ে স্নান সেরে যখন উঠে এল দুজনে—তখন শরীর একেবারে ঝরঝরে।

তারপর খাওয়া। ইঁদুরের মাংস যে এত সুস্বাদু হয়, তা জানা ছিল না নিপুলের। সেইসঙ্গে নরম সাদা একটা খাবার—তার নাম রুটি। গাছ থেকে তৈরি হয়।

খাওয়া দাওয়ার পর শরীরে যখন নতুন শক্তি এল, তখন বল ওদের নিয়ে গেল রাজার সামনে।

আবার নামতে হল সিঁড়ি বেয়ে নিচে—আরও পাতালে। রাজা থাকে সেখানে। থাকে তার দাসদাসী আর রাণীরা।

এখানকার ঘরগুলো আরও বড়, আরও সাজানো। দেওয়ালে দেওয়ালে ছবির পর ছবি।

রাজা বসেছিল প্রকাণ্ড একটা ঘরে—মেজের ওপর গদীতে ঠেস দিয়ে।

নিপুল হাঁ করে চেয়েছিল রাজার দিকে।

পুরুষমানুষ যে এইরকম বিরাট আকৃতির হয়, তা কখনো দেখেনি নিপুল। ছোটখাট একটা দৈত্য বললেই চলে। মাথায় লম্বা চুল ঘাড়ে লুটোচ্ছে। লোমশ বুকের ওপর মিশে গেছে একহাতি লম্বা দাড়ি, গোঁফ জোড়া বিছের হুল-এর মত উঠে রয়েছে দু'গালের ওপর দিয়ে।

সবচেয়ে আশ্চর্য তার চোখদুটো। যেন চকমকি পাথর দিয়ে তৈরি। ঠোক্কর ল্যাগলেই ফুলকি ছিটকোবে।

এখন অবশ্য কঠিন এই চোখে হাসি ভাসছে। চাহনি বেশ নরম। মেঘডাকা গলায় বললে রাজা,—সুস্বাগতম। নটো রাজ্যে তোমরা থেকে যেতে পারো।

মাথা নিচু করে রইল নিবল। নিপুল সেই প্রথম জানল—পাতালপুরীর নাম 'নটো'।

পরে জেনেছিল রাজার নাম। নিকাডো। মারণ-মাকড়সাদের ভয়ে তারই পূর্বপুরুষ দূর্গ বানিয়েছিল পাতালে। এখানেই খাবার তৈরি হচ্ছে, কাপড় তৈরি হচ্ছে, তেল বের করা হচ্ছে পোকাদের গা থেকে। মাটির ওপরে যেতে হয় মাঝেমধ্যে। খাবার দাবারের বাড়তি দরকার হলে। নইলে এই পাতাল-রাজ্য বড় আরামের। বাইরের হাওয়া-যাতায়াতের জন্যে আছে অজস্র গোপন সুড়ঙ্গ। কালো মাকড়সা তা টের পেলেও ভেতরে ঢুকতে পারেনি। রাজা নিকাডোর সঙ্গে তাদের বিরোধও নেই। হপ্তায় দু'বার তাদের বেলুন টহল দিয়ে যায় পাহাড়ের ওপর দিয়ে। পাতালের মানুষরা পাতালেই রয়েছে দেখে, খুশি হয়ে চলে যায়।

খেতে খেতে এইসব কথাই বলছিল রাজা নিকাডো। প্রত্যেকটা কথা গিলছিল নিপুল। মারণ-মাকড়সারা মানুষকে ঘাঁটাতে চায় না—এই প্রথম সে শুনল। কেন ?

কেন আবার ?—জবাবটা দিয়েছিল রাজা : তাদের ক্ষতি করি না বলেই আমাদের নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। তারা মাটির ওপরে রাজত্ব করছে করুক—আমার রাজত্ব মাটির তলায়।

খাওয়া দাওয়া শেষ হতেই নিপুলের সামনে এসে দাঁড়ালো একটি লম্বা মেয়ে—অবিকল তার মায়ের মত দেখতে।

নিনা !—অস্ফুট কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল নিবল।

এই বুঝি তোমার ছেলে ?—মায়ের মতই নরম গলায় বলেছিল নিনা। যমজ বোনেদের সবই কি হুবহু একরকম হয় ?

—ছোট ছেলে। বড়কে রেখে এসেছি গর্তে।

—সবাইকে নিয়ে এসো, আরামে থাকবে।

ভাবছি।—মুখ টিপে জবাব দিল নিবল।

নিপুলের ইচ্ছে হল তখুনি বলে ওঠে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানেই থাকব এখন থেকে। গর্তে বড় কষ্ট।

কিন্তু বাবার ইচ্ছেটা কী ? সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল না কেন ? মরুভূমির গর্তে থাকার কষ্ট কি কম ? প্রতি মুহূর্তে প্রাণ যাওয়ার ভয়। খাবার নেই, জল নেই—প্রচণ্ড গরম।

সব চেয়ে অভাব সঙ্গী সাথীর। এখানে ওর বয়সী কত ছেলে আর মেয়ে। সব্বাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। নীরবে ডাকছে ওকে। তবে কেন বাবা এক কথায় রাজি হয়ে গেল না ?

সারাদিন ধরে খানাপিনা আর নাচগান করে ক্লান্ত হয়ে রাতে শুতে এল বাপ-বেটায়। নিনা এল সঙ্গে। ঠিক মায়ের মত বসল নিপুলের গা ঘেঁসে।

ঘরে জ্বলছে একটা আলো। নেই কোনো আওয়াজ। রাত অনেক হয়েছে। ঘুম পাচ্ছে নিপুলের।

আচমকা নিপুলের শরীর আলগা হয়ে আসে। খোলা রাখতে পারে না চোখের পাতা।

মা ডাকছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে মায়ের ডাক মনের মধ্যে নিপুল! নিপুল ! নিনাকে দেখলি ?

—হ্যাঁ, মা। ঠিক তোমার মতই।

—আছিস কেমন ?

—খুব ভালো। এখানেই থাকতে বলছে রাজা। আসবে তোমরা ?

- তোর বাবা কি বলে ?

—মুখ গোমরা করে রয়েছে। তুমি আসবে ?

—না।

—কেন, মা ?

—ওরে পাগলা, ওখানে স্বাধীনতা নেই। হাজার হাজার মানুষ রাজার

চাকরবাকর হয়ে আছে। আমি চলে এসেছিলাম সেই জন্যেই। এখানে কষ্ট আছে, কিন্তু নিজেদের মত থাকা যায়। কারুব হুকুমে চলতে হয় না। তোর বাবা ওই জন্যেই থাকবে না।

—নিনা ?

—ওকে রাজা ছাড়বে না। অনেক কাজ কবতে হয় ওকে।

—কষ্ট করে থাকবে অত গরমে ?

—আরাম তোর সইবে না—তোকে জানি, নিপুল। চলে আয়।

ঘোর কেটে গেল। মায়ের ছবি মিলিয়ে গেল। চোখ খুলে দেখল নিনা ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। চোখ শক্ত করে চেয়ে রয়েছে ওর বাবা।

কি কথা হল ?—প্রথম প্রশ্নটা তার।

জবাব দিল নিনা,—এখানে থাকা চলবে না তোমাদেব। রাজার সামনে যা বলতে পারিনি। রাজার চাকরবাকর দরকার রাজত্ব চালানোর জন্যে। তোমরা কি তা পারবে ?

না।—নিপুল নিজেই অবাক হয়ে যায় গলার আওয়াজ এত শক্ত হয়ে গেছে দেখে।

চোখ নরম হয়ে এল নিবলের,—এই জন্যেই রাজি হইনি আমি।

ওরা এখন পাতাল রাজত্বের বাইরে। হাসি মুখেই বিদায় জানিয়েছে বাজা নিকাডো। পই-পই করে অবশ্য বলেছে,—যখন খুশি চলে আসবে। তোমরা থাকলে আমাদের শক্তি আরও বাড়বে। বিশেষ করে নিপুলের।

বলে অদ্ভুত চোখে চেয়েছিল নিপুলের দিকে। চকমকি চোখের সেই দীপ্তি যেন ঝাপটা মেরে গিয়ে গেছিল নিপুলের মনকে। রাজা কি বুঝেছে, নিপুল আব পাঁচজনের মত নয় ? মনেব শক্তি তার অনেক বেশি ?

নিপুল নিজেও বুঝেছিল—রাজা নিকাডোও আর পাঁচ জনেব মত নয়। শুধু শরীব নয়, মনও তার প্রচণ্ড শক্তি ধরে। মাকড়সারা তাকে ঘাঁটাতে চায় না এই কারণেই।

পাহাড়ের গোড়া পর্যন্ত এসে বিদায় নিয়ে গেল বল আব তার সাঙ্গপাঙ্গ। রোদ্দুর চড়া হওয়ার আগেই ফিরতে হবে পাতাল গহ্বরে—রাজার হুকুম।

পাথরের আড়ালে দশজন মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বাপ-বেটা। মন হু-হু করছে নিপুলের। এতগুলো সমবয়সী ছেলেমেয়েকে ছেড়ে আসতে কষ্ট হয় বইকি।

তার পরেই বললে নিবল,—পাহাড়ে আর উঠবো না!

—ফিরবে কি করে?

—পাহাড় ঘুরপাক দিয়ে। সময় তো রয়েছে। চ, অনেক কিছু দেখতে পাবি।

□ পাঁচ □

সত্যিই দেখেছিল নিপুল। ওর জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেওয়ার মত দৃশ্য।

পাহাড়ের গোড়া ধরে বাঁ দিকে হাঁটতে হাঁটতে নিবল বললে,—নটোরাজ্যে জলের অভাব নেই। কেন জানিস?

—না, বাবা।

—ওদেরকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম। ডাঙা থেকে সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে জল যায় পাতালে।

—ডাঙার জল পাতালে? এখানে জল কোথায়?

—আছে এই পাহাড়ের বাঁ দিকে হ্রদে। সেই দিকেই পাহাড়ের গায়ে অনেক সিঁড়ি দেখেছিলাম আসবার সময়ে। মিমি আর তুই বেদম হয়ে পড়েছিলি—তাই তখন বলিনি। এখন যাচ্ছি সিঁড়ি দেখতে—সিঁড়ির গোড়ায় আছে নাকি নিকাডোর পূর্বপুরুষদের ঘরবাড়ি।

—কে বললে?

—বল। চলে এলাম জায়গাটা দেখে যাবো বলে।

শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল নিপুল। অঢেল জল পায় বলেই পাতাল রাজ্যের সবাই এত সুখী। কাউকে কোনো কাজ করতে হয় না। শুধু খায়, নাচ-গান করে আর ঘুমোয়। পিঁপড়েদেরও নাকি পোষ মানিয়েছে। তাদের দিয়ে খাবার জোগাড় করে। এসব কথা শুনেছে বল-এক মুখে। কিন্তু হ্রদের ধারে পুরোনো বাড়ি আছে, তা তো বলেনি।

হাঁটতে একটু কষ্ট হচ্ছে। একদিনের পেট ঠেসে খাওয়া আর আরাম, বেশ কুঁড়ে করে তুলেছে নিপুলকে।

ঠিক এই সময়ে চাপাগলায় বলে ওঠে নিবল।—বসে পড় মাকড়সা বেলুন।

চকিতে বেলুন দুটোকে দেখেছিল নিপুল। প্রায় দুশো ফুট ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। হ্রদ যেদিকে আছে, সেই দিকেই।

কাঁটাঝোপের তলায় বসে পড়ল নিবল— পাশে নিপুল। দুজনেই হেঁট হয়ে তাকিয়ে বালির দিকে। মনে আর কোনো চিন্তা নেই। সমস্ত মন দিয়ে দেখছে বালির কণা।

দিগন্তে বেলুন মিলিয়ে যাওয়ার পর উঠে দাঁড়ালো বাপ-ছেলে।

এককালে এখানে নিশ্চয়ই দুর্গ ছিল। আশেপাশে, দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে ভাঙা পাথর আর থাম, দেওয়াল আর মিনার। বালিতে চাপা পড়েছে বেশ কিছু।

বালিয়াড়ির মধ্যে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে বাপ-বেটায় অতিকষ্টে উঠে এল দেওয়ালের মাথায়। তারপরেই থ হয়ে গেল সামনের দৃশ্য দেখে।

দেওয়ালের মাথা থেকে প্রায় বিশ ফুট নিচে রয়েছে এক শহর। বড় বড় থামওলা বাড়িগুলো ভেঙে পড়লেও খিলেন আর দেওয়াল মোটামুটি

অটুট। চোঙার মতো থাকগুলো গোল হয়ে ঘিরে রেখেছে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। ঠিক মাঝখানে একটা বস্তু চকচক করছে রোদ্দুরে। ভয়ানকভাবে রোদ্দুর ঠিকরে যাচ্ছে গা থেকে। চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে বলে ভাল করে তাকানোও যাচ্ছে না।

দম আটকানো গলায় বললে নিবল,—এই সেই শহর। এখানেই এককালে থাকতো বাজা নিকাডোর আগের রাজা-রা।

—মাটির তলায় ?

না, না, মাসড়সাদের তাড়া খেয়ে এখান থেকেই পালিয়েছিল মাটির তলায় !

মানষ তৈরি করেছিল এইসব ?

মানুষই করেছিল। তবে তারা কারা, কেউ তা জানে না। নিকাডো নিজেও জানে না।

চকচকে ওই জিনিসটা কী ?

—বুঝতে পারছি না। ধাতু দিয়ে তৈরি মনে হচ্ছে।

মিনিট দশেক লাগল নিচের বালি অঞ্চলে পৌঁছাতে। ভাঙাচোরা দেওয়াল ধরে নামতে হল অনেক কষ্ট করে।

বাড়িগুলো আর আস্ত নেই। কাদা আব ইঁট দিয়ে তৈরি হয়েছিল একসময়ে। দু-একটা বাড়ির ছাদ ঝুলছে। আব একবাব ঝড় উঠলেই পড়ে যাবে।

ভাঙা থামগুলোর মাঝে মাঝে একটা করে পাথরের বাক্স। নিপুল একটা বাক্সর পাশে দাঁড়িয়েছিল। কান পেতে শুনেছিল। কোনো আওয়াজ পাযনি। মনে হয়েছিল, ভেতরে মানুষ আছে। তবে সে মরে গেছে অনেক বছর আগে। তার দেহটাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে পাথরেব বাক্সে।

রাস্তার শেসে একটা সিঁড়ি। বারো ফুট চওড়া। ধাপগুলো ভেঙে গেছে। দুপাসের থামগুলোও ভেঙে পড়েছে। সিঁড়ির ওপরে একটা চত্বর। মেঝে বাঁধানো রঙিন পাথর দিয়ে।

চত্বরের ঠিক মাঝে রয়েছে চকচকে বস্তুটা। ঠিক যেন একটা বিদঘুটে গুবরে পোকা। অনেকগুলো সিধে ঠ্যাং ছড়িয়ে থেবড়ে বসে আছে। নিপুলের মনে হল, এ ঠ্যাং দিয়ে হাঁটা যায় না। সারা গা এত চকচকে যে নিপুল নিজেকে দেখতে পাচ্ছে তার গায়ে।

মন শিথিল করে দিয়ে অদ্ভুত জিনিসটা সম্বন্ধে মনের ভেতরে একটা

ধারণা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করল নিপুল। গড়নটা দেখে তার স্পষ্ট মনে হচ্ছে —মানুষ ছাড়া এ জিনিস কেউ গড়তে পারে না। কিন্তু গড়ল কেন? ধাতুর পোকার পিঠে চেপে মরুভূমি পেরোনোব জন্যে ?

পোকার গায়ে রয়েছে একটা দরজা। জীবনে দরজা দেখেনি নিপুল, কিন্তু ওর মন বলল, এই জিনিসটা খুলে গেলেই ভেতরে ঢোকা যায়।

রোদ্দুরে বেশ গরম হয়ে রয়েছে দরজাটা। একপাশে একটা বেঁকা হাতল। হাতল ধরে টেনে, ঠেলে, ধাক্কা মেরেও দরজা প্রথমে খুলতে পারেনি।

এমন সময়ে কি যেন সরে গেল মুঠোর মধ্যে। নিঃশব্দে হড়কে পাশের দিকে সরে গেল দরজা। আর একটু হলে উল্টে পড়ে যেত নিপুল।

লাফিয়ে সরে এসে সভয়ে চেয়েছিল ফোকরটার দিকে। যেন একটা অদৃশ্য হাত ভেতর থেকে ঝটকান মেরে দরজা খুলে দিয়ে ডাকছে ওকে ভেতরে।

অথচ কেউ নেই ভেতরে।

এগিয়ে এসে ভেতর দিকে উঁকিঝুঁকি মেরেও কাউকে দেখা যায়নি। তখন ও ঢুকেছিল ভেতরে। ঢোকবার পর বুঝেছিল, দানবের চোখটা এক রকমের স্বচ্ছ জিনিস দিয়ে তৈরি। আগুনে বালি গলে গেলে এই জিনিস তৈরি হয়। তখন তার মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো যাতায়াত করতে পারে।

নিপুল এখন বসে রয়েছে ছোট্ট একটা 'ঘরে'। চামড়া দিয়ে মোড়া বসবার জায়গা রয়েছে খুদে খুপরিতে। ঘরের অন্য সব কিছুই যেন ম্যাজিক দিয়ে গড়া। মাথা গুলিয়ে দেওয়ার মতো জিনিস। সামনের দিকের বসবার জায়গায় গিয়ে বসেছিল। সামনের কন্ট্রোল প্যানেল, মিটার আর ডায়ালের কোনো মানে বোঝেনি। শুধু এইটুকুই বুঝেছিল, ধাতুর পোকাকে তৈরি করা হয়েছে নিখুঁত মাপের হিসেবে— যে হিসেবকে কল্পনা করার মত মাথা তার নেই। নিশ্চয়ই দেবতার আরাধনা করা জন্যে।

খুউবাব সাবধানে আঙুলের টোকা দিয়েছিল কন্ট্রোল প্যানেলে। কিচ্ছু ঘটেনি।

প্যানেলের তলায় রয়েছে একটা খোলা খুপরি। অনেক রকম জিনিস রয়েছে সেখানে। তেলের ডিবে নিয়ে টেপাটেপি করতে গিয়ে তেল ছিটকে এসে মুখে লাগতেই লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল। বিস্বাদ তেল। রেঞ্চ, স্ক্রুড্রাইভার, স্প্যানার—কোনোটারই মানে বুঝতে পারেনি। আধ

ইঞ্চি ব্যাসের ফুটখানেক লম্বা একটা চোঙা বেশ ভারি—গ্র্যানাইট পাথরের চেয়েও। পাথরের চেয়েও ভারি জিনিস হাতছাড়া করা উচিত নয়। হাতে নিয়ে বুঝেছিল, এক ঘা মারলেই গুবরের শক্ত খোলাও চুরমার হয়ে যাবে। এ জিনিস মুঠোয় ধরে যে কোনো শত্রুর মোকাবিলা করা যায়।

চোঙটা মুঠোয় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক এই বিশ্বাসটাই এসে গেল ওর মাথার মধ্যে।

তাই খুঁটিয়ে দেখেছিল চোঙা-কে। দুটো প্রান্তেই পরপর অনেকগুলো সমকেন্দ্রিক বৃত্ত। খুব সূক্ষ্মভাবে খোদাই করা। আদ ইঞ্চি ব্যাসের আর একটা বৃত্ত খোদাই করা রয়েছে চোঙার গায়ে। ঠিক এই জায়গাটাই দাঁতে
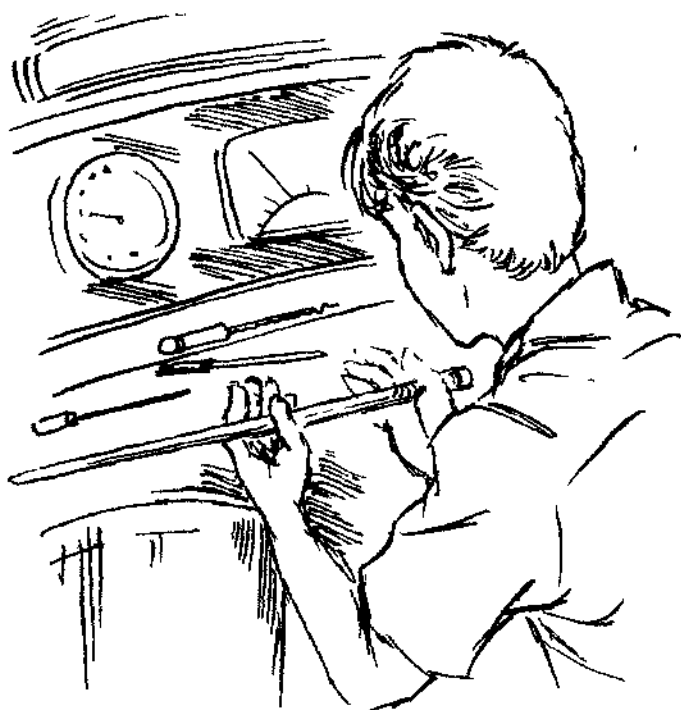
কামড়ে ধরেছিল নিপুল। সঙ্গে সঙ্গে ফটাফট করে ঘাটে ঘাটে লম্বা হয়ে গেল চোঙা—ঠিক যেন টেলিস্কোপ। ডগাটা গিয়ে ধাক্কা মারল কন্ট্রোল প্যানেলের একটা বোতামে। অমনি উচ্চনিনাদী একটা গুমগুম আওয়াজে কেঁপে উঠল গোটা পোকার শরীর, কেঁপে উঠল চামড়ায় মোড়া সিট।

বিষম আতঙ্কে একলাফে দরজা গলে বাইরে ছিটকে গেল নিপুল। দূর থেকে দেখলে প্রাণ এসে গেছে পোকার শরীরে। ধক্‌ধক্‌ করে

আওয়াজ হচ্ছে ভেতরে।

বাবা দূরে ছিল। আওয়াজ শুনেই দৌড়ে এল। ঠিক তখনি নিপুলের খেয়াল হল, ধাতুল চোঙাটা ফেলে এসেছে ভেতরে। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল সাবধানে। চোঙা তখন পাঁচ ফুট লম্বা হয়ে গেছে।

—কি হল রে? নিবলের প্রশ্ন।

—বুঝতে পারলাম না।

দপ্ করে একটা সবুজ আলো জ্বলে উঠল কন্ট্রোল প্যানেলে—থেমে গেল গুমগুম ধক্‌ধক আওয়াজ।

বাপ-বেটায় এক চক্কর মেরে এল ধাতুর পোকাকে—কিন্তু কেউই কিছু বুঝলো না। চোঙাটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখেও নিবলের মাথায় কিচ্ছু ঢুকলো না—ফিরিয়ে দিল নিপুলের হাতে। হাতে নিতে না নিতেই খুট করে আওয়াজ হল চোঙার মধ্যে—সড়াৎ করে গুটিয়ে গিয়ে আগের মতই মাত্র এক ফুট লম্বা হয়ে গেল রহস্যময় চোঙা।

এবার বুঝল নিপুল। আসল রহস্য ওই গোল দাগ কাটা জায়গাটায়। সেখানেই আঙুলের চাপ দিতেই ফের লম্বা হয়ে গেল চোঙা। দুহাতে দুদিক ধরতেই অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করল নিজের মধ্যে। বিশেষ করে শিরশির করছে আঙুলগুলো।

মিনিট পাঁচেক ধরে গোল জায়গাটা টেপাটেপি করে ছোট বড় করল বটে চোঙাটাকে—কিন্তু কিভাবে যে ব্যাপারটা ঘটছে, তা মাথায় ঢুকলো না।

অনেকটা সময় গেল এখানে। সূর্য মাথার ওপর গনগন্ করছে। রওনা হওয়া দরকার এখুনি। চোঙা হাতে নিয়ে দুর্গের ভাঙা দেওয়ালের দিকে এগোলো বাপ-ছেলে। কাঁধের বোঁচকা পড়ে রয়েছে ওখানে। বালিতে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে বালিয়াড়ির ওপরে উঠল। নিচে নেমে গিয়ে বোঁচকা কাঁধে ফের উঠল বালির মাথায়। ভাঙা দেওয়ালে ঠোক্কর খেলো নিবল। কাঁধের বোঁচকা ঠিকরে গড়িয়ে গেল ঢালু মসৃণ বালির ওপর দিয়ে।

যাক গড়িয়ে—নিবল তাকায়নি সেদিকে—তাকিয়েছিল শুধু নিপুল।

তাই দেখতে পেল বোঁচকা যেখান দিয়ে যেখান দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে—সেই-সেই জায়গার বালি অদ্ভুতভাবে নড়ে উঠছে, সরে যাচ্ছে—বালির তলায় যেন একটা আলোড়ন চলছে।

ব্যাপারটা কি, দেখবার জন্যে হুড়মুড় করে নেমে এসেছিল নিপুল। বোঁচকা তখন আটকেছে বালির খাঁজে। নিপুল তুলে নিয়েছিল বাঁ

হাতে—ডান হাতের চোঙা দিয়ে বালিতে খোঁচা মারতে যাচ্ছে, এমন সময় ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল খাঁজের বালি তারপরেই একটা লোমশ ঠ্যাং বেরিয়ে এল বালির তলা থেকে। ঠিক পাশেই বালি ভেদ করে উঠে এল হুবহু আর একটা ঠ্যাং। কালো কুচকুচে সেই লোম আর ঠ্যাং-এর চেহাবা দেখেই আঁৎকে উঠলো নিপুল।

মাকড়সার সামনের পা। পরের মুহূর্তেই বালি ঠেলে মাথা তুলল মাকড়সা নিজেই। দানবিক চেহারা। ড্যাবডেবে চোখ মেলে দেখছে নিপুলকে। বাকী শরীর এখনও বালি তলায়।

মরিয়া হয়ে গেল নিপুল। চোখের পলক ফেলার আগেই ডান হাতের ভারি চোঙাটা সজোরে ঢুকিয়ে দিল কালো লোমশ দানবের ভাবলেশহীন মুখের মধ্যে। যন্ত্রণায় হিস-স করে উঠল মাকড়সা। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড অদৃশ্য ধাক্কায় টলে গেল নিপুল। ইচ্ছাশক্তি দিয়ে ওকে ঠেলে দিচ্ছে মাকড়সা।

নিপুল তখন আতঙ্কে দিশেহারা বলেই ইচ্ছাশক্তি ওকে তেমনভাবে কব্জায় আনতে পারলো না।

নিপুলের আর কোনো খেয়াল নেই -সে কেবল মেরেই যাচ্ছে—অদৃশ্য হাতে কে যেন ওকে ধাক্কার পর ধাক্কা মেরে চলেছে বুঝেও জোর করে দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গায় --ডান হাত চালাচ্ছে উন্মাদের মতন।

আচমকা ঢিলে হয়ে গেল অদৃশ্য ধাক্কা—হার মানলো মাকড়সার ইচ্ছাশক্তি। কুৎসিত কলেবর থেকে বেরিয়ে গেল প্রাণ।

বালিয়াড়ির ওপরে দাঁড়িয়েছিল নিবল। ভয়ে পাথর হয়ে গেছে। মাকড়সা আর নড়ছে না দেখে হুড়মুড় করে নেমে এসে দাঁড়ালো নিপুলের পাশে।

ধড়ফড় করতে গিয়ে মাকড়সার আধখানা দেহ উঠে এসেছিল বালির বাইরে।

দু-সারি চোখের বদলে একসারি চোখ ঘিরে রয়েছে পুরো মাথাটাকে গায়ের রঙ কুচকুচে কালো।

এই পর্যন্ত দেখেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল নিবলের। একই অবস্থা নিপুলেরও।

মারণ মাকড়সা মেরেছে নিপুল। মনে পড়ল, কিছুক্ষণ আগে দুটো বেলুন ভেসে যেতে দেখেছিল। মরুঝড়ে তারাই কি ঠিকরে পড়েছিল বালিতে ?

চোঙা দিয়ে বালি খুঁচিয়ে গর্ত করে ফেলতেই নিপুল দেখল বেলুনের কাপড়।

ভাঙা গলায় বললে নিবল,---আর একটা ধারে কাছেই আছে।

নিপুল বললে,—চলো পালাই।

—আগে বালি চাপা দে -কেউ যেন দেখতে না পায়।

বাপ-বেটায় মিলে তখুনি বালি দিয়ে ঢেকে দিল মাকড়সার মৃতদেহ। তার আগে বেলুনের কাপড় দিয়ে চোঙা থেকে রক্ত আর থকথকে সাদা জিনিসটা মুছে নিল নিপুল।

এবার পালানোর পালা। ঘরে ফেরার পর্ব। ঝকঝকে রোদ গিয়ে পড়েছে পাহাড়ের গায়ে। অনেক বাড়ি দেখা যাচ্ছে এতদূর থেকেও।

চাপা গলায় নিবল বললে, –চ না ঘুরে যাই।

--কোথায়, বাবা ?

--পাহাড়ের গায়ের ওখানে কারা থাকত, কিভাবে থাকত—দেখব বলে এতদূর এলাম—না দেখে চলে যাব ?

চলো যাই।

□ ছয় □

পাহাড়ের তলা থেকে পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর দিকে। পাথর কেটে তৈরি সিড়ি। এক একটা ধাপ এত উঁচু যে দানব ছাড়া কারও পক্ষে হনহন করে উঠে যাওয়া সম্ভব নয়। সিঁড়ি শেষ হয়েছে বিশাল উঁচু পাঁচিলের সামনে। পাঁচিল যদি আস্ত থাকতো তাহলে ওপরে ওঠা যেত না। বড় বড় চাঁই খসে পড়েছিল বলেই খাজে পা রেখে দুজনে উঠে গেল পাচিলের মাথায়। পাচিলের মাথা বরাবর পাথরের ঘর রয়েছে কিছুদূর অন্তর। জানলা রয়েছে ঘরে। একটা ঘরে ঢুকে পড়ল নিপুল। অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে হল নিজেকে।

অদ্ভুত একটা অনুভূতি ওকে পেয়ে বসেছে, মারণ-মাকড়সাকে খতম করার পর থেকেই। গা ছম-ছম করার মত অনুভূতি। ওর ওপর যেন কার নজর রয়েছে। কে যেন ওকে একনাগাড়ে দেখে যাচ্ছে।

পাথরের খুপরিতে ঢুকে তাই নিজেকে একটু স্বচ্ছন্দ মনে হল। একটা আড়াল তো পাওয়া গেল।
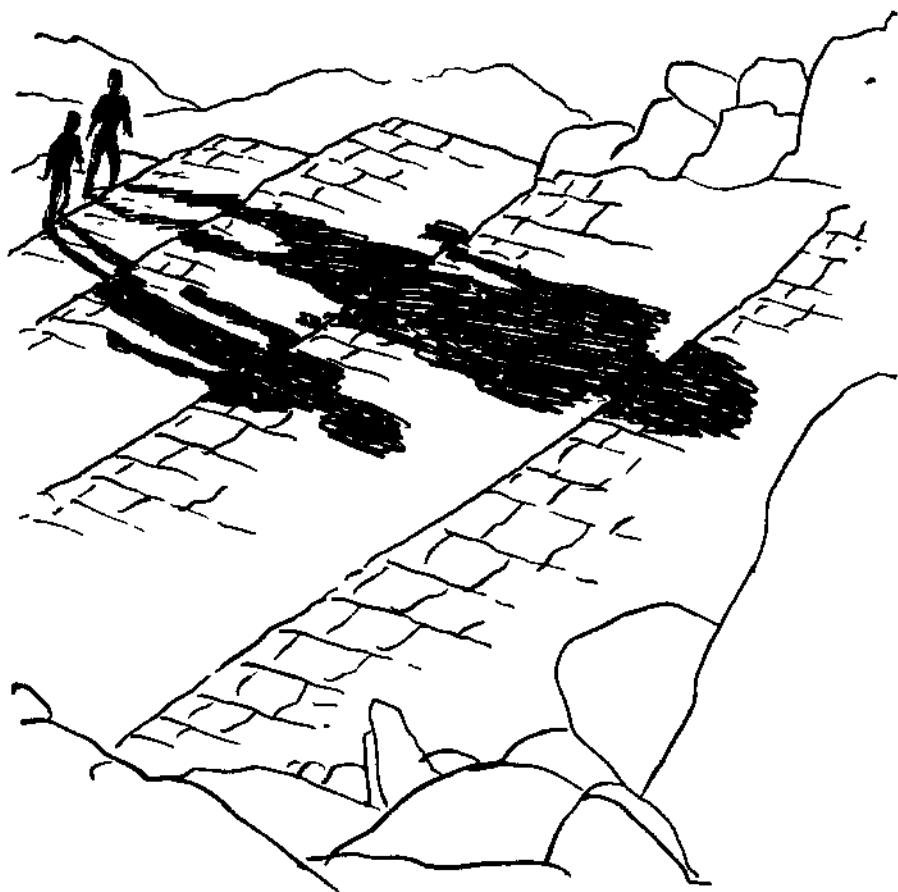
জানলা দিয়ে অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে হ্রদ। জল চিকচিক করছে। বিস্তর গাছপালা রয়েছে সেদিকে।

পাঁচিলের ভেতর দিকে রয়েছে পাথরে বাঁধানো উঠোন। এতবড় উঠোন, এত উঁচু সিঁড়ি বানিয়েছে যারা—তাবাও মানুষ। হাজার হাজাব মানুষ পাথর কেটেছে। মাকড়সার ভয়ে কীটপতঙ্গের মত পালিয়ে গর্তে ঢোকেনি।

ভাবতেও অবাক লাগে নিপুলের। মানুষ যে এককালে পৃথিবীব রাজা ছিল—এখানে দাঁড়ালে তা বিশ্বাস হয়।

বিশ গজ দূরে রয়েছে একটা পাহারাদারের ঘর। যতদূর দেখা যাচ্ছে, বিশ গজ দূরত্বে একটা করে ঘর তৈরি হয়েছিল শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখার জন্যে।

তবুও তাদেব ঠেকানো যায়নি। আটপেযে দানবরা এ জায়গাকে

শ্মশান বানিয়ে দিয়েছে।

খুপরি ঘর থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেল নিপুল আর নিবল। হ্রদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ঐ সিঁড়ি বেয়েই উঠোনে নেমে এল দুজনে।

পাহাড়-দুর্গ যারা বানিয়েছে, তাদের বাহাদুরি দেখা গেল এর পরেই। বিশাল উঠোনগুলো ধাপে ধাপে নেমে গেছে ভেতরের দিকে। যেন এক-একটা উঠোন এক-একটা ধাপ। পর-পর চারটে উঠোন বেয়ে অনেক নিচে নেমে আসার পর দেখা গেল বিশাল চৌকোনা ইমারতটা।

লাল আর হলুদ পাথরের চাঁই দিয়ে তৈরি সেই ইমারত পুরোপুরি আস্ত রয়েছে।

দরজা পেরিয়ে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়েছিল নিবল। হলঘরের শেষ দেখা যাচ্ছে না। এককালে নিশ্চয় হাজার হাজার মানুষ জমা হত সেখানে। এখন কেউ নেই! দেওয়ালে খোদাই করা জীবজন্তুর মূর্তি। একটা চারপেয়ে ল্যাজওল; জানোয়ার দেখে জিজ্ঞেস করল নিপুল, -এটা কী বাবা ?

খুব আস্তে কথা বললেও ঘর গম্‌গম্ করে উঠলো গলার আওয়াজে। ফিসফিস করে বললে নিবল, বাঘ।

--বাঘ ? কোনোদিন তো দেখিনি।

-- মারণ-মাকড়সা মেরে শেষ করে দিয়েছে।

- কেন ?

—ওদের থাবার নখ আর মুখের দাঁত ধারালো বলে। অস্ত্র যার আছে সে জানোয়ারকে বাঁচিয়ে রাখেনি।

বহু বছর এ-ঘরে কেউ ঢোকেনি। ধূলো আর বালি পুরু হয়ে জমে রয়েছে মেঝেতে। ওদের দুজনের পায়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে রয়েছে তার ওপর।

এই ছাপের দিকে তাকিয়েই একটা জিনিস লক্ষ করলো নিপুল।

বাবা-র পায়ের ছাপ ধূলো আর বালি সরিয়ে ভেতরে বসে গেছে। তাই দেখা যাচ্ছে একটা খাঁজ।

হেঁট হয়ে খাঁজের ওপর থেকে ধূলো আর বালি সরিয়েছিল নিপুল। নিবল তাই দেখে হঠাৎ ধুলো আর বালি সাফ করে ফেলল গোল জায়গার মধ্যে থেকে। ঠিক মাঝখানের ধাতুর আংটা-টা দেখা গেল তখুনি।

আংটায় আটকানো গোল পাথরের ডালা এতটুকু নড়াতে পারেনি বাপ-বেটায়। হলঘরের ভেতরে গিয়ে লম্বা কাঠের বরগা নিয়ে এসেছিল

নিবল। আংটায় গলিয়ে দুজনে টেনেছিল। একটু একটু করে মেঝে থেকে উঠে এসেছিল গোল ঢাকনি।

নিচে নেমে গেছে একসার সিঁড়ি।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে প্রথম নামতে চায়নি নিবল। তারপব নিপুলেব ইচ্ছে দেখে পা দিয়েছিল ধাপে। তার আগে জ্বালিয়ে নিয়েছিল একটা মশাল। বোঁচকায় অনেকগুলো মশাল দিয়েছিল বল। চকমকি ঠুকতেই জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে।

ধাপ নেমে গেছে নিচে—অনেক নিচে। শেষ দেখা যাচ্ছে না।

মশালের আলোয় নামছে তো নামছেই। দুপাশের দেওয়ালে সারি সারি ছবি। এককালে এই পৃথিবীতে কত রকমেব জন্তু জানোয়ার পাখি ছিল তাদেব ছবি, মানষেব ছবি, তাদের কাজকর্মের ছবি।

হঠাৎ একটা চাতালে শেষ হয়ে গেল সিঁড়ি। চাতালের ঠিক মাঝে একটা কুয়ো।

নিবল মশাল ধরেছিল কুয়োর ওপরে। অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে জল।

হ্রদের জল এখানেও এসেছে।—বললে নিবল ঃ সুড়ঙ্গটা মনে হয় হ্রদেব দিকেই গেছে।

চাতালেব ওদিকে আব সিঁড়ি নেই। বেশ বড একটা সুড়ঙ্গ সটান চলে গেছে সামনেব দিকে। মাথা উঁচু কবে হেঁটে যাওযা যায়। মশাল হাতে সেইদিকেই এগিযে গেল নিবল।

পেছন পেছন যাওযাব আগে কুযোব মধ্যে হেঁট হযে তাকিযেছিল নিপুল। অন্ধকারে কিছুই দেখবার আশা করেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখতে পেল।

একটা কালো মাকডসার মুখ। চেঁচিযে উঠেছিল নিপুল, -বাবা !

দৌড়ে এল নিবল, কী ?

—মশালটা ধরো।—এইখানে।

কুয়োর মুখে ফেব মশাল ধরেছিল নিবল। অনেক নিচে দেখা গেছিল চকচকে জল। কালো মাকড়সাকে আব দেখা যাযনি। ভুল ভেবেছে নিপুল। মাকড়সা মেরে ভয় পাচ্ছে শুধুশুধু।

কিন্তু কি দেখেছে। তা আব বলল না বাবাকে।

শুধু বলল, চলো, চলো দেবি হয়ে যাচ্ছে।

সুড়ঙ্গের শেষ দেখা গেল ঘন্টাখানেক হেঁটে যাওয়ার পর।

সুড়ঙ্গ সিধে গিয়ে বাঁক নিয়েছে দুবার। ভ্যাপসা গন্ধ কোথাও নেই।

বরং টাটকা হাওয়া খেলছে। শেষ বাঁকটা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে গেল।

মশালটা খুব কাজ দিয়েছে। এতটা পথ অন্ধকারে হাঁটা যেত না। দেওয়ালের অজস্র খোদাই করা ছবিগুলোও দেখা যেত না। মানুষদের কীর্তিকাহিনী গল্পের মত পাথর কেটে ছবি এঁকে লিখে গেছে শিল্পীরা। শেষের ছবিতে দেখা গেল মাকড়সাদের। ঝাঁকে ঝাঁকে তেড়ে আসছে। বেলুনে চেপে উড়ে আসছে।

ওরা এখন দাঁড়িয়ে আছে হ্রদের কিনারায়।

নিবল বললে,—যাবার সময়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে যাবো।

নিপুলও তাই চায়। ওদের আবিষ্কার আর কেউ যেন জানতে না পারে। কত বছর এখানে মাকড়সা পর্যন্ত ঢোকেনি—সুড়ঙ্গের দুদিকের পাথরের দরজা এঁটে বন্ধ ছিল বলে। সেকালের মানুষরা নিশ্চয় ইচ্ছে করেই তা করেছিল।

চারদিন লাগল মরুভূমির গর্তে ফিরতে। দেরি হল নিবলের জন্যে। পা ফুলে গিয়েছিল। শেষের দিকে বাবাকে কাঁধে করে পথ হেঁটেছে নিপুল।

চতুর্থ দিনে নিবলকে কাঁধে বসিয়ে যখন মরুভূমির গর্তের কাছে এসে পড়েছে নিপুল—দূর থেকে ওদের দেখতে পেয়েছে সিস। পাথরের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে চেয়েছিল সকাল থেকেই। দৌড়ে এসেছিল সে আর নিজয়। নিবলকে ধরাধরি করে নিয়ে গেছিল মাটির গর্তে। এক কোণে ঘাসের বিছানায় মড়ার মত পড়ে আছে জোমো। জ্বর হচ্ছে কদিন ধরেই। বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে। বয়স তো কম হল না।

ঘাসের বিছানায় গিয়ে বসল নিপুল। চোখ মেলে চাইল জোমো। চি-চি করে বললে— এসেছিস ?

—হ্যাঁ। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

—বল।

—মিমি-কে যেখানে ছেড়ে দিয়ে এলাম, সেখানে পাহাড়ের মধ্যে একটা বিরাট দুর্গ আছে। এককালে মানুষ রাজা থাকত সেখানে। কখনো গেছো ?

—না।

—ধাতুর তৈরি একটা গুবরে পোকা আছে। এই জিনিসটা সেখানে পেয়েছি। চোঙা বের করে দেখাল নিপুল।

ছানিপড়া চোখে কিছুক্ষণ দেখে জোমো বললে,—দেখিনি কখনো।

—এই দিয়ে গুবরে পোকা-কে জ্যান্ত করা যায়।

চুপ করে রইল জোমো। কথা বলতে চাইছে না—কষ্ট হচ্ছে।

—তোমাকে যখন মাকড়সারা ধরে নিয়ে যায়, তখন বয়স কত ছিল?

—সতেরো।

—আমার বয়সও এখন সতেরো।

সাবধানে থাকিস।—বলে চোখ বুঁজলো জোমো।

কানের কাছে মুখ নিয়ে নিপুল বললে,—পাহাড়ের দুর্গে মানুষ থাকতো—এটা তখন জানতে ?

জানতাম। শুনেছি বাবার কাছে।

—ভারি পাথরের দরজা ভেঙে ঢোকা যায় না। মাকড়সা সেখানে ঢুকলো কি করে ? মানুষদের হারিয়ে দিল কিভাবে ?

—দরজা ভাঙেনি।

—তবে ?

—বাইরে থেকে ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সবাইকে অবশ করে দিয়েছে—ইচ্ছাশক্তি দিয়েই পাহারাদারদের দিয়ে দরজা খুলিয়েছে। তারপর কাউকে খেয়েছে, কাউকে ধরে নিয়ে গেছে।

—তোমাকে ধরে নিয়ে গেল কিভাবে ?

আমরাও বাড়ির মধ্যে থাকতাম। পাহাড়ের গায়ের বাড়ি। হঠাৎ একরাতে কেউ আর নড়তে পারলাম না। শুয়ে রইলাম—আঙুল পর্যন্ত নাড়তে পারলাম না। মাকড়সা তারপর এল পালে পালে। যারা বাধা দেয়নি তাদের ধরে নিয়ে গেল। যারা রুখে দাঁড়ালো তাদের খেয়ে নিল।—হাঁপাচ্ছে জোমো।

—রুখে দাঁড়ালেই খেয়ে নেয় ?

—হ্যাঁ। আমাদের সর্দারের মনের জোর ছিল খুব বেশি। ইচ্ছাশক্তি দিয়ে লড়তে গেছিল—মাকড়সারা তা বরদাস্ত করেনি। ওরা চায় না আর কারও ইচ্ছাশক্তি থাকুক।

ঝিমিয়ে পড়লো জোমো।

এর পরের দিন ভোর থেকেই নিপুল দেখেছিল মাকড়সা বেলুন। সারাদিন ধরেই তারা এক দিগন্ত থেকে এসে আর এক দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। রাত্রে ভাঙা গলায় বলেছিল নিবল,— কালকেই পালাতে হবে এ অঞ্চল থেকে।

সায় দিয়েছিল নিপুল, নিশ্চয় পালাতে হবে। পাহাড় দুর্গের সেই সুড়ঙ্গ এখন সবচেয়ে নিরাপদ।

পরের দিন ভোর থেকেই শুরু হল জিনিসপত্র গোছগাছ করা। নিবল নেতিয়ে পড়েছে। ঘাসের বিছানায় শুয়ে আপন মনে বকে যাচ্ছে। মাকড়সা আতঙ্ক মুখের আগল খুলে দিয়েছে। আটপেয়ে এই পোকা-দানবরা শিকার পাকড়াও করে সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নেয় না। জিইয়ে রেখে দেয়। বিষ ফুঁড়ে ঢুকিয়ে দেয় শরীরে। মানুষ মরে না—কিন্তু পঙ্গু হয়ে যায়। দিন কয়েক পরে মাংস নরম তুলতুলে হয়ে যায়। তখন তারিয়ে তারিয়ে খায় মাকড়সারা।

জোমো-ও চুপ করে নেই। মানুষদের ধরে নিয়ে যাওয়ার সময়ে মাকড়সাদের সে দেখেছে খুব কাছ থেকে। সূর্য ডুবে যেতেই ওরা মাকড়সা-শহরে রওনা হয়েছিল। হাওয়া ওইদিকে বইছিল সেই সময়ে। বেলুনে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বাচ্চাদের। বড়রা ওজনে ভারি বলে তাদের হাঁটতে হয়েছিল। সে অনেক দূরের পথ। সমুদ্র ঘুরে যেতে হয়েছিল, তাই আরও সময় লেগেছিল। তাড়াহুড়ো করেনি মাকড়সারা। সবকটা মানুষ যেন জ্যান্ত থাকে—নজর ছিল কেবল সেইদিকে।

নিপুল কান খাড়া করে শুনে যাচ্ছিল দুজনের বকবকানি। মাকড়সারা মানুষদের জ্যান্ত ধরে নিয়ে যায় কেন—এই প্রশ্নটার জবাব জানতে চেয়েছিল কয়েকবার। নিশ্চয় লোমহর্ষক কোনো উদ্দেশ্য আছে।

একটাই জবাব দিয়েছিল জোমো,—পোষবার জন্যে। মানুষকে দিয়ে মানুষ বাড়ানোর জন্যে।

—তুমি পালালে কি করে?

—বেলুনে চেপে।

—একা?

—না। আরও দুজন ছিল সঙ্গে। বুদ্ধিটা তাদেরই। মাকড়সাদের গোলামগিরি করতে হয়নি বলেই বুদ্ধি ভোতা হয়ে যায়নি।

—এই দুজনকে পেলে কোথায়?

—গোলন্দাজ গুবরেদের ঘাঁটিতে কাজ করত। ফূর্তিবাজ, বুদ্ধিমান।

—গোলন্দাজ গুবরে।

—দুমদাম আওয়াজ করতে পারলেই এরা খুশি—আর কিছু চায় না। বিস্ফোরণ যত জোরালো হবে ততই আমোদ এদের। বুদ্ধিমান মানুষ দরকার হয় সেইজন্যেই। মাকড়সারা কিন্তু চায় ভোঁতাবুদ্ধির মানুষ—মাথা

মোটা হবে, শরীরটাও মোটা হবে।

—দুমদাম আওয়াজ আর ধোঁয়া, এই নিয়েই খুশি গোলন্দাজ গুবরেরা ?

—হ্যাঁ। দক্ষ মানুষদের ওরা খাতির করে এইজন্যে। সুকু আর বিমা ছিল এইরকম বিস্ফোরণ কারিগর। গ্যাস ঠেসে বেলুন ওড়াতে হয় কি করে, ওরা তা জানতো। গ্যাসটার নাম হাইড্রোজেন। আমি জানতাম মেয়েরা বেলুন তৈরি করে কোথায়।

—মেয়েরা বেলুন তৈরি করে ?

—মেয়েরাই বানায়। তদারকি করে মাকড়সারা। একটা গুদোমে কয়েকশ বেলুন তৈরি থাকে সবসময়ে। তিনজনে হনহন করে হেঁটে গিয়ে তুলে নিলাম তিনখানা বেলুন। মাকড়সা পাহারাদাররা পথ আটকায়নি। ওরা ভেবেছিল হুকুম হয়েছে বলে বেলুন নিয়ে যাচ্ছি। পালানোব জন্যে নিয়ে যাচ্ছি, একথা ভারতেও পারেনি। মাকড়সাদের বেলুনে চেপে মানুষ পালিয়েছে—এরকম ঘটনা কখনো ঘটেনি। বেলুন নিয়ে সোজা বেরিয়ে এলাম গুদোমের বাইরে।

এই পর্যন্ত বলেই কথা জড়িয়ে গেল জোমোর। মিনিট পাঁচেক ঝিম মেরে থাকার পর বললে,—সুকু আর বিমা মারা গেল। সুকু-র বেলুন পড়ে গেল সমুদ্রে, বিমা-র বেলুন আটকে গেল জঙ্গলে। গ্যাস ফুরিয়ে গেছিল নিশ্চয়। শুধু আমার বেলুনটাই সমুদ্র আর জঙ্গল পেরিয়ে এসে পড়ল মরুভূমিতে।

—তারপর তোমাকে খুঁজতে আসেনি ?

আজও খুঁজছে। পেলেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।—শুকনো হাসি হেসে বললে জোমো।

ঘুমের মধ্যেও শিউরে উঠল ছোট বোন মারু। জোমো ভয় পেয়েছে। ভয়ের ঢেউ ওকেও ছুঁয়েছে। ভাগ্যিস অর্টিস গাছের রস খাওয়ানো হয়েছে, নইলে ভয়ের উৎস ধরে ঠিক চলে আসত মাবণ মাকড়সাদের বাহিনী।

সেদিন কিন্তু রওনা হওয়া গেল না। জোমোর অবস্থা মিনিটে মিনিটে খারাপ হচ্ছে। এতদিন যেসব কথা ব উকে বলেনি—গতকাল থেকে তা বলতে শুরু করেছে হাউ হাউ করে। শরীরের শেষ শক্তিটুকুও হু-হু করে ফুরিয়ে যাচ্ছে।

পরের দিন পড়ে রইল মড়ার মত। মারা গেল তার পরের দিন।

সারাদিন গেল কবর খুঁড়তে। ক্যাকটাস-জটলার তলায়। নিপুল,

নিজয়, নিবল—তিন জনেই হাত লাগালো।

সেইদিনই রাত্রে সিস চোখ বুঁজে মন স্থির করে যমজ বোনের *কথা* ভাবতে লাগলো। নিনা-র সঙ্গে মনে মনে কথা বলা দরকার। নিনা আর নটো শহরের খবর জানা দরকার। তাগাদা মেরেছে নিপুল।

কিন্তু কাজ হল না। ঘন্টাখানেক ধরে অনেক চেষ্টা করেও কোনো সাড়া এল না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো সিস। নিনা ওর যমজ বোন।

নিবল বললে,—নটো শহরে খানাপিনা, নাচগান আর ঘুমোনো ছাড়া কিছু হয় না। মনগুলো সব পাথর হয়ে গেছে।

তা ঠিক।—আর কথা বলল না সিস।

নিবল বলেছিল,—কালকেই পালাবো।

কেউ রাজী হয়নি। প্রথম কথা, নিবলের পা আরও ফুলেছে। হাঁটতেও পারছে না। দ্বিতীয় বাধাটা জোমোর মৃত্যুর পর এসেছে। এ গর্ত ছেড়ে যেতে মন চাইছে না।

উদ্বেগে ছটফট করছে নিপুল। মারণ-মাকড়সাকে ঠেঙিয়ে মেরেছে সে। মৃত্যুর ঠিক আগের আধ মিনিটে একদৃষ্টে তার দিকেই চেয়েছিল আটপেয়ে দানব। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই মাকড়সা-রাজার কাছে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়।

মনে পড়ছে, নটো শহর থেকে ফেরার পথে দুটো বেলুনকে উড়ে যেতে দেখেছিল মাথার ওপর দিয়ে। একটার আরোহীকে সে খুন করেছে। অন্যজনের মুখে নিশ্চয় খুনের খবর পেয়ে গেছে মাকড়সা-রাজা।

তারপর সে অবশ্যই বসে নেই। জোমো মরবার আগে তো বলেই গেল—মাকড়সা মেরেছিল বলে মরুভূমির এক দঙ্গল মানুষকে কিভাবে খতম করেছে মারণ-মাকড়সা। বড় ভয়ঙ্কর, বড় নিষ্করুণ ওদের প্রতিহিংসা নেওয়ার পালা।

রাজা নিকাডো মনে করে তার রাজ্যে হানা দেওয়া সম্ভব নয়। দুর্ভেদ্য পাতাল দুর্গে মাকড়সার প্রবেশ একেবারেই অসম্ভব।

নিপুল কিন্তু জানে ধারণাটা ভুল। মাকড়সাদের ইচ্ছাশক্তি যে কতখানি প্রচণ্ড হতে পারে—নিজের হাতে মাকড়সা মারতে গিয়ে তা বুঝেছে। বার বার অদৃশ্য ধাক্কা মেরে ওকে ঠিকরে ফেলে দিতে চেয়েছে।

☐ সাত ☐

জোমো-র মৃত্যুর পর কেটে গেল সাত দিন। মাকড়সা বেলুন আকাশ চষে বেড়িয়েছে এই কদিন। অর্টিস গাছের রস চেটে এরা নিজেদের মন নিস্তরঙ্গ রেখেছে। বাচ্চা দুটোকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। ভয় ঠিকরে যাচ্ছে না বলে মাকড়সারা হদিশ পাচ্ছে না কিছুতেই। কিন্তু একই অঞ্চলে বারবার ওরা টহল দিয়ে যাচ্ছে কেন ?

সপ্তমরাতে ঘুমোতে গিয়ে আচমকা জবাবটা এসে গেল মাথার মধ্যে।

মিমি . . . শুধু মিমি জানে ওদের এই গর্তের ঠিকানা। মিমি কি মাকড়সাদের খপ্পরে পড়েছে ? এখানকার ঠিকানা বলে দিয়েছে ?

কী আশ্চর্য ! একই সময়ে বিছানায় উঠে বসল নিবল। দু চোখের পাতা পুরো খুলে গেছে। একই ভয় তার মনেও। ফিসফিস করে বললে,—এখানে আর একটা দিনও নয়।

কখন বেরোবে ?—উৎকণ্ঠায় শুকনো মুখে বললে সিস।

– আজ সন্ধ্যে হলেই। খামোকা সাতদিন নষ্ট করলাম। নিবল-এর গোদা পায়ের দিকে আঙুল তুলে বললে নিপুল, টেনে নিয়ে যেতে পারবে ? অনেকটা পথ।

—অন্য উপায়ও তো নেই।

নিজয় বললে,- গাজু গাছের পাতা দরকার।

গাজু গাছ জন্মায় মরুভূমির কিনারায়। দারুণ ওষুধের কাজ করে এর পাতা। দলা পাকিয়ে ঘায়ের ওপর লাগিয়ে দিলে ফুলো কমে যায় ঘন্টা কয়েকের মধ্যে।

নিপুল বললে,—নটো শহর থেকে আসবার সময়ে এক জায়গায় দেখে এসেছি একটা গাছ।

--আমি যাবো তোর সঙ্গে।

বাধা দিল নিবল,—না। তোর থাকা দরকার। অনেক কাজ বাকি। নিপুল বড় হয়েছে– একাই যেতে পারবে।

খেয়ে নিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ল নিপুল। সঙ্গে নিল একটা ঝুড়ি—পাতা নেওয়ার জন্যে। লাউ-এর খোলা ভর্তি খাবার জল। আর ধাতুর চোঙা। ওজনে ভারি এই চোঙা হাতে থাকলে যে কোনো পোকাকে ঘায়েল করতে পারবে একাই। কোমরে রইল ছুরি।

ঘন্টা দুয়েক সতর্কভাবে হেঁটে যাওয়ার পর দেখল গাজু গাছটাকে। চার ফুট উঁচু। চওড়া পাতা ঝকঝক করছে রোদে।

এমন সময়ে একটা ছায়া ভেসে গেল মাথার ওপর দিয়ে। হেঁট হয়ে ঝুড়িতে পাতা রাখছিল নিপুল। মাথা না তুলেও বুঝল কি চলে গেল ওপর দিয়ে।

মাকড়সা-বেলুন।

মন পুরোপুরি কব্জার মধ্যে রয়েছে, তাই ভয় পেল না নিপুল।

আবার একটা ছায়া ভেসে গেল। আবার। আবার।

পাঁচ মিনিট পরে ঘাড় বেঁকিয়ে নিপুল দেখলে শেষ বেলুনটা মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। যেদিকে যাচ্ছে সেইদিকেই রয়েছে নিপুলের বাবা, মা, দাদা আর দুই বোন।

কেন যাচ্ছে, তা এখন পরিষ্কার।

আচমকা নিজেকে বড় অসহায় মনে হল নিপুলের। গোটা দুনিয়াটা যেন খানখান হয়ে গেল চোখের সামনে। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত যাদের স্নেহে

সে এত বড় হয়েছে, তাদের অবস্থা একটু পরেই কি হতে চলেছে—সে ভ'বনা ওকে দিশেহারা করে দিল পলকের মধ্যে।

দৌড়ালো গর্তের দিকে। দু'ঘন্টার পথ পেরিয়ে এল এক ঘন্টায়। দূর থেকে অরগ্যান ক্যাকটাসের ঝোপ দেখে আনন্দে নেচে উঠল মন। কিন্তু আনন্দ মিলিয়ে গেল আরও একটু কাছে আসতেই। গর্তের মুখের ঢাকনা-প্যাথর উল্টে পড়ে রয়েছে। যে কাঁটাঝোপ চাপা থাকে পাথরটার ওপর—সেটা রয়েছে দশ ফুট দূরে।

তার পাশেই পড়ে একটা দেহ। মুখটা কালো। ফুলে ঢোল। দেহটা বাবার। মাকড়সা-বিষের কাজ শুরু হয়ে গেছে এর মধ্যেই।

গর্তের মধ্যে জিনিসপত্র পরিপাটিভাবে সাজানো। কিন্তু মানুষ নেই। ধস্তাধস্তির চিহ্নও নেই। যেন সবাই কাজে বেরিয়েছে—ফিরে আসবে এখুনি।

কিন্তু কেউ আব ফিরবে না। বদলা নিয়ে গেল মারণ-মাকড়সারা। নিপুল যে মেরেছে তাদের একজনকে !

নিপুল এখন কি করবে ?

একটা পিদিম নিয়ে গর্তের ভেতরে গেল নিপুল। কেউ নেই। পোষা পিঁপড়েগুলোও উধাও। গর্ত এখন ফাঁকা। নিজের বিছানায় এসে বসল। এই সময়ে চোখ পড়ল লাউ-এর খোলার দিকে। আর্টিস গাছের রস রয়েছে ভেতরে।

বেরিয়ে এল গর্তের বাইরে। শক্ত বালিমাটিতে দাগ পড়ে না। কিন্তু নিপুলের চোখ শিকারী জানোয়ারের চোখের মতই ধারালো। দাগ দেখতে পেল ঠিকই। আটপেয়ে দানবরা গেছে সমুদ্রের দিকে।

বাবার মৃতদেহ তুলে নিয়ে এল গর্তের মধ্যে। মুখখানা আরও ফুলেছে। ঠোঁট কালো হয়ে গেছে। বিছানায় শুইয়ে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল নিপুল। এ কাপড় এনেছিল নটো শহর থেকে।

তারপর গুছিয়ে নিল নিজের জিনিসপত্র। ঝুড়ির মধ্যে খাবার ছিল—তুলে নিয়ে রাখল থলিতে। টেরিস্কোপ চোঙা রইল হাতে।

বাইরে এসে পাথর টেনে এনে চাপা দিল গর্তের মুখে। আরও ছোট পাথর কুড়িয়ে এনে বন্ধ করলো ছোটখাট ফুটোগুলো। কোনো পোকা যেন ভেতরে ঢুকতে না পারে। দীর্ঘ দশ বছর সে এখানে কাটিয়েছে। এখন থেকে থাকবে শুধু বাবা। ঘুমোক। সারাজীবন লড়ে গেছে। এবার ঘুমোক শান্তিতে।

আজ থেকে, এই মুহূর্ত থেকে, প্রতিশোধ নেওয়ার পালা শুরু হোক নিপুলের জীবনে।

☐ আট ☐

সূর্য এখন আগুন ঢালছে মাথার ওপরে। ঢালুক। বালির ওপর দাগ দেখে দেখে এগিয়ে চলল নিপুল। মন অদ্ভুত অবস্থায় পৌঁছেছে। বাঘা গুবরে কি কাঁকড়া বিছে সামনে এসে দাঁড়ালেও নিপুল আর ভয় পাবে না। ভয়কে জয় করলে মানুষ এইরকম বেপরোয়া হয়।

বালিতে পায়ের দাগ এখন স্পষ্ট। নিজয় আর সিস-এর পায়ের ছাপ বালির মধ্যে কেটে কেটে বসে গেছে।

মাকড়সাদের পায়ের ছাপ অনেক। গুণে শেষ করা যাচ্ছে না। দূর দিগন্তে চেয়ে চোখ ব্যথা করে ফেলল নিপুল। দেখতে পেল না কাউকে।
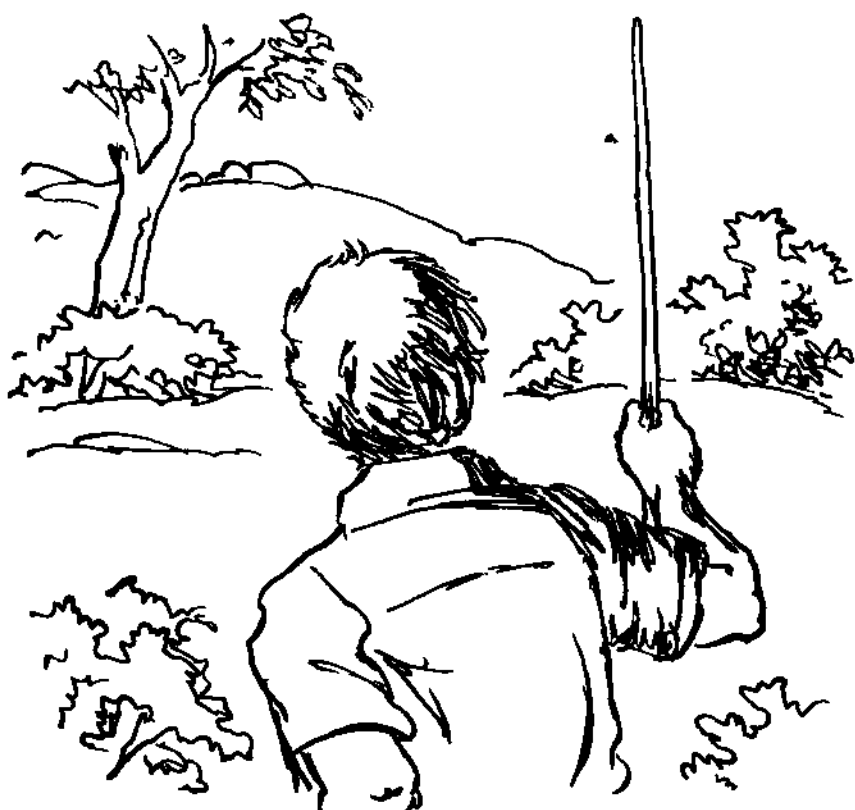
বালিতে এবার আগ্নেয়গিরির নুড়ি বেশি। বাঁদিকে বহুদূরে দেখা যাচ্ছে মরা আগ্নেয়গিরিগুলোকে। জমি একটু একটু করে ওপর দিকে উঠছে—পাহাড় রয়েছে সামনে। ডানদিকে পিঁপড়েদের দেশ। বাচ্ছা

পিঁপড়েদের এখান থেকে চুরি করে নিয়ে গেছিল নিজয়।

জমি তেতে আগুন। বাতাসে হলকা। তবুও নিপুল নির্বিকার। শরীরের কষ্টকে গ্রাহ্য করছে না। সময়ের হিসেব পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। তাই সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে দেখে একটু অবাক হল। এত তাড়াতাড়ি দিন ফুরিয়ে গেল ?

পাহাড় অনেক কাছে এসে গেছে। পাথরের রঙ লালচে হয়ে যাচ্ছে। এক-একটা পাথর থামের মত লম্বা প্রায় একশ ফুট উঁচু। তলায় শুকনো ক্যাকটাসের ঝোপ।

অন্ধকার ঘনিয়ে এল। বড় পাথরের ফাঁকে শোবার জায়গা পাওয়া গেল। শুকনো খাবার কোঁৎ কোঁৎ করে গিলে কয়েক চুমুক জল খেতে না খেতেই ঘুম নামলো দু'চোখে। কাঁটাগাছের পাহারা রইল ফাঁকের মুখে।

ঘুম ভেঙে গেল ভোররাতে। কাঁটাগাছেব ফাঁক দিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। কানে ভেসে আসছে একটা কর্কশ শব্দ। পাথরে গা রগড়ে রগড়ে চলেছে শক্ত খোলার কোনো প্রাণী। নিশ্চয় কাঁকড়াবিছে।

উঠে বসল নিপুল। খড়মড় শব্দটা এখন কাঁটাঝোপের ওদিকে। তারপরেই সরে গেল ঝোপ। চাঁদের আলো ঠিকরে গেল কাঁকড়াবিছের পুঞ্জচক্ষুতে।

নিমেষে চোঙা টিপে লম্বা করে ফেলল নিপুল এবং সবেগে বর্শার মত বসিয়ে দিল পুঞ্জচক্ষুর মধ্যে।

ছিটকে গেল নিশাচর আততায়ী। চাঁদের আলোয় দেখা গেল পড়ি কি মরি করে ছুটছে। নিপুলকে সে দেখেনি, কিন্তু তার 'ছোবল' যে কি মারাত্মক—তা চোখ দিয়ে বুঝেছে।

চোঙাটাকে মুঠোর মধ্যে ধরেই ফের ঘুমিয়ে পড়ল নিপুল। চোখ খুললো ভোরের আলোয়। শুকনো মাংস আর জল খেয়ে বেরিয়ে পড়ল তক্ষুনি।

পাথুরে জমি ক্রমশঃ ওপর দিকে উঠছে।

একটু গিয়েই পাওয়া গেল ঝিরঝিরে জলের স্রোত। থলি থেকে কাঠের কাপ বের করল নিপুল। ঝর্ণার জলে ডুবিয়ে ভরে নিয়ে গলায় ঢালতেই শরীর বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। কনকনে ঠাণ্ডা জল। মাথার ঘোলাটে ভাবটাও কেটে যাচ্ছে।

লাফিয়ে জলে নেমে পড়ল নিপুল। মাথা ডুবিয়ে স্নান করে নিতেই ঝরঝরে হয়ে গেল দেহমন। উঠে এসে পাড়ে বসে জলের দিকে চেয়ে

রইল একদৃষ্টে। ভাবছে মায়ের কথা।

আচমকা জল আর আশপাশের দৃশ্য মুছে গেল চোখ থেকে। ও এখন দেখতে পাচ্ছে নিজয়কে। গ্যছের শেকড়ে মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছে। মুখটা হাঁ হয়ে রয়েছে। বড় ক্লান্ত।

পাশেই বসে মা। মুখে ঘাম আর ধুলোর কালো দাগ। চোখ উদ্‌ভ্রান্ত।

মারু আর রুবা নেই আশেপাশে।

চারটে মাকড়সা পাহারা দিচ্ছে চারদিকে। তাদের গায়ের রঙ বাদামী। লোমগুলোও বাদামী। পেট পাতলা –অন্য মাকড়সাদের মত নাদাপেটা নয়। মুখখানা অদ্ভুতভাবে মানুষের মত। চোয়াল আর ভাঁজ করা বিষদাঁত ঠিক দাড়ির মত ঝুলে রয়েছে। চোয়াল আর সামনের পাগুলোয় শক্তি যেন ফেটে পড়ছে। রোদ পোহাতে ভালবাসে নিশ্চয় এই মাকড়সারা রোদের দিকে ফিরে বসবার সময়ে অবলীলাক্রমে অতবড় শরীরটাকে ঘুরিয়ে নিল একজন। ব্যায়ামবীর আর খেলাধুলোয় পটু না হলে এভাবে শরীব নাড়ানো যায় না। পেশীর ক্ষমতা আছে বটে।

জায়গাটা পিঁপড়েদের দেশের মত ন্যাড়া নয়। গাছপালা রয়েছে। ঝোপঝাড় রয়েছে।

ঢুলছে নেকড়ে-মাকড়সা চারটে। ওদের মনের মধ্যে কি কাণ্ড চলছে, তাও টের পাচ্ছে নিপুল। কুঁড়ে মাকড়সা নয় এরা—খেটেখুটে শিকার ধরে। মনের গঠন আর চিন্তার ধরন—দুটোই মানুষের মনের গঠন আর চিন্তার ধরনের মতই।

নিপুলের মনের মধ্যে ভেসে উঠল অদ্ভুত একটা শহরের ছবি। বিশাল শহর। অবিশ্বাস্য রকমের উঁচু মিনার দেখা যাচ্ছে দিগন্ত পর্যন্ত, অজস্র জানালা রয়েছে প্রতিটি চৌকোনা মিনার-ইমারতে। মাকড়সার জাল ঝুলছে পাশাপাশি দুটো ইমারতের মধ্যে। তন্তুগুলো দড়ির মত মোটা। বিচিত্র এই মিনার-ইমারতগুলোর একটা মধ্যে বিরাজ করে এমন একটা সত্ত্বা যার নাম করলেই রক্ত জল হয়ে যায় প্রত্যেকের। ভয়টা কি কারণে, তা জানতে গিয়ে নিপুল দেখল সে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড অন্ধকার হলঘরের মধ্যে। কয়েকশ মাকড়সার জাল ঝুলছে চারপাশে। সুড়ঙ্গ তৈরি হয়ে গেছে ঝুলন্ত জালের তলায়। সুড়ঙ্গের শেষে অন্ধকার কোণে বসে একটা মারণ-মাকড়সা সীমাহীন কৌতূহলে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

শিউরে উঠেছিল নিপুল। দুচোখ বন্ধ করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেল মনের ছবি। চোখ খুলতেই সামনে দেখল ঝর্ণার জল। পাশের

পাথরে সবুজ শ্যাওলা।

রোদের আঁচ বাড়ছে, অথচ বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে নিপুলের শরীর। লালচে বালিপাথরের দেশে বসে থেকেও মাকড়সার জালের জঙ্গল আর শীতল কালো চোখের চাহনিকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না মন থেকে।

চনমনে খিদে টের পেল তক্ষুনি। এতদিন যেন ঘুমের ঘোরে হেঁটেছে। বাবার শোকে কি রকম যেন হয়ে গেছিল। মনের মধ্যে যেন মেঘ ঘনিয়েছিল— সে মেঘ এখন কেটে গেছে।

একটাই ইচ্ছে এখন মাথা চাড়া দিচ্ছে মনের মধ্যে। মা-কে দেখতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। দাদা আর বোনেদের সাহায্য করতে হবে। আর দেরি নয়। নেকড়ে-মাকড়সাদের হাতে বন্দী হবার সম্ভাবনা আছে ঠিকই—কিন্তু ভয় পেয়ে পালাবে কেন?

অল্প বয়েসের এই দোষ। সামনে বিপদ আছে জেনেও ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছেকে রোখা যায় না।

উঠে পড়ল নিপুল। ঘন্টাখানেক লাগল চূড়োর কাছে পৌঁছোতে। বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে পেছনের প্রান্তরের দিকে তাকালো নিপুল। ধূসর মরুভূমি দিগন্ত পর্যন্ত ধু-ধু করছে। আজন্ম ওইখানেই কাটিয়েছে নিপুল।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অতিকষ্টে উঠে এল চূড়োয়। তার পরেই মুখে লাগল অদ্ভুত হাওয়ার ঝাপটা। মরুভূমিতে এরকম স্বাদের হাওয়া কখনো পায়নি নিপুল। এরকম দৃশ্যও কখনো দেখেনি।

পাহাড়ি পথ সোজা নেমে গেছে ঘন সবুজ জঙ্গলের মধ্যে। তার ওদিকে নীল সমুদ্র। যতদূর দেখা যায়— শুধু জল আর জল। এত দূরেও নোনা জলকণা ভেসে আসছে বাতাসে।

বিহ্বল হয়ে তাকিয়েছিল নিপুল। হতভম্ব হয়ে গেছিল কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর ধেয়ে গেল নিচের দিকে। দৌড়ে নামতে গিয়ে টাটিয়ে গেল পায়ের পেশী। দুপাশের বড় বড় পাথরগুলোর আড়ালে হয়তো ওৎ পেতে আছে নেকড়ে-মাকড়সারা। অনেকবার তা মনে হলেও থমকে দাঁড়ালো না একবারও।

পাহাড়ি ঢাল এবার শেষ হয়েছে। ঘন্টা দুয়েক একনাগাড়ে দৌড়ে তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে। তাই থলি থেকে লাউ-এর খোলা বের করে গলায় জল ঢালতে যাচ্ছে, অমনি কানের কাছে শুনল মায়ের গলা,—নিপুল, ফিরে যা!

হাত থেকে পড়ে গেল লাউ-এর খোলা। জল গড়িয়ে গেল পাথরে।

কেউ নেই আশেপাশে।

জঙ্গল এখনও দূরে। অথচ মা কথা বলল যেন একদম কানের কাছে।

কাঁপছে নিপুল। দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। বসে পড়লো রাস্তায়। একদৃষ্টে চেয়ে রইল দূরের জঙ্গলের দিকে। মা ওখানে আছে। তার কথা ভাবছে।

আবার সেই বকুনি, ফিরে যা ! ফিরে যা !

এবার আর ভুল হয়নি। কথাটা মাথাব মধ্যে শুনছে নিপুল। মা নিশ্চয় তাকে দেখছে। দেখছে নেকড়ে-মাকড়সারাও।

আর আটকে রাখা গেল না গোঁয়ার নিপুলকে। একলাফে দাঁড়িয়ে উঠেই ছুটে গেল জঙ্গলের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল অস্পষ্ট একটা রেখাকে বিদ্যুতের মত ছুটে যেতে। পরের মুহূর্তেই শূন্যে উঠে গেল ওর পুরো দেহ- আছড়ে পড়ল পাথরে।

নিপুল এখন চিৎ হয়ে পড়ে আছে। নেকড়ে-মাকড়সা ঝুঁকে রয়েছে মুখের ওপর। সামনে লোমশ পা দু'খানা দিয়ে চেপে রেখেছে ওর দু'হাত। হিমশীতল চাহনির মানে একটাই নড়লেই চোয়ালের বিষদাঁত বসে যাবে ঘাড়ে। অবশ হবে স্নায়ু।

নিশ্চল হয়ে গেল নিপুল। আক্রমণের ইচ্ছে নেই—তা বুঝিয়ে দিল নিজে চুপচাপ থেকে।

হাল্কা সোলার মত তাকে শূন্যে তুলল নেকড়ে-মাকড়সা। আঠালো তন্তু দিয়ে ঝট করে বেঁধে ফেলল দুহাত। আর একটা মাকড়সা এগিয়ে এসে বাঁধল দু'খানা পা। তারপর পিঠের ওপর ফেলে নক্ষত্রবেগে ধেয়ে গেল জঙ্গলের দিকে।

ঝাঁকুনির চোটে হাড়গোড় যেন খুলে এল নিপুলের। এত বেগে সে কখনো ছোটেনি।

আপনা থেকেই চোখ বন্ধ হয়ে এল—দাঁতে দাঁত পিষে ঝাঁকুনি সহ্য করে গেল নিপুল।

চোখ খুলেই দেখল, মা ঝুঁকে রয়েছে মুখের ওপর। ও শুয়ে রয়েছে। নেকড়ে-মাকড়সা পাশে দাঁড়িয়ে ভাবলেশহীন কালো চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে।

নিপুল বুঝল, অজ্ঞান হয়ে গেছিল মাকড়সার পিঠে। তাই তার হাত-পায়ের বাঁধন খোলা। আঠালো তন্তু টেনে খুলতে গিয়ে চামড়া পর্যন্ত

ছিঁড়ে গেছে। জ্বালা করছে। নিজয় ওকে ধরে বসিয়ে দিল। নির্বিকারভাবে এখনও চেয়ে আছে নেকড়ে-মাকড়সা। এতটা পথ এত জোরে দৌড়ে এসেও হাঁপাচ্ছে না। কালো চোখের নিচে সারবন্দী ছোট চোখগুলোকে অদ্ভুত আঁচিলের মত মনে হচ্ছে। চোয়াল আর ভাঁজকরা বিষদাঁত গুটিয়ে রয়েছে যেন বিতৃষ্ণায়।

নিজয় বললে,—হাঁটতে পারবি ?

পারবো। বলে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায় নিপুল। কেঁদে ফেলল সিস।

পিঠের থলি এখন মাটিতে পড়ে। খুলে ফেলে সামনের পা দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখছে একটা নেকড়ে মাকড়সা। ধাতুর চোঙাটা তুলে নিল, তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, ফেলে দিল পাসের শুকনো খাবারের গাদায়।

ঠিক এই সময়ে নিপুল টের পেল, আর একটা নেকড়ে-মাকড়সা ওর মনের কথা বোঝবার চেষ্টা করছে। নিজের মন দিয়ে ওর মনের মধ্যে হাতড়াচ্ছে। নিপুলের জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করা হচ্ছে বলে নিপুল রেগে যাচ্ছে কিনা বুঝতে চাইছে।

আচমকা চনমনে হয়ে উঠল চারটে মাকড়সাই। একজন ছিটকে গেল দূরের কাঁটাগাছটার দিকে। জাল পেতে রেখেছিল নিচের দিকে। একটা বড় সাইজের গঙ্গাফড়িং আটকেছে সেখানে। নেকড়ে-মাকড়সা বিষদাঁত বসিয়ে অসাড় করে দিল তাকে তৎক্ষণাৎ। জাল কেটে দেহটাকে টেনে এনে খেতে বসে গেল একটুও দেরি না করে।

নিপুল দেখছে আর শিখছে এইসব কিছু থেকেই। নেকড়ে-মাকড়সা ছুটে গিয়ে শিকার ধরতে ভালবাসে। উপায় নেই বলেই জাল পেতে

শিকার ধরছে। কানে কালা হলেও আতঙ্কের অনুকম্পন ঠিক টের পেয়েছে।

এই ফাঁকে আসল কথাটা জিজ্ঞেস করে নিল নিজয়কে, -মারু আর রুবা কোথায় ?

--বেলুনে চাপিয়ে নিয়ে গেছে।

—পোষা পিঁপড়েগুলো ?

এদের পেটে।– নেকড়ে-মাকড়সাদের দেখিয়ে বললে নিজয়।

সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে সজোরে ধাক্কায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেল নিপুল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে বিষদাঁত উঁচিয়ে খাড়া একটি নেকড়ে-মাকড়সা। ভাবখানা যেন ঃ কথাবলা একদম বারণ।

চুপচাপ পড়ে রইল নিপুল। নেকড়ে-মাকড়সা তখনও বিষদাঁত উঁচিয়ে রয়েছে। একই সঙ্গে খোঁচাচ্ছে নিপুলের মনের মধ্যে। হাতড়ে দেখছে, নিপুল পাল্টা মার দিতে চায় কিনা। ওর মনে তখন রাশি রাশি উদ্বেগ ছাড়া কিচ্ছু নেই। জিঘাংসা থাকলে রেহাই পেত না-- মাকড়সারা ঠিক তা টের পায়।

সামনের পা দু'খানা দিয়ে থলি দেখিয়ে নিপুলের দিকে কালো চোখ মেলে চেয়ে রইল মারকুটে মাকড়সা। নিমেষে বুঝল নিপুল। নিঃশব্দে হুকুম আসছে ঃ থলি গুছিয়ে নাও।

নিপাট ভালো ছেলের মত থলি গুছিয়ে নিল নিপুল। বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছে এই চিন্তাকে সযত্নে তাড়িয়ে রেখেছে মন থেকে। যারা কানে শুনতে পায় না, চোখে ভালো দেখতে পায় না, তাদের অনুভূতি শক্তি অতি তীব্র তো হবেই। সুতরাং কোনোরকম হিংসাত্মক চিন্তাকে মনে ঢুকতে দেওয়া এখন নিরাপদ নয়।

নিপুলের এই বিচক্ষণতা কাজ দিল পদে পদে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার শুরু হল পায়ে হাঁটা। মাকড়সা চারটে মন্থর গতিতে চলেছে পাশে। নিপুলের সঙ্গে নিজয় আর সিস। নিপুল পিঠের থলি নিয়ে জোরে যেতে পারছে না দেখে একটা মাকড়সা থলি তুলে নিল নিজের পিঠে।

এত সবুজের সমারোহ নিপুল কখনো দেখেনি। উপকূল বরাবর গভীর জঙ্গল। বহুযুগ আগে মানুষ এখানে চাষবাসও করেছে। অনেকগুলো খামারবাড়ির ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ল যাবার পথে।

একঘন্টা পর সূর্য ডুবে গেল। এবার রাত কাটানোর পালা। তিনজন

শুয়ে পড়ল মাটির ওপরেই। একটা নেকড়ে-মাকড়সা একটা নিচু গাছ ঘিরে মিহি জাল পেতে রাখল। তারপর সবাই মিলে ঘিরে বসর এদের তিনজনকে। সবচেয়ে বড় মাকড়সাটা রুটিন মাফিক হাতড়ে গেল মনের ভেতরে। নিপুল, নিজয়, সিস—তিনজনেই তখন নিজেদের দুর্ভাগ্য নিয়ে বিষণ্ন।

নিপুল কিন্তু এর মধ্যেই মাকড়সাদের মন হাতড়ে নিয়েছে। ক্ষিধে মেটানো ছাড়া এদের মনে এই মুহূর্তে আর কোনো চিন্তা নেই। প্রবৃত্তির দাস এরা। কোটি কোটি বছর ধরে খুঁজে পেতে শিকার পাকড়াও করেছে- বিষদাঁত ফুটিয়েছে। এছাড়া আর কোনো আকর্ষণই নেই এদের জীবনে। এই মুহূর্তে মানুষ তিনটেকে ছিঁড়ে খেতে ইচ্ছে করছে তিনজনেরই। জ্যান্ত খাবারের প্রাণশক্তিকে এরা কাজে লাগায়। কিন্তু একটা বিরাট ভয় ওদের এই প্রবৃত্তিকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ভয়টা সেই মারণ-মাকড়সা—সুড়ঙ্গে যার অধিষ্ঠান।

নিপুলদের কপাল ভালো, ঠিক এই সময়ে ছটা মাছি, দুটো বোলতা আর একটা প্রজাপতি আটকে গেল আঠালো জালে। চক্ষের নিমেষে তাদেরকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলল চার মাকড়সা। এখন ওদের পেট ঠাণ্ডা, মন বেশ উজ্জ্বল।

নিপুলের মনের মাকড়সা-ভীতি কেটে যাচ্ছে। কাছ থেকে দেখে ও অনেক শিখেছে। মাকড়সা হলেই যে বিভীষিকা হবে- এতদিনের এ শিক্ষা একদম ভুল।

ভোরের দিকে ফুরফুরে হাওয়ায় নিপুলের ঘুম ভাঙল সবার আগে। সমুদ্রের হাওয়া এত মিষ্টি হয় ? সমস্ত শরীর চাঙা হয়ে উঠেছে একরাতেই।

সূর্য উঠে পড়েছে অনেক আগেই। রোদের আঁচে গা গরম করছে ম্যাকড়সা চারটে। এত গরমও এদের দরকার ?

সিস আর নিজয় উঠে পড়ল। শুকনো খাবার খেল তিনজনে।

একটু পরে সুপুরুষ একজন মানুষ লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল ওদের দিকে।

লোকটা এসেই মাথা হেঁট করে সবিনয়ে দাঁড়িয়ে গেল পালের গোদা বড় মাকড়সাটার সামনে। ভাবখানা যেন ঃ গোলাম হাজির, যাবার হুকুম হোক !

পালের গোদা খুব চটেছে। হিমশীতল চোখে চেয়ে থেকে যেন বলছে, – এত দেরি কেন ?

আরও মিইয়ে গেল তালঢ্যাঙা লোকটা। অথচ তার বিশাল চেহারা দেখবার মত। ফুলে ফুলে উঠছে বুকের, হাতের ঘাড়ের পেশী।

রুষ্ট ভঙ্গিমায় নিঃশব্দে তীব্র হুকুম দিলে ধেড়ে মাকড়সা,—চলো।

নিপুল ভেবেছিল, ছ-ফুট লম্বা লোকটা এবার আলাপ জমাবে মানুষ তিনজনের সঙ্গে। হেসে কথা বলবে, সমবেদনা জানাবে।

সে সবের ধার দিয়েও গেল না দীর্ঘকায় পুরুষ। পরনে তার বোনা কাপড়ের পোশাক। কপাল ঘিরে ধাতুর পটি। নেকড়ে-মাকড়সা সামনের পা নেড়ে হুকুম দিতেই কলের পুতুলের মতো সে ঘাড়ে ফেলল নিপুলের ভারি থলিটা। কিন্তু একবারও ফিরে তাকালো না নিপুল, ওর মা আর দাদার দিকে। চোখ দুটোয় তেজ বলে কোনো পদার্থ নেই। কাজকর্ম কিন্তু বেশ ক্ষিপ্র, তবে সেটা আত্মবিশ্বাসের দরুণ নয়—ট্রেনিং পাওয়া যে কোনো জানোয়ার এইরকম চটপটে হয়। নিজে মানুষ হয়েও যে লোক তিন-তিনজন মানুষ কয়েদীর দিকে ফিরেও তাকায় না, তাকে কি বলবে নিপুল ? অ-মানুষ ?

পালের গোদা নেকড়ে-মাকড়সা হুকুম দিয়েছে সামনে এগিয়ে যেতে। লম্বা-লম্বা পা ফেলে হনহনিয়ে চলেছে সুপুরুষ দীর্ঘকায় লোকটা। নিপুল, নিজয় আর সিস প্রায় ছুটে চলেছে তার পেছন পেছন। মাকড়সা চারটে মন্থর গতিতে আসছে সবার পেছনে।

এই সময়ে একটা দুষ্টু বুদ্ধি সুড়সুড় করে ওঠে নিপুলের মগজে। নেই-কাজ-তো-খই-ভাজ গোছের কজ্জাতি বুদ্ধি। ওর নিজের মনের শক্তিটা একবার যাচাই করে নিলে হয় না সামনের ওই ক্যাবলাকান্ত আর পেছনের দানো-পোকা চারটের ওপর ?

সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে ছবি আঁকে নিপুল—মস্ত একটা পাথর তুলে নিয়ে আছাড় মারছে পালের গোদা নেকড়ে-মাকড়সার মাথায়।

একটু ঘাড় ফিরিয়ে আড়চোখে দেখল, নির্বিকার রয়েছে পালের গোদা।

অর্থাৎ নিছক ভাবলে চলবে না—সত্যিকারের জিঘাংসা আনতে হবে মনের ছবির মধ্যে।

কল্পনাকে এবার ইচ্ছে করেই বেশ জোরদার করে তোলে নিপুল। সত্যি সত্যিই যেন একটা ভারি পাথর মাথার ওপর তুলে সজোরে আছাড় মারছে পালের গোদার মাথায়।

এবারে প্রতিক্রিয়াটা হল আশ্চর্য রকমের। উসখুস করে ওঠে পালের

গোদা। অস্বস্তি এসে গেছে হাবভাবে। চঞ্চলভাবে তাকাচ্ছে এদিক ওদিকে। চোখ বুলিয়ে নিলে নিপুলের ওপরেও।

মনে মনে একচোট হেসে নিয়ে এবার সামনের অ-মানুষ লোকটার ওপর পরীক্ষা চালালো নিপুল।

কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও লোকটার মনের নাগাল পেল না। মরুভূমির ধূসর মাকড়সার মনের মতনই এর মন দানা পাকায়নি—বাইরের কোনো সাড়া সেখানে ঢেউ তুলতে পারে না। বারবার চেষ্টা করার পর হাল ছেড়ে দিল নিপুল।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতেই রাত ঘনিয়ে এল। ভোরে উঠে আবার বেশ কিছুটা পথ যাওয়ার পর নিপুলের কানে ভেসে এল গাংচিলের কর্কশ চিৎকার। লাফিয়ে উঠল বুকের ভেতরটা। মরুভূমির নিস্তব্ধ রাজ্যে এরকম আওয়াজ তো কখনো শোনেনি।

মিনিট দশেক পরেই একটা উঁচু টিলার ওপরে উঠে সামনে দেখা গেল সমুদ্র। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল নিপুল। নটো শহর থেকে ফেরবার পথে বিশাল হ্রদ দেখেছিল। সমুদ্রের এই বিশালতার সঙ্গে তার তুলনা হয় না।

তীরের কাছে সাদা ফেনা ঘিরে রয়েছে তিনটে ছোট নৌকোকে। বালির ওপর শুয়ে রয়েছে কয়েকজন মানুষ। নিপুলের সঙ্গের লোকটা হেঁকে উঠতেই তারা টপাটপ উঠে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে গেল মাকড়সা চারটের সামনে। যেন কেনা গোলাম। নিপুল অবাক হয়ে দেখল এদের মধ্যে মেয়েমানুষও রয়েছে। তাদের মাথার চুল মায়ের চুলের চাইতেও লম্বা। কেউই কিন্তু বন্দী মানুষ তিনজনের দিকে তাকাচ্ছে না। আড়ষ্টভাবে তাকিয়ে রয়েছে সিধে সামনের দিকে। এরই নাম মিলিটারি ডিসিপ্লিন। নিপুল তো অবাক হবেই। মরুভূমির স্বাধীন মানুষ সে—কারুর হুকুমের ক্রীতদাস ছিল না কোনদিনই।

এরা যে ভাষায় কথা বলছে, তাও বুঝতে পারছে না নিপুল। চড়া গলায় হুকুম দিয়ে যাচ্ছে মাথায় ধাতুর পটি লাগানো লোকটা। দলের সর্দার নিশ্চয়। মোট তিনজন মেয়ে ছিল এদের দলে। তিনজনে গিয়ে বসল এক-একটা নৌকোয়। আটজন পুরুষ এগিয়ে এল মাকড়সা চারটের দিকে। আটখানা পা নিচের দিকে মুড়ে বালির ওপর থেবড়ে বসে পড়েছে চার মাকড়সা-ই। 'দুজন করে পুরুষ এদের ধরে মাথার ওপর তুলে ঢেউ-এর ওপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল নৌকোয়। নিপুল, নিজয়

আর সিস উঠলো তিনটে আলাদা নৌকোয়। পালের গোদা নোকড়ে-মাকড়সা আর তার এক স্যাঙাৎ রইল নিপুলের নৌকোয়।

প্রত্যেকটা নৌকো লম্বায় তিরিশ ফুট। তেরপলের মত পুরু কাপড়ের ছাউনি মাঝখানে। পালের গোদা নেকড়ে-মাকড়সা গুটিসুটি মেরে বসে সেখানে। তার স্যাঙাৎ রয়েছে একটা বেতের ঝুড়িতে। ভাবভঙ্গী দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সমুদ্র যাত্রায় রুচি নেই দুই দানবের। ডাঙাতেই যত কেরদানি—জলের ওপরে জবুথুবু।

টানা লম্বা বেঞ্চি রয়েছে নৌকোর দুপাশে। এপাশে বসল সাতজন পুরুষ—ওপাশে সাতজন। প্রত্যেকের হাতে দাঁড়। মেয়েটি এসে দাঁড়ালো একটা সামান্য উঁচু কাঠের মঞ্চে। হাত নেড়ে নেড়ে গান গাইতে লাগল অদ্ভুত সুরে। তালেতালে দাঁড় ফেলে গেল চোদ্দজন পুরুষ।

মেয়েটির ঠিক পেছনে বসে দুচোখ দিয়ে সব দৃশ্য গিলতে লাগল নিপুল। সবই তো তার কাছে নতুন।

দাঁড়িরা মাঝে মাঝে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। তা শুনছে নিপুল। মেয়েটির তাল-দেওয়া গানও শুনছে। শুনতে শুনতে বুঝল—ভাষাটা তার অজানা নয়। উচ্চারণ ভঙ্গিমাটা অদ্ভুত বলেই এতক্ষণ বোঝা যাচ্ছিল না।

মাকড়সা দুটোর অবস্থা অতি শোচনীয়। নৌকোর প্রতিটা দুলুনি তাদের আরও গুটিসুটি করে তুলছে। বেচারারা !

দুপুরের দিকে হাওয়ার জোর বেড়ে গেল। দাঁড়িরাও ক্লান্ত। মেয়েটার হুকুমে এরাই উঠে এসে মাস্তুল খাড়া করে দিল নৌকোর মাঝখানে। এখন দাঁড়িদের বিশ্রাম। খেতে বসেছে দলবেঁধে। খাবার এসে গেল নিপুলের হাতেও। খাসা খাবার। রুটি, বাদাম আর এক রকমের সাদা জলের মত জিনিস। জীবনে খায়নি বলেই দুধকে দুধ বলে চিনতে পারল না নিপুল।

পেটি ঠেসে খেতেই ঘুম এসে গেছিল নিপুলের। একঘুম ঘুমিয়ে উঠেই মনের মধ্যে টের পেল অদ্ভুত একটা ছটফটানি। পর মুহূর্তেই বুঝল, ছটফটানিটা তার নিজের নয়—মাকড়সা দুটোর। মন তাদের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় ভরে উঠেছে—রেশ আছড়ে পড়ছে নিপুলের মনে।

কারণ, হাওয়ায় বেগ বাড়ছে। অসম্ভব জোরে নৌকো ছুটছে। চারজন পুরুষ পাল টেনে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে। অন্য নৌকোদুটো আধ মাইল দূরে একই গতিবেগে ধেয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ বিশালা ঢেউ চলে গেল গলুই-এর ওপর দিয়ে। জলকণা আছড়ে পড়ল প্রত্যেকের ওপর।

মানুষরা নির্বিকার, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। কিন্তু নিঃসীম আতঙ্কে অবশ হয়ে গেছে মাকড়সা দুটো।

মেয়েটার হুকুমে সঙ্গে সঙ্গে পাল নামিয়ে দিয়ে দাঁড় টানতে বসে গেল চৌদ্দজন পুরুষ। ঠিক এই সময়ে বৃষ্টি নামল মুষলধারে। নিপুলের কাছে এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। এত আনন্দ সে জীবনে পায়নি। শুকনো মরুভূমির ছেলেকে আজ জল ঘিরে ধরেছে ওপরে-নিচে ডাইনে-বাঁয়ে।

আচমকা আবার জল চলে গেল মাথার ওপর দিয়ে। পুরো নৌকোটা জলের তলায় গিয়েও ভেসে উঠল তৎক্ষণাৎ। কনকনে ঠাণ্ডা মাংসল কি যেন একটা পায়ে ঠেকতেই শিউরে উঠেছিল নিপুল।

দানো মাকড়সা সামনের দু'পা দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে তার কোমর। জলের ধাক্কায় ভেসে এসেছে এতদূরে। আতঙ্কে মনের ক্ষমতাও হারিয়েছে। বিষদাঁত উঁচিয়ে ধরেছে, বাধা পেলেই ফুটিয়ে দেবে বলে।

জলের এই দাপাদাপিতে অদ্ভুতভাবে মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে নিপুল। নৌকো যে ডুববে না, তা বুঝে ফেলেছে। যে নৌকোর খোল এত চ্যাপ্টা, সে নৌকো ডোবে না। কিন্তু নিজেকে আটকে রাখা দরকার নৌকোর মধ্যে। তাই একগাছি দড়ি কুড়িয়ে নিয়ে চট করে একটা প্রান্ত বাঁধলো নিজের কোমরে। অন্যপ্রান্ত হালের চাকায়। মাকড়সা বুঝলো নিপুলের উদ্দেশ্য। তাই নিজে থেকেই জড়িয়ে ধরলো ওর কোমর। ঠিক তখুনি একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় টাল সামলাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেল নিপুল নিজেই।

আর ঠিক তখুনি আবার একটা ঢেউ ভেঙে পড়লো মাথার ওপর। এক ধাক্কায় গলুই-এর দিকে ছিটকে গেল নিপুল। সড়াৎ করে ছেঁড়া পাল ছিটকে এসে জাপটে ধরলো ওর গোটা শরীরটা এবং সবশুদ্ধ ঠিকরে গেল নৌকোর ওপর থেকে জলের মধ্যে। নিমেষে তলিয়ে গেল ছ-ফুট তলায়।

পাল খুলে গেছে গা থেকে ততক্ষণে। জলের ওপর মাথা তুলতে না তুলতেই দুটো লোমশ পা এগিয়ে এল ওর দিকে।

কোমরে বাঁধা দড়ি ধরে নিপুল তখন নৌকোর দিকে যাবে ঠিক করেছে--ঠিক এই সময়ে লোমশ পা দুখানাকে সামনে দেখেই দু-হাতে নিবিড়ভাবে চেপে ধরলো।

জলের মধ্যে মাকড়সার ভারি দেহ হাল্কা হয়ে গেছে। নিপুল কোমরে বাঁধা দড়ি দু হাতে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে নৌকোর দিকে। অনেকগুলো হাত নেমে এসে টেনে তুললো ওকে। সজোরে কাঠের গায়ে আছড়ে পড়ায়

মচাৎ করে ভেঙে গেল নেকড়ে-মাকড়সার সামনের একটা পা।

যেমন আচমকা ঝড় এসেছিল, চলেও গেল তেমনি আচমকা। নৌকোর ভেতরে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে সবকিছু। দড়ি, বালতি, পিপে—সব ভাসছে খোলভর্তি জলে। মাকড়সা দুটো মড়ার মত পড়ে রয়েছে এক কোণে। কে বলবে, ডাঙার শক্ত জমিতে এরাই মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে দাঁড়ায় মানুষের কাছে।

রোদ উঠে পড়েছে। নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। অন্য নৌকো দুটোকে দেখা যাচ্ছে না। তবে ডাঙার রেখা চোখে পড়ছে অনেক দূরে।

ঝড়ের তাণ্ডব এখন স্বপ্নের মতই মনে হচ্ছে। যে মাকড়সাটাকে এখুনি জল থেকে তুলে নিয়ে এল নিপুল, তার ভাঙা পা থেকে রক্ত ঝরছে। খালাসীরা কেউই কিন্তু কাছে ভিড়ছে না। শুধু ভয়ে নয়। পরম শ্রদ্ধায়ও বটে। মাকড়সা যে তাদের কাছে দেবতুল্য।

সুন্দরী মেয়েটা এগিয়ে এল নিপুলের দিকে। হাতে একটা সোনালি বাটি। হাসিমুখে এগিয়ে দিয়ে ইঙ্গিতে বললে খেয়ে নিতে। তরল পানীয়টার রঙও সোনালী। এক চুমুকেই শেষ করে দিল নিপুল। ক্লান্তি চলে গেল দেহমন থেকে।

হঠাৎ এত খাতিরের মানেটা এবার বোঝা গেল। পালের গোদা নেকড়ে-মাকড়সা কৃতজ্ঞ তার কাছে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে। তাই এই পানীয় উপহার। তাই সবার কাছে হঠাৎ শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছে নিপুল।

ঠিক এই সময়ে অন্য নৌকো দুটোকে দেখা গেল দিগন্তে।

মানুষের হাতে গড়া বন্দর এই রকম হয় ? বিস্ময়ে হতবাক নিপুল চেয়ে রইল বিস্ফারিত চোখে। পাহাড়-দুর্গের চাইতেও এর আকর্ষণ

অনেক বেশি।

পাথর কেটে তৈরি হয়েছে জেটি, মাল খালাস করাব ঘাটের শেষে কাঠের তৈরি অদ্ভুত কলকব্জা যেন আকাশ ছুঁতে চাইছে, বন্দরের ভেতরদিকে নোঙর ফেলেছে সারি সারি বড় নৌকো। মানুষই এককালে বিশাল এই বন্দর বানিয়েছিল। বড় বড় পাথর কেটে এই জাহাজঘাটা তৈরি করেছিল।

নৌকো থেকে লম্বা পাটাতন নামিয়ে দেওয়া হল জেটি পর্যন্ত। আগে নেমে গেল সুন্দরী মেয়েটা। মাকড়সা দুটোকে মাথায় তুলে নামানো হল তারপর। জেটি ভর্তি মানুষ সসম্মানে দাঁড়িয়ে রইল লাইন দিয়ে। ঠিক যেন দেবতাদের বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

নিপুলের হাত স্পর্শ করে ইঙ্গিতে একজন খালাসী বললে এর পরেই নামতে। কেউ কিন্তু ধরে বেঁধে নিয়ে গেল না। অবাক হল নিপুল। বন্দীকে এত খাতির কেন ? জেটিতে পা দেওয়ার পর অবাক হতে হল আর একবার। মানুষ-গোলামরা সসম্মানে দাঁড়িয়ে রইল দু'পাশে। শিরদাঁড়া খাড়া করে সোজা চেয়ে রইল সামনের দিকে। এতটা সম্মান তো আশা করেনি নিপুল।

এগিয়ে এল সুন্দরী মেয়েটা। এই প্রথম কথা বললে নিপুলের সঙ্গে,—কি নাম তোমার ?

—নিপুল।

—পয়মন্ত নাম।

—কেন ?

—মাকড়সাদের সুনজরে পড়েছো। কপাল খুলে গেল।

নিপুলের হাত ধরে মেয়েটি নিয়ে গেল জাহাজঘাটার ভেতরের দিকে। দু'পাশে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে অনেক মানুষ। কেউই ছ'ফুটের কম লম্বা নয়। এরকম বিশাল বলিষ্ঠ মানুষ নিপুল এর আগে দেখেনি। এদের তুলনায় সে কিছুই নয়। মাথায় তো মোটে পাঁচ ফুট—গায়ে গত্তি লাগেনি খিদের জ্বালায়। দৌড়ঝাঁপ করতে করতেই শরীর পাকিয়ে ফেলেছে।

কোথায় যাচ্ছি এখন ?—শুধোয় নিপুল।

বন্দরমালিকের কাছে।—বললে মেয়েটা।

জাহাজঘাটার শেষের দিকে রয়েছে একটা চৌকোনা বাড়ি। খয়েরি রঙের পেল্লায় পাথর দিয়ে তৈরি। ভাঙা বাড়িই বলা উচিত। জাহাজঘাটার

মতই তার ভগ্নদশা দেখে কষ্ট হয়। মেরামতির অভাবে পাথরের জোড় খুলে গেছে। প্রকাণ্ড জানালাগুলোকে ইঁটের দেওয়াল তুলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দরজা বন্ধ ছিল। মেয়েটি ধাক্কা মারলো পাল্লায়।

খুলে গেল কপাটি। সরে দাঁড়ালো একটা নেকড়ে-মাকড়সা।

আলো থেকে হঠাৎ অন্ধকারে ঢুকে প্রথমে এর বেশি কিছু দেখতে পায়নি নিপুল। তারপর দেখলো, দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা পেল্লায় ঘরে। স্যাঁৎসেঁতে ঘর। একদম ফাঁকা। ছাদের ফাটা থেকে সামান্য আলো ঢুকছে। আর একটু হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ত পালের গোদা নেকড়ে-মাকড়সাটার গায়ের ওপর।

একটা প্রকাণ্ড মাকড়সার জাল পায়ের কাছ থেকে উঠে গেছে ঘরের পেছন দিকে সিলিং-এর কোণ পর্যন্ত। ঢালু জালের ঠিক মাঝখানে গ্যাঁট হয়ে বসে একটা কালো মারণ-মাকড়সা। স্থির চোখে দেখছে নিপুলকে।

আচমকা আতঙ্কে বুক দুরদুর করে ওঠে নিপুলের। মুহূর্তের মধ্যে সেই আতঙ্কের ঢেউ আছড়ে পড়ে কালো মাকড়সার মনের ওপরে। একই সঙ্গে নিপুর টের পায়—ওর মনের মধ্যে হাতড়ানি শুরু করেছে কালান্তক কালো মাকড়সা। নেকড়ে-মাকড়সার মত আনাড়িভাবে নয়—বেশ পাকাপোক্তভাবে। ওস্তাদের খেলা শুরু হয়ে গেছে বুঝতে পেরেই হুঁশিয়ার হয়ে যায় নিপুল। মরুভূমিতে ওর হাতেই যে কালো মাকড়সা যমালয়ে গেছে—এ খবরটা ওর মন থেকে বের করে নিলেই সর্বনাশ।

তাই চকিতে মনটাকে উদাসীন করে তোলে নিপুল। মনকে একেবারে ফাঁকা করে দিয়েই তাঁবু-মাকড়সার মনের গঠনকে নকল করে নেয় হুবহু। সেই রকম ছাড়া-ছাড়া, আবছা, এলোমেলো।

বারবার হুল ফোটানোর মত সন্ধানী মনের খোঁচা এসে লাগে নিপুলের মনের আনাচে কানাচে।

তাঁবু-মাকড়সার মনের অনুকম্পন নকল করেই রেহাই পেয়ে গেল নিপুল।

মেয়েটার দিকে এবার চিন্তার হুকুম ছুঁড়ে দিলে কালো মাকড়সা,—নিয়ে যাও।

মাথা হেলিয়ে যেন দেবতা প্রণাম করে তক্ষুনি নিপুলকে নিয়ে বেরিয়ে এল সুন্দরী।

বললে,—কাঁপছো কেন?

সত্যিই কাঁপছিল নিপুল। ঘরের মধ্যে নিমেষে তাঁবু-মাকড়সারা মনের

অনুকম্পন সৃষ্টি করতে গিয়ে মনের ওপর ধকল গেছে প্রচণ্ড। সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে থেকে বেরিয়ে এসেই ভেঙে পড়েছে।

সত্যি জবাবই দিল তক্ষুনি,—ভয়ে।

—একদম ভয় পাবে না। চাকর-বাকরদের এরা রাজার হালে রাখে। আমি চলি। তুমি দাঁড়াও, অন্য নৌকো দুটো এখুনি এসে যাবে।

একটা কাঠের বাক্সে উঠে বসল নিপুল। নৌকোদুটো কখন আসবে, তার কোনো ঠিক নেই।

মানুষ গিজগিজ করছে জেটিতে, কিন্তু কেউ ওর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। প্রত্যেকেই এক-একটা পেশীর পাহাড়। হাতে পায়ে বুকে পিঠে কাছির মত ফুলে ফুলে উঠছে মাংসপেশী।

হঠাৎ বদ্‌বুদ্ধিটা আবার মাথা চাড়া দিল নিপুলের মগজে। মনটাকে সন্ধানী মনের মত সরু আর তীক্ষ্ণ করে নিয়ে আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে লাগলো প্রত্যেকের মনের মধ্যে।

অবাক হল কিন্তু ফল দেখে। এত খোঁচা খেয়েও মানুষগুলো নির্বিকার। মগজের মধ্যে রীতিমত দাপিয়ে যাচ্ছে নিপুল। কিন্তু কারও মুখে তার প্রতিক্রিয়া ফুটছে না।

কারণটা বুঝেছে নিপুল। মারণ-মাকড়সারা এদের মনকে ইচ্ছে করেই অসাড় করে রেখেছে। নিজেদের ইচ্ছে খাটাতে পারে না। অনবরত মন-কম্পনের খোঁচা খেয়ে জলের কয়েদীদের মতই ব্যাপারটা এদের কাছে গা-সওয়া হয়ে গেছে। পশুর মত কেবল খেটেই চলেছে। মানুষের মত ভাবনাচিন্তার ক্ষমতা হারিয়েছে।

একটু দূরে একটা বড় কাঠের বাড়ি দেখে এগিয়ে গেল নিপুল। ভেতরে একটা জাহাজ দাঁড়িয়ে। যে নৌকোয় এসেছে, তার চাইতে অনেক বড়। পাল আর মাস্তুল খাটানোই রয়েছে। মাল জাহাজ। বস্তা সাজানো ডেকে। গাঁট্টাগোট্টা লোকগুলো সেই বস্তা নামিয়ে আনছে জাহাজ থেকে জেটিতে। একজন লোক দাঁড়িয়ে তদারকি করছে। মাথায় সে বেশি লম্বা নয়—নিপুলের মতই। গায়ে হলদে কাপড়ের অদ্ভুত প্যাটার্নের জোব্বা। রঙ খুব কালো। নাক থ্যাবড়া। ঠোঁট পুরু।

লোকটার পেছনে গিয়ে দড়ির স্তূপের ওপর বসে পড়ল নিপুল। তারপর মনকে সরু করে ঢুকিয়ে দিল লোকটার ব্রেনে।

খোঁচাটা একটু বেশিমাত্রায় হয়ে গেছিল। আগের এক্সপেরিমেন্টগুলোর কথা মনে রেখেই বেপরোয়া খোঁচা মেরেছিল নিপুল। ফল পেল হাতে

হাতে।

ভীষণ চমকে উঠল লোকটা। যেন একটা অদৃশ্য চাবুক আছড়ে পড়েছে মুখের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে যায় নিপুল। আলতোভাবে মনের পরশ বুলিয়ে যায় তার মগজের কোণে কোণে। জোরালো আলো দিয়ে যেন উদ্ভাসিত করে চলেছে ব্রেনের সমস্ত অঞ্চল।

ঘুরে দাঁড়ালো লোকটা। চোখ ছোট করে চেয়ে রইল নিপুলের দিকে। সেকেন্ড কয়েক চেয়ে থাকার পর পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে বললে,—এ খেলা শিখেছো কার কাছে?

কী খেলা?—নিরীহমুখে বলে নিপুল।

- ন্যাকামো রাখো। কি নাম তোমার?

—নিপুল।

—আমার নাম হরিশ। বাছাধন, বিদ্যেটা শিখলে কোত্থেকে?

—কোন বিদ্যার কথা বলছো?

—ফের ন্যাকামি। হোক আর একবার, এবার আমি তৈরি।

দুষ্টুমি পেয়ে বসল নিপুলকে। হরিশের চোখে চোখে চেয়ে তীক্ষ্ণমুখ বল্লমের মতই মনকে সবেগে ছুঁড়ে দিলে তার মন আর মগজের মধ্যে। অস্ফুট চিৎকার করে উঠলো হরিশ,—উঃ! হয়েছে . . . হয়েছে . . . আর না।—এলে কোত্থেকে?

—মরুভূমি থেকে।

—ও! ধরে এনেছে তো? বেশ করেছে। এই বিদ্যে নিয়ে মুরুভূমিতে থাকতে যাবে কেন? তবে হ্যাঁ, সুড়সুড়ি-বাবারা যেন জানতে না পারে।

—সুড়সুড়িবাবারা মানে?

—মাকড়সা। জঘন্য জীব। এককালে চার হাজার জাতের মাকড়সা ছিল এই পৃথিবীতে। সবচেয়ে বজ্জাত এই কেলেগুলো। ব্যাটাচ্ছেলেরা পোকা-ও নয় যে পোকা বলে গালাগাল দেবো। ওরা যদি জানতে পারে মারাত্মক ক্ষমতা রয়েছে তোমার এই মাথাখানার মধ্যে—তাহলেই খেল্ খতম।

—জানলে কি করবে?

—টিপে মেরে ফেলবে। বুদ্ধু কোথাকার। আর কারও ওপর চালাকি মারতে যেও না।—এই, সব বস্তা নেমেছে?

হাঁকডাক করে এগিয়ে গেল হরিশ। চারজন ষণ্ডামার্কা লোক একটা

ঠেলাগাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল কাঠের বাড়ির সামনে। তার চাকা দুখানায় লোহার পটি লাগানো। বস্তাগুলো তার ওপর ধপাধপ করে ফেলা হতেই হরিশ ফিরে এল নিপুলের সামনে। বললে, -আমি যা জানলাম, তা যেন আর কেউ জানতে না পারে।

তুমি কেন কাউকে বললে না ?—সরলভাবে শুধায় নিপুল।

হাসল হরিশ,--কারণ আমি সুড়সুড়ি বিটলেদের গোলামি করি না। করলে মাথা এত সজাগ থাকত না।

—কি করো ?

--গোলন্দাজদের হুকুমে চলি।

--গোলন্দাজ গুবরে ?

-হ্যাঁ। দুমদাম আওয়াজ যাতে হয়, সেই ব্যবস্থা করি। এই যে বস্তাগুলো দেখছো --এই দিয়ে বানাবো বারুদ। চলি হে ছোকরা।

বোঁ করে ছুটে গিয়ে লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে বস্তাগুলোর ওপরে বসে পড়ল হরিশ।

ষণ্ডামার্কা লোক চারটে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে গেল ঠেলাগাড়িকে।

দূর থেকে মেয়েটাকে হন্ হন করে আসতে দেখেই মনের শক্তিটাকে আর একবার যাচাই করে নিল নিপুল।

মেয়েটার মনে এখন খুশির জোয়ার। মাকড়সা-ক্যাপ্টেন খুব সাবাস জানিয়েছে নেকড়ে মাকড়সাদের জ্যান্ত ফিরিয়ে আনার জন্যে।

এই যে, তোমাকেই খুঁজছিলাম।—সামনে এসে দাঁড়ায় সুন্দরী। নিপুল তখনো মনের আলো জ্বালিয়ে দেখে যাচ্ছে তার মনের ভেতর। কিন্তু কিচ্ছু টের পাচ্ছে না মেয়েটা। অসাড় মন। মাকড়সা-মালিকদের আর এক কীর্তি।

মুখে বললে নিপুল,—কেন ?

—ক্যাপ্টেন খুব খুশি।

কেন যে খুশি, তা জানা হয়ে গেছে নিপুলের। নেকড়ে-মাকড়সা দুটো জলে ভেসে গেলে মেয়েটার দফারফা হয়ে যেত এতক্ষণে। নিপুলের ওপর এত সদয় এই কারণেই।

যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, এই রকম মুখ করে বললে নিপুল,—কি বলে ডাকবো তোমাকে ?

—শুচিতা।—তোমার নাম।

—নিপুল।

—খেয়েদেয়ে মোটা হতে তোমাকে। বুঝেছো ?

—মোটা হতে যাবো কেন ?

মনিবরা আমাদের মোটাসোটা দেখতে চায়। এই এইরকম হতে হবে।—বলে আঙুল তুলে একটা লোককে দেখায় শুচিতা। তার—সারা গায়ে পেশী নড়েচড়ে উঠছে ময়াল সাপের মত।

—নিশ্চয় হবো।

জেটির ধারে এসে দাঁড়িয়ে গেল দুজনে। অন্য নৌকো দুটো এসে গেছে। নিজয় আর সিস আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো নিপুলকে দেখে।

মাকড়সা শহরকে দেখা গেল তিন ঘন্টা পরে।

জাহাজঘাটা থেকে মাকড়সা শহর যাওয়ার পথে দুচোখ ভরে যা-যা দেখে গেল নিপুল, তার প্রতিটি বিস্ময় আর রোমাঞ্চর ঢেউ তুলে গেল তার মনে। জন্ম থেকে সে গর্তে অথবা গুহায় থেকেছে। মানুষের হাতের কাজ যে কত বিরাট হতে পারে, তা ভাবতেও পারেনি। প্রথমেই নিপুল দেখল, বিশাল এক বন্দরের ধ্বংসাবশেষ এই জাহাজঘাটা। এককালে বড় বড় পাথরের চাঁই কেটে পেল্লায় ইমারত তৈরি করা হয়েছিল অনেক জায়গা নিয়ে। এখন তা অযত্নে বনজঙ্গলে ছেয়ে যাচ্ছে, অথবা ভেঙে ভেঙে পড়ছে। কিন্তু বন্দরের চেহারা দেখলেই কল্পনা করে নেওয়া যায় অনেক . . . অনেক বছর আগে এ জায়গাটা গমগম্ করত।

বন্দর ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর যেতে হল মাঠ, বন, প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে। মানুষের তৈরি রাস্তা ছিল এককালে। এখন সেই রাস্তার পাথর অনেক জায়গায় উঠে গেছে, জোড়ের মুখ দিয়ে গাছগাছড়া মাথা তুলেছে।

মাঠের পর মাঠে জমি চষার চিহ্ন আজও স্পষ্ট। খামার বাড়ি আছে, কিন্তু ছাদ নেই।

ওদের খাতির করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঠেলাগাড়িতে করে। প্রথম দিকে সিস আর নিজয়কে ধমক খেতে হয়েছিল ওদেরই নৌকোর খান্ডারনী মেয়ে দুটোর কাছে। নিপুলের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সে কী ঝামেলা। ওরা তো জানে না, মাকড়সাদেব কড়া হুকুম—মানুষ বন্দীরা কেউ কারও সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। তেড়ে উঠেছিল দুটো মেয়েই। তারপর অবশ্য শুচিতা বুঝিয়ে দিলে, মাকড়সাদের সঙ্গে সহবৎ মেনে চলতে গেলে কি-কি করতে হয়। প্রথম নিয়মটা এই ঃ মাকড়সা প্রভুরা যখুনি সামনে দিয়ে যাবে, মানুষরা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকবে। একদম চোখ তুলবে না। তুললেই মাকড়সাদের বিষাক্ত ইচ্ছাশক্তির

ঝাপটায় ঠিকরে পড়তে হবে মাটিতে।

ঠিক তাই ঘটেছিল নিজয়ের ক্ষেত্রে। জেটির ওপর দাঁড়িয়ে প্যাট প্যাট করে চেয়েছিল রাক্ষুসে দুই নেকড়ে-মাকড়সার দিকে। সামনে দিয়েই রাজার মত যাচ্ছিল দুই দানব। আচমকা অদৃশ্য শক্তির ধাক্কায় চিৎপাত হয়ে পড়ে গেছিল মাটিতে।

ব্যাপারটা কি হল, বুঝতে না পেরে টলমল করে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই আবার একটা অদৃশ্য চাবুক যেন সপাং করে আছড়ে পড়েছিল ওর মুখের ওপর।

শুচিতা-ই রক্ষে করে গেছিল সেযাত্রা। দৌড়ে গিয়ে ভীষণ দাবড়ানি দিয়েছিল নিজয়কে। শিখিয়ে দিয়েছিল, মনিব সামনে দিয়ে গেলে দাঁড়াতে হয় কিভাবে।

তারপর এই শুচিতা-ই অন্য মেয়ে দুটোকে বুঝিয়ে দিলে, নিপুল এখন থেকে মাকড়সা প্রভুদের খাতিরের লোক। সুতরাং তার সঙ্গে যেন কু-ব্যবহার না করা হয়।

বলার সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল ঠেলাগাড়ি। অনেকটা রিক্সাগাড়ির মত ব্যাপার। তবে রিক্সা টানে একজন ঠেলাগাড়িকে ঠেলছে দুজনে, টানছে দুজনে।

সিস বসলো সামনের দিকে। শুচিতার দুপাশে বসলো নিজয় আর নিপুল। মাঠ-বন-প্রান্তর পেরিয়ে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে চূড়ার সমতল ভূমিতে পৌঁছোতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল অত্যাশ্চর্য মাকড়সা শহর।

চারদিকে পাহাড় ঘিরে রয়েছে একটা উপত্যকাকে। ঠিক যেন একটা গামলা। গামলার তলায় আটিপেয়ে দানবদের চক্ষু চড়কগাছ করা শহর।

নিপুল কিন্তু চিনেছে এ শহরকে। ঝর্ণার জলে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে আচমকা তার মনের চোখে ভেসে উঠেছিল তো এই শহরটাই। খুব লম্বা, উঁচু আর চৌকোনা ইমারতের এই নগরী একবার দেখলে মনের মধ্যে গেঁথে যায় চিরকালের মত। তবে মনের চোখে দেখে নিপুল বুঝতে পারেনি ইমারতগুলো এত পেল্লায়। তখন যা কল্পনাও করতে পারেনি, এখন তা দেখছে চোখের সামনে। এতদূর থেকেও চোখে পড়ছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাকড়সার জাল ঝুলছে একটা বাড়ি থেকে আর একটা বাড়ির মাঝের ফাঁকা জায়গায়। বেশির ভাগ ইমারতই ধূসর রঙের। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে মিশমিশে কালো বাড়ি। অনেক বাড়ি ভেঙে পড়েছে, কিছু

বাড়ি পড়ো-পড়ো অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু এই আধভাঙা বাড়িদের ধারে কাছেও আসে না মরুভূমির মধ্যে দেখা সেই লম্বা লম্বা থাকগুলো। যেন দম আটকে এল নিপুলের- -এ রকম শ্বাসরোধী দৃশ্য সে জীবনে দেখেনি। গোটা শহরটাই যেন অতিকায় দানবদের হাতে তৈরি।

ধূসর-কালচে এই শহরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে সবুজ চত্বর। সবুজ চত্বরের কেন্দ্রে খাড়া একটা সাদা ইমারত। অন্য ইমারতগুলোর মতো আকাশছোঁয়া উঁচু না হলেও সাদা ইমারত নজর কেড়ে নিচ্ছে সবার আগে, শুধু তার অসম্ভব চোখ ধাঁধানো শুভ্রতার জন্যে। রোদ্দুর ঠিকরে যাচ্ছে গা থেকে। ঠিক যেন হাজার হাজার সূর্য জ্বলছে তার সর্বাঙ্গে।

মা আর দাদার মুখেও একই হতভম্ব ভাব দেখল নিপুল। এরকম অনুভূতি তিনজনের জীবনেই এই প্রথম।

কোথায় যেতে হচ্ছে, তা জেনে এসেছে এতদিন ধরে। কিন্তু নিছক স্বপ্ন হয়েই ছিল মাকড়সাদের শহর। স্বপ্ন কখনো সত্যি হয় না -তাই ভয়ও পায়নি। এই মুহূর্তে আচমকা তা সত্যি হয়ে গেল। স্বপ্ন হয়ে গেল বাস্তব। বাস্তবের শহর যে এত করাল কুটিল হতে পারে তা তো ভাবেনি নিপুল।

সেই দিকেই চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা অদ্ভুত আনন্দের বন্যায় ভেসে গেল নিপুলের মন। দাদা আর মায়ের দিকে চেয়ে বুঝলো, একই বিচিত্র হর্ষের প্লাবন এসেছে ওদের দুজনেরও মনে। কুচ্ছিৎ বিকট এই শহরের মাঝে একা সাদা ইমারত যেন আনন্দের হিল্লোল ছড়িয়ে দিচ্ছে দিকে দিকে।

ঠেলাগাড়িকে এতটা পথ ঠেলে এনে পাহাড়ে তুলে ষণ্ডামার্কা লোকটে হাঁপিয়ে গেছিল। একটু জিরিয়ে নিয়ে এবার নেমে গেল ঢালু পথ বেয়ে নিচের দিকে। গাড়িতে ব্রেক আছে। যারা ঠেলছে পেছন থেকে তারাই মাঝে মাঝে একটা হাতল টেনে ধরে ব্রেক মারছে। তাই ঢালু পথে গড়গড়িয়ে নেমে গেলেও নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাচ্ছে না ঠেলাগাড়ি।

জাহাজঘাটা থেকেই একজন গাঁট্টাগোট্টা পুরুষ আসছিল গাড়ির পেছন পেছন। শুচিতা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিল নিপুলকে,—চাকরের দল ওরা। তাকিও না ওদিকে।

সামনের দিকে চেয়ে থাকলেও নিপুলের অনেকক্ষণ ধরে মনে হচ্ছিল, গাড়ির বাঁ পাশ দিয়ে ছুটছে যে লোকটা সে যেন একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে তার দিকে। চাকররা তো এইভাবে চেয়ে থাকে না। এ লোকটা কিন্তু

প্যাট প্যাট করে তাকে দেখেই যাচ্ছে। তাই আড়চোখে সেদিকে একবার তাকিয়েই চমকে উঠেছিল নিপুল।

মুখটা খুবই চেনা। লোকটার নাম টোন্ডা। নটো শহরে ঢুকতে গেলে প্রথমেই যে বিশাল পাথরের দেওয়াল নামাতে হয় গাছের কাটা গুঁড়িতে ঠেকিয়ে—এই টোন্ডা ছিল সেখানে। গায়ে অসুরের মত জোর। চেহারাখানাও অবিকল সেইরকম। অমন ভারি পাথর টেনে নামানো আবার ঠেলে তোলার ভার ছিল এই টোন্ডা এবং আরও কজনের ওপর।

টোন্ডা এখন মাকড়সা শহরের গোলাম !

সবেগে মাথা ঘুরিয়ে সটান টোন্ডার চোখে চোখ রেখে ঝটিতি প্রশ্ন করেছিল নিপুল,— এখানে কেন ?

ধরে এনেছে।—চাপা গলায় বললে টোন্ডা।

—রাজা নিকাডো কোথায় ?

—এখানে—সব্বাই এখানে।

চুপ।—পাশ থেকে গর্জে উঠলো শুচিতা।

চারদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবাক করে দিচ্ছে নিপুলকে। নিশ্চয় বৃষ্টির মরশুম চলছে এখন। কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে দূরের পাহাড়ের মাথায়। চকচক করছে ঘাস আর ঝোপ। ঢালু পথ ঢুকে গেল গভীর জঙ্গলে—সূর্যকে আর দেখা যাচ্ছে না। মরুভূমিতে ক্ষুদে গাছ দেখেই অভ্যস্ত নিপুল। এমন মহীরুহ কল্পনার বাইরে ছিল এতদিন। এক-একটা গুঁড়ির ব্যাস কম করেও পাঁচ ফুট। মাথার ওপর ডালপালার খিলেন বানিয়ে নিচের পথকে সুড়ঙ্গ করে তুলেছে। লম্বা সবুজ ঘাস দুলে দুলে উঠে ছুঁয়ে যাচ্ছে গাড়ির দুপাশ। হাত বাড়িয়ে এক খামচা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে মুখে পুরে চিবিয়েছিল নিপুল। ভারি মিষ্টি স্বাদ এবং বেশ রসালো। মনের মধ্যে একই সঙ্গে ভেসে উঠলো সীমাহীন অরণ্যের অপরূপ ছায়াছবি।

আচমকা শেষ হয়ে গেল জঙ্গল। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেলেও মাকড়সা শহরকে এখন দেখতে পাচ্ছে অনেক কাছ থেকে। পথের দু'পাশের ক্ষেতে কাজ করছে স্বাস্থ্যবান পুরুষেরা। রাস্তা বাঁধানো রয়েছে মসৃণ পাথর দিয়ে। পাশেই বয়ে যাচ্ছে নদীর জল। পাড় দিয়ে ছুটছে ঠেলাগাড়ি। আধমাইল গিয়েই পেরোতে হল একটা সেতু। লোহার ফ্রেমে মরচে পড়ে গেছে। সেতুর নিচে একটা প্রকাণ্ড মাকড়সার জাল—লম্বায় আর চওড়ায় পঞ্চাশ ফুট তো বটেই। এক কোণে জ্বলজ্বল

করছে কালো চোখ। নির্নিমেষে চেয়ে আছে গাড়ির দিকে।

এসে গেছে মাকড়সা শহর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি সার বেঁধে রয়েছে দু'পাশে। প্রত্যেকটা বাড়িই অসম্ভব বকমের উঁচু। ঘাড় বেঁকিয়ে আকাশ দেখতে গেছিল নিপুল। ঘাড় টাটিয়ে গেল। বেশির ভাগ বাড়িই ভেঙেচুরে পড়েছে। পথের দু'ধারে লোহার রেলিং দেওয়া সিঁড়ি নেমে গেছে পাতালঘরের দিকে। গায়ে গতরে ভারি মেয়ে-পুরুষরা অনবরত সেইসব সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করছে। লোকজন গিজগিজ করছে সারা রাস্তা জুড়ে। সবাই ব্যস্ত। গড়গড়িয়ে গাড়ি চলছে রাস্তা দিয়ে।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকা হয়ে গেল পথঘাট। লোকজন মিলিয়ে গেল পাতালের ঘরগুলোয়। পথ এখন খাঁ-খাঁ করছে।

গাড়ি থামতেই তক্তা পেতে দিল দৌড়বাজ চাকরের দল। গাড়ি থেকে পাটাতন বেয়ে নেমে এল শূচিতা। তার পেছনে নিপুল, নিজয় আর সিস।

শূচিতা বললে,- এরাই দেখিয়ে দেবে তোমাদের থাকার জায়গা।

সাহসে বুক বেঁধে জিজ্ঞেস করলে নিপুল,—কোথায় থাকবো ? কাদের সঙ্গে ? কিভাবে ?

সাদা দাঁত বের করে হাসল শূচিতা,—এত কথা বলার অধিকার কারুর নেই। আমারও দরকার হয় না এত শেখানো পড়ানোর। কিন্তু তোমার ব্যাপার আলাদা। শোনো, এই শহরে মানুষদের রাখা হয় আলাদা আলাদা জায়গায়। তোমরা মরুভূমির বর্বর। তোমরা সব্বাই গুঁতোগুঁতি করে থাকো একটা গর্তে। এখানে ছেলেদের আর মেয়েদের আলাদা করে রাখা হয়।

শুনেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল সিস। ধীর গলায় বললে নিপুল,—মা আমাদের সঙ্গে থাকবে না ?

—আজকের রাতটা থাকবে। কাল থেকে হবে অন্য ব্যবস্থা।

—কী ব্যবস্থা ?

—মনিব যা বলবে, তাই হবে।

—মনিব ? মানে, মারণ-মাকড়সা ?

চুপ। মনিবকে কখনো ওই নামে ডাকবে না। প্রাণে বাঁচবে না তাহলে। এখানে পুরুষরা থাকা আলাদাভাবে। তোমরা দু'ভাই থাকবে এই গাড়োয়ানদের সঙ্গে। —টোস্তা আর অন্য পুরুষগুলোকে দেখিয়ে বললে শূচিতা : এরা চাকর, কিন্তু গোলামদের মত নিচু লোক নয়।

—গোলাম আর চাকরে তফাৎটা কি ?

—গোলামরা নর্দমা সাফ করে। তারা থাকে নদীর ওপারে। চাকরদের পাঠানো হয় ক্ষেতের কাজে, গাড়ি টানার কাজে, বাড়ি মেরামতের কাজে। আমরা মেয়েরা সব কাজের তদারকি করি। কারণ আমরা পুরুষদের চাইতে অনেক উঁচু মহলের মানুষ।

নিরীহ গলায় নিপুল বললে,—তাহলে তো আমার মা-ও উঁচু মহলে জায়গা পাবে।

তা তো পাবেই। তোমরা বর্বররা মেয়েদের বাঁদি বানিয়ে ঘরের কাজ করিয়েছো—মনিবদের তা সহ্য হয় না। মনিবরা মেয়েদের বেশি খাতির করে।

নিপুল বলে উঠলো,—আমার বোনদুটো কোথায় ?

শুচিতা বললে,—ছোটদের জায়গায় আছে। ভালই আছে। বড়রাও সেখানে যেতে পারে না। একটা কথা মনে রেখো নিপুল, সন্ধ্যের পর রাস্তায় বেরোবে না। কক্ষনো না।

—কেন ?

অদ্ভুত হাসলো শুচিতা,—তখন মনিবদের নিজস্ব সময়। তাদের পেটে চলে যেতে পারো।

বলেই শুচিতা আর দাঁড়ালো না।

অন্ধকার তখন চেপে বসেছে। টোন্ডা নিপুলের হাত ধরে বললে, —এসো।

অন্ধকার ঘন হতেই অন্য লোকগুলো ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছিলো এদিকে সেদিকে –বিশেষ করে মাথার ওপর অতিকায় মাকড়সার জালগুলোর দিকে। কোন্ দিক থেকে কে যে টুপ করে খসে পড়বে, সেই ভয়ে যেন সিঁটিয়ে রয়েছে। শুচিতা উধাও হতেই এরা পাঁই পাঁই করে দৌড়ে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে পাতাল ঘরে। পেছনে গেল টোন্ডা নিপুল, নিজয় আর সিস-কে নিয়ে।

পাতালঘরগুলো পেল্লাই সাইজের বিশাল বিশাল হলঘর। লোক গিজগিজ করছে সব ঘরেই। লম্বা গলিপথের দু'ধারে রয়েছে ঘরগুলো। তেলের আলো জ্বলছে সব ঘরেই। লোকগুলো গলা ছেড়ে গল্প করছে, কেউ শুয়ে পড়ে আরাম করছে, কেউ গব্‌গব্ করে খেয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা ঘরের একপাশে প্রকাণ্ড টেবিলের ওপর বড় বড় গামলা। আর ডেকচি সাজানো রয়েছে। হাতা ডুবিয়ে নিজেরাই খাবার তুলছে, পাঁউরুটি ছিঁড়ে নিয়ে কোঁৎ কোঁৎ করে গিলছে। এরকম খাওয়া কক্ষনো দেখেনি

মরুভূমির এই বুভুক্ষুরা। খাবার জোগাড় করতেই তো এদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে দিনের পর দিন।

টোন্ডা ওঁদের নিয়ে গেল যে ঘরে, সেখানে লোক বেশি নেই। ঘরের কোণে পাহাড় কবা তোশক, বালিশ আর কম্বল। সবই স্যাঁতস্যাঁত করছে। ছ্যাতলা পড়ে গেছে অনেক দিন পড়ে থাকায়। টোন্ডা সেই দুর্গন্ধ গদী টেনে নামিয়ে পেতে দিল মেঝেতে। অন্য লোকগুলো চেয়ে রইল। বিরাট চেহারার একজন পুরুষ একমুখ খাবার চিবোতে চিবোতে বললে, কোত্থেকে এল ?

টোন্ডা বললে,--মরুভূমি থেকে।

বর্বর ?

তোমার মতই। -বলে আর তার দিকে না তাকিয়ে নিপুলকে বললে টোন্ডা ঃ চলো, খাবার নিয়ে আসি। খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

বড় টেবিলে সাজানো গামলা আর ডেকচি থেকে মাংসের ঝোল তুলে নিল টোন্ডা খালি বাটিতে। বিরাট পাঁউরুটি থেকে ছিঁড়ে নিল এক খাবলা। নিপুল, নিজয় আর সিস সেইভাবে খাবার নিয়ে ফিরে এসে বসল গদীতে।

কিসের মাংস ? শুধালো নিপুল।

খরগোসের। বললে টোন্ডা।

–চমৎকার খেতে। এবার বলো তোমরা এখানে এলে কিভাবে ?

টোন্ডা বললে, তোমরা চলে যাওয়ার দুদিন পরে পিঁপড়েদের নিয়ে চরতে বেরিয়েছিল দুজন– কেউ ফিরলো না সন্ধ্যের পরেও। পরের দিন রাজা নিকাডো তার নিজের ছেলেকে পাঠালো ওদের খোঁজ নিতে সে-ও ফিরলো না। তার পরের দিন সকালবেলা ঘুম ভাঙবার পর কেউ আর হাত-পা নাড়াতে পারলাম না। বিছানা ছেড়ে উঠতেও পারলাম না। নটো বাজ্যের প্রত্যেকের এই অবস্থা হল।

তারপর ?– খাওয়া থামিয়ে বললে নিপুল।

—পাথরের পাল্লা খোলবার ভার ছিল আমার ওপর। আমরা ছজনে শুয়েছিলাম পাল্লার সামনেই। হঠাৎ শুনলাম, চোঙার মধ্যে দিয়ে ভেসে আসছে রাজা নিকাডোর ছেলের গলা। দরজা খুলতে বলছে আমাকে। সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা নাড়বার ক্ষমতা ফিরে পেলাম আমরা ছ'জনেই। ধড়মড় করে উঠে ভারি পাল্লা নামাতে না নামাতে -

পিলপিল করে ঢুকে পড়ল মাকড়সা। বললে নিপুল।

-হ্যাঁ। হাজার হাজার মাকড়সা। বাদামী রঙের। খিদের জ্বালায়

ছটফট করছিল প্রত্যেকেই। দলে দলে ভেতরে গিয়ে প্রথমে পেট ভরে খেল।

—কি খেল ?

মানুষ। জ্যান্তই খেয়ে ফেলল। বাচ্ছাদেরও বাদ দিল না। আমাদের রেহাই দিল দরজা খুলে দিয়েছিলাম বলে।

তারপর ? তারপর ?—খেতে ভুলে গেল নিপুল। নিজয় আর সিস-ও হাঁ করে শুনছে।

—নটো শহর খালি হয়ে গেল সেইদিনই। মরুভূমির ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে আনল সব্বাইকে। তবে খেতে দিয়েছে, ঘুমোতে দিয়েছে। খুব একটা কষ্ট হয়নি। পালাবার উপায় ছিল না। হাজার হাজার নেকড়ে-মাকড়সা ছেঁকে ধরেছিল চারদিক থেকে।

—রাজা নিকাডো কোথায় ?

—এই শহরেই আছে। এখনো রাজার মতই আছে।

—রাজার মত !

—রাজা তো রাজার মতই থাকবে। মাকড়সারা নাকি দেখেছে, তাকে দিয়ে মানুষদের ওপর খবরদারি করানো যায় খুব ভালোভাবে। তাই সে থাকে আলাদা বাড়িতে।

সিস বলে উঠলো,—মিমি কোথায় ?

—রাজবাড়িতেই আছে।

ঠিক এই সময়ে একটা বিকট জন্তু যেন বিষম যন্ত্রণায় গঙিয়ে কেঁদে উঠল বাইরে—একবার . দুবার . . তিনবার।

আঁৎকে উঠে নিপুল বললে,—ওকী !

কম্বল মুড়ি দেয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে বললে টোন্ডা,—শুয়ে পড়ো। শুয়ে পড়ো ! এই আওয়াজের পর আর জেগে থাকতে নেই।

নিভে গেল ঘরের সবকটা আলো—একটা ছাড়া।

পরের দিন ভোর হতে না হতেই টোন্ডা টেনে তুলল ওদের। পেট ঠেসে খেয়ে আর একরাত্তির ঘুমিয়ে তিন জনেরই শরীর চাঙা হয়ে উঠেছে। টোন্ডা ওদের নিয়ে গেল স্নানের ঘরে। সেখানে বালতি বালতি জল রয়েছে। পাশে ছোট ছোট খুপরি ঘর। তিন জনকে তিন বালতি জল নিয়ে তিনটে খুপরিতে ঢুকে যেতে বলল টোন্ডা। হাতে ধরিয়ে দিল একরকম গাছের শেকড়। বললে, — গায়ে ঘষবে। ফেনা হবে—গায়ের ময়লা সাফ হয়ে যাবে।

ওরা গা ঘষে স্নান সেরে যখন বেরিয়ে এল, পাতালপুরী তখন গমগম করছে। স্নানের ঘরে প্রচণ্ড ভিড়। হুড়োহুড়ি করে চৌবাচ্চা থেকে জল তুলে মাথায় ঢালছে সবাই।

দশ মিনিট পরেই রাস্তায় জড়ো হল পাতালঘরের প্রত্যেকে। দিনের আলোয় শহরের চেহারা দেখে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে ওঠে নিপুল। লম্বা ধূসর বাড়িগুলো পাহাড়ের মত মাথা উঁচিয়ে রয়েছে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে। একটা বাড়ি থেকে আর একটা বাড়ির ফাঁকে ঝুলছে প্রকাণ্ড সাইজের মাকড়সার জাল। তন্তুগুলো জাহাজবাঁধা কাছির মত ইয়া মোটা।

শুচিতা এবং তারই মত দেখতে অনেকগুলো মেয়ে লাইন দিয়ে দাঁড় করাচ্ছে চাকরদের। কড়া চড়া গলায় হুকুম দিচ্ছে। ষণ্ডামার্কা লোকগুলো এক এক ধমকে সিঁটিয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের প্রতাপ আছে বটে এই শহরে :

দলে দলে চাকর এগিয়ে চলেছে রাজপথ ধরে। কয়েকটা মোড় ফেরবার পর দূরে দেখা গেল সাদা ইমারত। ঝকঝক করছে ভোরের নীল আকাশের বুকে। আনন্দে নেচে ওঠে নিপুলের মন।

রাজপথ থেকে সরু সরু পথ বেরিয়ে গেছে দু'পাশে। সব রাস্তাতেই আকাশ ছোঁয়া বাড়ি। কোনো কোনো বাড়ির মাথায় প্রকাণ্ড গম্বুজ। বিশাল একটা ইমারত তৈরি হয়েছে সবুজ পাথর দিয়ে।

নিপুল ভেবে পায় না, আগে কারা থাকত অসাধারণ এই শহরে। তারা কি দানব, না জাদুকর ? তাই যদি হয়, মাকড়সারা তাদের হারিয়ে দিল কিভাবে ?

রাজপথ শেষ হয়েছে সবুজ চত্বরে সাদা ইমারতকে আরো স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে। পান্না-সবুজ ঘাসজমিকে ঘিরে রয়েছে মসৃণ পাথর দিয়ে বাঁধানো চওড়া রাস্তা। রাজপথ যেখানে শেষ হয়েছে,—ঠিক সেইখানে রয়েছে একটা মস্ত উঁচু বাড়ি। সাদা ইমারতের ঠিক মুখোমুখি। তবে আরও উঁচু। নিচের তলাগুলো কালো পাথর দিয়ে তৈরি, ওপরের তলাগুলোকে মেবামত করে নেওয়া হয়েছে চমৎকারভাবে। নগর চত্বরের আর কোনো বাড়ি এত উঁচু নয়, এত জমকালো নয়। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার একখানা জানলাও নেই বাড়িতে। অথবা, ছিল এককালে. এখন বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। সাদা ইমারতকে যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছে রন্ধ্রবিহীন প্রকাণ্ড এই সৌধ।

অদ্ভুত এই বাড়ির সামনেই দাঁড়াতে হল প্রত্যেককে। আলাদাভাবে দাঁড় করানো হল নিপুল, নিজয আর সিস-কে।

বাড়িব ভেতর থেকে গটমট করে বেরিয়ে এল কুচকুচে কালো পোশাক পরা একটা মেয়ে। সোজা চলে এল নিপুলের সামনে। চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ওর মুখেব দিকে। তারপর বললে,—তোমরা তিনজনেই এসো আমার সঙ্গে।

অদ্ভুত বাড়ির সামনে দশ ফুট উঁচু ডবল দরজার সামনে পৌঁছোতেই পাশে সরে গেল দুটো অতিকায নেকড়ে-মাকড়সা। মেয়েটা ফিরেও তাকালো না তাদের দিকে। পেছন পেছন চলেছে নিপুল, নিজয় আব সিস। দবজাব পর একটা বিশাল হলঘর। এখানে আলো খুব কম। রোদ থেকে হঠাৎ কম আলোয় এসে চোখে ধাঁধা লেগে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। তাবপব দেখা গেল ডান দিকে বয়েছে একটা চওড়া মর্মর-সোপান। আরও দুটো নেকড়ে-মাকড়সা পাহাবা দিচ্ছে সেখানে। দুজনেই একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে নিপুলেব দিকে। মনে হচ্ছে যেন কৌতূহলে ফেটে পড়ছে দুই মূর্তিমান। সামনে দিয়ে যাওযাব সময়ে অনুভূতির সেই ধাক্কা ঝড় তুলে দিয়ে গেল নিপুলেব মনের মধ্যে। বেশ বুঝলো, কিছু একটা ঘটতে চলেছে এক্ষুনি।

☐ দশ ☐

সিঁড়ির ওপর আবার একটা পেল্লায় দরজা। কালো পোশাক পরা আর এক সুন্দরী দাঁড়িয়ে সেখানে। দরজা ফুঁড়ে ঠিকরে আসছে ইচ্ছাশক্তির প্রবল তরঙ্গ। সমস্ত শরীর আর মন দিয়ে তা টের পাচ্ছে নিপুল।

দুই কৃষ্ণবসনা ঠেলা মেরে খুলে দিল পাল্লা। নেকড়ে-মাকড়সা গিজগিজ করছে বিশাল ঘরে। লাইন দিয়ে রয়েছে দুপাশে। সবশেষে একটা উঁচু মঞ্চ। কালো রঙের একটা মারণ-মাকড়সা তার ওপর থেবড়ে বসে হুকুম দিয়ে যাচ্ছে তারস্বরে। মানুষের ভাষায় 'তারস্বরে হুকুম'—কিন্তু কোনো শব্দ কানে ভেসে আসছে না—মাথার মধ্যে আছড়ে পড়ছে শক্তির তরঙ্গ। নিজয় পর্যন্ত শিউরে উঠছে টেলিপ্যাথি হুকুমের দাপটে। সিস অতটা বুঝছে না। অতটা সূক্ষ্ম মন তার নয়।

এই শহরে আসার পর এই প্রথম নিদারুণ আতঙ্কে অবশ হয়ে এল নিপুলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

মেয়ে দুজনের একজন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললে নিপুলকে,—যাও মৃত্যু রাজার সামনে। দেখতে চেয়েছে তোমাকে।

নিপুলের তখন মনে পড়ছে জোমো-র মুখে শোনা মাকড়সাদের নির্মম প্রতিহিংসা নেওয়ার গল্পগুলো। মারণ মাকড়সা যার হাতে খুন হয়, তার আর রেহাই নেই।

মৃত্যু রাজা কি জানে, মরুভূমিতে কিভাবে মারণ-মাকড়সাকে যমালয়ে পাঠিয়েছে নিপুল ? না জানলেও, এখুনি যদি বুঝে নেয় ? ভয়ের চোটে নিপুল একবার ভাবলো, সটান আছড়ে পড়ে কবুল করবে সব কথা। তাহলে কি ক্ষমা করবে না মৃত্যুরাজা ।

সঙ্গে সঙ্গে মনের পর্দায় ভেসে ওঠে বাবার বিষাক্ত ফুলে ওঠা কালচে মুখখানা। না। কক্ষনো না। ক্ষমা এরা করে না। মন শক্ত হয়ে যায় নিপুলের। জোর করে মনের মধ্যে টেনে নিয়ে আসে পর-পর অনেকগুলো ছবি। মরুভূমির পাহাড়ের মধ্যে পাথরের দুর্গ, থাম ঘেরা মন্দির, পাতাল সুড়ঙ্গ, ধাতুর ফড়িং । মানুষই তৈরি করেছে এইসব। মানুষের সেই শক্তি রয়েছে ওর নিজের মধ্যেও। ভাবতে ভাবতেই মাথার মধ্যে জ্বলে ওঠে খুদে আলো। নিমেষে পুরো মনটাকে কব্জার মধ্যে এনে ফেলে নিপুল।

বুঝেও নেয় সেই মুহূর্তে—মাকড়সা রাজা দূর থেকেই প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তার মনের জোর কমিয়ে দিয়েছিল। মনকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছিল। আর একটু হলেই সর্বনাশ হয়ে যেত।

আতঙ্কের অদৃশ্য তরঙ্গ শিহরিত করেছে মেয়ে দুটোকেও। কাঁপছে দুজনেই। কাঁপতে কাঁপতেই ঠেলা মেরে খুলে দিলে কালো রঙের কপাট দুটো।

সঙ্গে সঙ্গে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ল মেঝের ওপর। মুখ তুলে তাকানোর সাহসও নেই তাদের।

ঘরের মধ্যে প্রথম পা দিল সিস। দুহাতে ধরা দুছেলের হাত।

চমকে উঠল নিপুল। এঘর সে চেনে। যার শেষে অধিষ্ঠিত রয়েছে মাকড়সা-রাজা, অদৃশ্য মৃত্যু। তাকেও সে দেখেছে লাল মরুভূমির ঝর্ণার জলে তাকিয়ে থাকার সময়ে। পাহাড় দুর্গের কুয়োর জলেও চকিতের জন্যে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেছিল ভয়ানক কুৎসিত এক কালো মাকড়সা।

এই মুহূর্তে কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে না। ধেয়ে আসছে কেবল হুকুমের পর হুকুম। মেয়ে দুটো সেই হুকুম শুনেই মেঝে থেকে ছিটকে গিয়ে বসে পড়ল দেওয়ালের ধার ঘেঁসে।

নিপুল চেয়ে রয়েছে মাকড়সার জালের সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথের ভেতরের দিকে। সেখানে নিবিড় অন্ধকাব ছাড়া আব কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বেশ বুঝছে, মূর্তিমান বিভীষিকা সেখানেই বসে আছে। অনেকগুলো চোখ মেলে খুঁটিযে খুঁটিয়ে তাকে দেখে যাচ্ছে। নিপুল তাকে দেখতে না পেলেও এটুকু বুঝেছে—একদম নড়া চলবে না এখন। নড়লেই এমন কিছু ঘটবে, যা তার কল্পনা বাইরে।

মরুভূমির মানুষ নিপুল এ রকম অনুভূতিতে অভ্যস্ত। পেছন থেকে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থেকে কেউ যদি তাকায়—ও তা টের পায়।

ঠিক সেইভাবেই টের না পেলেও ও হাড়েহাড়ে বুঝছে, অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে অধিষ্ঠিত এক নারকীয় সত্ত্বা অনেকগুলো চোখ মেলে তাকে নির্নিমেষে দেখে যাচ্ছে। একই সঙ্গে অত্যন্ত শক্তিশালী একটা মন ওর মনের ভেতরে সার্চ-লাইটের মত আলো ফেলে ফেলে খুঁজছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনের সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিল নিপুল। দুহাট করে খুলে দিল মনের সব কটা দরজা জানলা। এখন আর সেখানে গোপন বলে কিছু নেই।

আর ঠিক তখুনি বুকের ওপর ভয়ানক এক ধাক্কা পড়তেই উল্টে ডিগবাজি খেয়ে আছড়ে পড়ল নিপুল। সিস শুধু দেখলে, ছোট ছেলে আচমকা উল্টে গিয়ে আছড়ে পড়েই গড়িয়ে যাচ্ছে মেঝের ওপর দিয়ে। আঁৎকে উঠে সেদিকে দৌড়োতে যেতেই কে যেন ওর গলা ধরে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দূরে। নিজয় ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে চেয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে।

আচমকা একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল নিপুলের মাথার মধ্যে,—ওঠো।

কেউ পাশে নেই—অথচ সুস্পষ্ট শোনা গেল সেই হুকুম। ঠিক যেন কানে কানে ফিসফিস করে অথচ বজ্রনিনাদে ওকে কেউ হুকুম দিচ্ছে উঠে দাঁড়াতে।

মনের সমস্ত শক্তি সংহত করে আদেশ উপেক্ষা করে গেল নিপুল। আর তার ফলেই ভয় কেটে গেল তৎক্ষণাৎ।

কিছুক্ষণ পরে উঠে বসল বটে নিপুল, কিন্তু হুকুম শুনে নয়। সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়। কারণ, প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে মাথার পেছনে। বোধহয় থেঁতলে গেছে উল্টে গিয়ে আছাড় খাওয়ায়। টনটন করছে কাঁধ। ভালই হল, মনকে যন্ত্রণার দিকে ঘুরিয়ে দিল। অদৃশ্য শক্তি যেন মনকে কব্জায় আনতে না পারে।

যেন একটা দানবিক মুঠো নিপুলকে আঁকড়ে ধরল হঠাৎ। শক্তিপ্রবাহ পিষে ফেলছে ওকে চারদিক থেকে। শক্তির মালিক যেন বোঝাতে চাইছে, এইভাবে চেপে পিষে মেরে ফেলবার ক্ষমতা তার আছে।

অবশ্য নিপুল তা হাড়ে হাড়ে বুঝছে। এটাও বুঝছে, বিস্ময়কর এই শক্তির মালিক শুধু তাকে ভয় দেখাতেই চাইছে। সত্যি সত্যিই মেরে ফেলতে চায় না।

পরক্ষণেই একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল সিস আর নিজয়ের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে। শূন্যে ভেসে উঠল নিপুল। দুটো কাঁধ দুমড়ে গেছে—ভীষণ যন্ত্রণায় মুখ বেঁকে গেছে। ছোট ভাইয়ের এই দুর্দশা দেখে ছুটে গিয়ে নিজয় ওর দু-পা ধরে মেঝের দিকে টেনে নামিয়ে আনতে গিয়ে নিজেই ছিটকে গেল শূন্যে। অদৃশ্য শক্তি ওকে তুলে ছুঁড়ে মারল দেওয়ালের গায়ে। তবে শূন্য থেকে এবার ছেড়ে দিল নিপুলকে। সশব্দে সে আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

মগজের মধ্যে ধ্বনিত হল অতিশয় কর্কশ উচ্চনিনাদী আদেশ,—সিধে

হয়ে দাঁড়া !

একই সঙ্গে নিজয় আর সিস শুনতে পেল টেলিপ্যাথিক অর্ডার। নিমেষে তিনজনেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেল পাশাপাশি। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতর দিকে। এরপর কি যে ঘটবে, সেই উৎকণ্ঠায় টান-টান প্রত্যেকেরই স্নায়ু। তিনজনের মধ্যে শুধু নিপুলই টের পাচ্ছে মৃত্যুরাজার মনের কথা। তিনজনকে এখুনি সাবাড় করে দেবে কিনা ভাবছে। আরও একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার উপলব্ধি করতে পারছে নিপুল—বিষম দ্বিধায় পড়েছে মৃত্যুরাজা। তার শক্তির সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মত আর একটা শক্তির সামনাসামনি হয়েছে এই প্রথম।

নিপুল তাই নির্ভয়। ভয়ডরকে মনের মধ্যে ঠাঁই দেয়নি বলেই এত কিছু টের পাচ্ছে। মরতে যে ভয় পায় না, দুনিয়ার কোনো আতঙ্ক তাকে টলাতে পারে না।

আচমকা টের পেল নিপুল। মৃত্যুরাজা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, তিনজনের একজনকেও প্রাণে মারা হবে না।

মাথার মধ্যে ধ্বনিত হল আবার অদ্ভুত কড়া চড়া হুকুম,—যাও !

নিপুল কিন্তু একচুলও নড়ল না। ইচ্ছে করেই দাঁড়িয়ে রইল। আর একটা মানুষ যেন ওর মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, যে হুকুম শুনে চলতে দিচ্ছে না।

মেয়েদুটো এবার উঠে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে দুজনেরই। এদের তিনজনকে নিয়ে বেরিয়ে এল তারা বাইরে। সিঁড়ির পর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে পৌঁছে গেল বাইরের রোদ্দুর ঝলমলে রাস্তায়।

ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে নিজয় আর সিস। নিপুল নির্বিকার। মেয়ে দুটো সভয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। ছিপছিপে এই ছেলেটাকে নিয়ে মৃত্যুরাজার এত মাথাব্যাথা কেন, তা কেউ আঁচ করতে পারছে না। তবে নিপুল যে সামান্য মানুষ নয়, এটুকু বুঝেছে।

শুধু নিপুলই জানে, মৃত্যুরাজা কেন তাকে দেখতে চেয়েছিল। এর আগেও তাকে দেখেছে দুবার। একবার, পাহাড় দুর্গের কুয়োর মধ্যে। আর একবার, লাল মরুভূমির ঝর্ণার জলে। তখন থেকেই কৌতূহলী হয়েছে নিপুলের ক্ষমতার বহর উপলব্ধি করে। এতদূর থেকে যে মানুষটা মনে মনে যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারে—না জানি তার মধ্যে আরও কি শক্তি লুকিয়ে আছে।

কিন্তু নিদারুণ হতাশ হয়েছে তৃতীয় সাক্ষাতে। নিপুলের মন হাতড়েও কিস্‌সু পায়নি। পলকের মধ্যে মন খালি করে ফেলেছে নিপুল। হাজার আতঙ্কের ঢেউ দিয়েও তাকে কাহিল করতে পারেনি। শূন্যে তুলে আছাড় মারার পরেও মনের জোর এতটুকু কমেনি।

নিপুল তাই এখনও জটিল রহস্য হয়েই রইল মৃত্যুরাজার কাছে।

চত্বরের লোক কমে আসছে। যে যার কাজে চলে যাচ্ছে। একটা দু-চাকার ঠেলাগাড়ি এসে দাঁড়ালো সামনে। গাঁট্টাগোট্টা একজন লোকই ঠেলছে। ইশারায় বললে, নিপুল নিজয় আর সিস-কে গাড়িতে উঠে বসতে।

উঠে বসে সাদা ইমারতের দিকে চাইতেই নিপুল দেখলে বহু লোক জমায়েত হয়েছে তার সামনে। হলুদ রঙের জামা পরা একজন ছুটোছুটি করছে সবচেয়ে বেশী।

কারা ওরা ?—গাট্টাগোট্টা লোকটাকে শুধোয় নিপুল।

—গুবরেদের লোক। ওদের সঙ্গে আমাদের কথা বলা নিষেধ।

—কেন ?

তা জানি না।—বলেই লোকটা টান মারলো গাড়িতে। সিটের পেছনে হেলে পড়লো নিপুল। সেই অবস্থাতেই দেখলে, চারচাকার গাড়ি করে বিস্তর পিপে নিয়ে গিয়ে সাদা ইমারতের দেওয়াল ঘেঁষে জড়ো করছে লোকগুলো। তদারকি করছে হলদে জামা পরা লোকটা।

থামওলা সবুজ বাড়িটার সামনে দাঁড়ালো গাড়ি। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল মিমি।

চমকে উঠল সিস,—তুমি এখানে ?

—আমরা সবাই এখানে থাকি, এখন থেকে তুমিও থাকবে।

ওরা এখন দাঁড়িয়ে আছে পেল্লায় একটা ঘরে। মেঝেতে পাতা সবুজ কার্পেট। দেওয়ালে দুলছে সবুজ পর্দা। কড়িকাঠ সোনালী ধাতু দিয়ে মোড়া। ঘরে কোনো আসবাব নেই। বিস্তর কুশন গড়াগড়ি যাচ্ছে কার্পেটে।

রাজা নিকাডো বসে রয়েছে একধারে। মস্ত পাখা দিয়ে দুদিক থেকে হাওয়া করছে দুজন সুন্দরী।

কপাল কুঁচকে প্রথমে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল নিকাডো। তারপর বললে,—তোমরা দাঁড়িয়ে কেন ? বসো। . . . মাকড়সা-বিষে মারা গেছে

নিবল ?

—হ্যাঁ।

—তা তো যাবেই। মাকড়সাকে মেরেছিল যে। . . . . কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

—মৃত্যু মাকড়সার দরবারে।

চমকে উঠল নিকাডো,—দরবারে ? মানে ?

—তার সামনে।

মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায় নিকাডোর,—কেন ?

তা জানি না। তবে . . .।—বলে গড়গড় করে শুনিয়ে দিলো লোমহর্ষক ঘটনাগুলো।

—কিন্তু কেন ? কেন ?

—মনে তো হয় মাকড়সা হত্যার কারণে।

—জিজ্ঞেস করেছিল সেকথা ?

—না।

তবে সে কারণে নয়।—তীক্ষ্ণ চোকে নিপুলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল নিকাডো। প্রখর ব্যক্তিত্ব ছিটকে পড়ল চাহনির মধ্যে ঃ যদি কিছু জানো এ ব্যাপারে, আমাকে বলতে পারো। তোমার মঙ্গল চাই আমি।

—জানলে তো বলব।

চোখের পাতা না ফেলে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল বিশালদেহী রাজা। বেশ বোঝা গেল, নিপুলের কথা বিশ্বাস হয়নি। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করল নটো শহর থেকে বেরিয়ে আসার পর কি কি ঘটনার মধ্যে দিয়ে গেছে নিপুল আর নিবল।

মাকড়সা নিধনের ঘটনাটা বাদ দিয়ে সবই বলল নিপুল। নিকাডোর চোখ দেখে বুঝল, মন থেকে সন্দেহের কাঁটা যায়নি। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে রাজা ধরে ফেলেছে—বেশ কিছু ব্যাপার চেপে যাচ্ছে নিপুল।

গুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে,—মিমি, নিপুলকে নিয়ে যাও বোন দুটোর কাছে।

ধড়মড় করে উঠতে উঠতে সিস বললে,—আমিও যাবো। ওদের কাছেই থাকব আমি।

শক্তগলায় বললে নিকাডো,—না। তুমি এখানেই থাকবে।

বাচ্চাদের মহলে মেয়েদের থাকতে দেওয়া হয় না।

ধপ করে বসে পড়ল সিস। মুখ বিবর্ণ।

নিপুলকে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে মিমি বললে,—রাজা নিকাডোর এখন এই কাজ। লোকজনদের দাবড়ানি দিয়ে বশে রাখা।

—রাজাকেও কাজ করতে হয় তাহলে ?

—এখানে কাজ করতে হয় প্রত্যেককেই। তোমাদেরও করতে হবে কাল থেকে।

—রাজাকে এ কাজ কে দিয়েছে ?

—মৃত্যু মাকড়সা। একবার দেখেই বুঝেছে, উজবুক মানুষদের ওপর খবরদারি করার উপযুক্ত লোক।

—মাকড়সা দিয়ে খবরদারি করালেই তো হয়।

—মাকড়সারা মানুষদের ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কথাও বলতে পারে না।

—তোমার কি কাজ ?

হেসে ফেলে মিমি,—কিচ্ছু না। এ-শহরে মেয়েরা বলতে গেলে কোনো কাজই করে না।

অনেকক্ষণ থেকেই একটা কথা ঘুরপাক দিচ্ছিল নিপুলের মনে। রাজা নিকাডো তাকে ঘর থেকে সরিয়ে দিল, তার আড়ালে নিজয় আর সিস-কে জেরা করবে বলে।

আচমকা তাই থমকে গিয়ে বললে,—মা আর দাদাও চলুক আমার সঙ্গে। আমি একা যাবো না।

—ওই তো ওরা আসছে।

পেছন ফিরে দেখল নিপুল, ছুটতে ছুটতে আসছে সিস আর নিজয়। কাছে এসেই সোল্লাসে বললে দুজনেই,—রাজা বড় নরম মানুষ। আমাদের কান্না দেখে ছেড়ে দিল।

সত্যিই কি তাই ?—মনে মনে বলে নিপুল।

দু'চাকার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল ওদের জন্যে। ওপরে সারি সারি চেয়ার। চারজনে চারটে চেয়ারে বসল। নিপুল সবুজ চত্বরের দিকে তাকিয়ে বললে,—কি হচ্ছে ওখানে ?

মিমি বললে,—বারুদ ফাটাচ্ছে।

—উদ্দেশ্য ?

—সাদা ইমারত গুঁড়িয়ে দেওয়া।

—কার হুকুমে ?

—মৃত্যুরাজার হুকুমে।

—লাভ কী ?

লাভ লোকসান নিয়ে মাথা ঘামায় না মাকড়সারা। যা তাদের কাছে হেঁয়ালি -তা ভেঙে চুরমাব করে দেখতে চায়—কি আছে ভেতরে।

গাড়ি গড়িয়ে চলেছে চত্বর ঘিরে। পিলপিল করে গোলন্দাজ গুবরেরা ছুটেছে সাদা ইমারতের দিকে। গায়ে গা দিয়ে, একে-ওকে ঠেলে চলেছে কাতারে কাতারে। উৎসাহে উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়ছে প্রত্যেকেই। দূরে সাদা ইমারতের তলার দেওয়াল ঘেঁষে দু-থাক পিপে খাড়া করা হয়েছে। হলদে জামা পরা লোকটা হাত-পা নেড়ে লোকগুলোকে সরে যেতে বললে দূরে। ইমারত ঘিরে নিচু দেওয়ালের এদিকে সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে ছুটে গেল পিপেগুলোর সামনে। একটা ছোট পিপে তুলে নিয়ে তার ভেতরের গুঁড়ো ঢালতে ঢালতে এল দেওয়াল পর্যন্ত। তারপর চকমকি ঠুকে গুঁড়োয় আগুন ধরিয়ে দিয়েই চক্ষের পলকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল নিচু দেওযালের আড়ালে দুহাত চেপে ধরে রইল দু-কান।

গুবরেদের গাদাগাদিতে দাঁড়িযে গেছিল ঠেলাগাড়ি। তাই এত ব্যাপার দেখতে পাচ্ছেল নিপুল। কালো গুঁড়োয আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়তেই সড়াৎ করে গুঁড়োর লাইন ধরে আগুন ধেয়ে গেল সাদা ইমারতের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে নিপুলের মন বললে, ভয়ানক বিপদ ঘটতে চলেছে। তক্ষুনি চিৎকার করে লাফিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে—হ্যাঁচকা টান মেরে দাদা আর মা-কে নামিয়ে নিয়েই মিমি-কে ধরে যেই টান মেরেছে, অমনি প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটল সাদা ইমারতের গোড়ায়। একই সঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠল এক হাজার বজ্র, চোখ ধাঁধিয়ে গেল অত্যুগ্র আলোক ঝলকে। পরমুহূর্তেই হাওয়ার ঝাপটায় ঠিকরে গেল নিপুল—আছড়ে পড়তেই ধাক্কার চোটে চোখে ধোঁয়া দেখল কিছুক্ষণের জন্যে। তারপরেই ধড়মড় করে উঠে পড়ে দেখলে--সে, দাদা আর মা তিনজনেই তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে রাস্তায়। গাড়ি উল্টে গেছে। মিমি কাৎরাচ্ছে জখম হয়ে। হুলুস্থুল কাণ্ড চলছে গুবরেদের পালে। যে যেদিকে পারে ছুটছে। অনেকগুলো গুবরে উল্টে গিয়ে পা ছুঁড়ছে শূন্যে। মৃত্যুরাজার কালো বাড়ির সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল কালো মাকড়সা। বিস্ফোরণের ধাক্কায় আর আচমকা হাওয়ার ঝাপটায় বেশ কয়েকটা গুবরে ঠিকরে

পড়েছে তাদের ওপর। মাকড়সারা তাদের ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। একটা মাকড়সা বিষদাঁত মারলো একটা গুবরের শক্ত খোলায়। পিছলে গেল কামড়। সঙ্গে সঙ্গে একতাল ধোঁয়া বেরিয়ে এল গুবরের পেছনকার প্রত্যঙ্গ থেকে। খুব কাছে দাঁড়িয়েছিল বলেই নিপুলের গায়ে এসে লাগল ধোঁয়ার আঁচ। ত্রস্তে সরে গেল মাকড়সা—একটা পা তার উড়ে গেছে এক বিস্ফোরণেই।

গুবরেদের সঙ্গে মাকড়সাদের সন্ধি করার কারণটা এবার স্পষ্ট হল নিপুলের কাছে। মাকড়সারা অতিকায় হতে পারে—গুবরেরাও কম-সে-কম ছ'ফুট লম্বা। ছোটখাট টিলার মত উঁচু। শক্ত সবুজ বর্মে মোড়া পিঠ। সামনে অনেকগুলো শুঁড়—পেছনে একটা লম্বাটে খাটো প্রত্যঙ্গ অথবা শুঁড়—এখুনি আগুন আর ধোঁয়া বেরিয়ে এল সেখান থেকে। ঠিক যেন কামান দেগে উড়িয়ে দিল আটপেয়ে কালো দানবের একখানা ঠ্যাং।

হলদে জামা পরা লোকটাকে এবার সে চিনতে পেরেছে। হরিশ। জাহাজঘাটায় প্রথম দেখা হয়েছিল। বড় আমুদে লোক। একমাত্র হরিশই জানে নিপুলের মনের শক্তির ক্ষমতা। তাই তার সামনে দৌড়ে গেল নিপুল। বললে,—এসব কি ?

দাঁত বের করে হাসল হরিশ,—এসো ! এসো ! দাঁড়াও আগে মালিকদের সঙ্গে কথাটা বলে নিই।

মালিক !—অবাক হয় নিপুল।

—ওই তো আসছে।

সবুজ-পৃষ্ঠ অনেকগুলো গুবরে অতবড় চেহারা নিয়ে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় হু-হু করে চলে এল হরিশের সামনে। সামনের শুঁড় নেড়ে যাচ্ছে নানারকমভাবে। হরিশও সেইভাবে দু'হাত নাড়ছে। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে ইশারায় কথাবার্তা বলে নিয়ে আবার হু-হু করে আশ্চর্য গতিবেগে উধাও হয়ে গেল সবুজ ঢিপিগুলো।

একগাল হেসে হরিশ বললে,—অসম্ভব !

কী অসম্ভব !—নিপুল জানতে চায়।

—এ ইমারত উড়িয়ে দিতে গেলে ডিনামাইট অথবা টি-এন-টি দরকার।

—ওড়াচ্ছো কেন ?

—কর্তাদের হুকুম। আমার কর্তারা চায় দুমদাম আওয়াজ শুনতে, আর

তোমার কর্তারা চায় ভেতরে কি আছে দেখতে।

—কি আছে বলে মনে হয় ?

—কি করে বলব ? নিরেট বাড়িও হতে পারে।

—নিরেট।

নইলে একটু চিড়ও খায় না কেন। এসো, দেখবে এসো !—বলে হরিশ নিজেই বালতির জলে ন্যাকড়া ডুবিয়ে মুছে দিল দেওয়াল। পোড়া বারুদের কালো প্রলেপ উঠে যেতেই বেরিয়ে পড়ল মসৃণ দেওয়াল। কোথাও চিড় খায়নি।

সেদিকে তাকিয়েই হঠাৎ কিরকম যেন হয়ে গেল নিপুল। দেওয়ালটা পুরোপুরি সাদা নয়—গভীর জলের দিকে তাকালে যে রকম অনুভূতি জাগে মনের মধ্যে—নিপুলেরও এখন মনে হচ্ছে ঠিক তাই। নীলচে আর ধূসর আভা যেন মিশে রয়েছে মসৃণ দেওয়ালে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিপুলের মনে হল, ইচ্ছে করলে সে দেওয়াল ফুঁড়ে ভেতর পর্যন্ত দেখতে পারে। সেই ইচ্ছে করতে গিয়েই কিন্তু ঝিমঝিম করে উঠল মাথার ভেতরটা। আর একবার মনের জোর পরখ করতে গিয়েই মাথা ঘুরে গেল। প্রবলতর শক্তির ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে আসছে তার মন। হাতের চেটো উপুড় করে রাখল দেওয়ালে। শিরশির করে উঠল পুরো বাহু। একই সঙ্গে দু'হাতের চেটো দেওয়ালে চেপে ধরতেই চিরিক দিল সর্বাঙ্গে। শিউরে শিউরে উঠল পা থেকে মাথা পর্যন্ত। হাত সরিয়ে নিতেই আবার সহজ হয়ে গেল শরীর আর মন। কিন্তু মাথার ঘোলাটে ভাবটা গেল না কিছুতেই। এটুকু শুধু বুঝল, অনেক বিচিত্র প্রহেলিকা জমাট হয়ে রয়েছে এই শ্বেত সৌধের অঙ্গে। অসাধারণ মানসিক শক্তি নিয়ে মাকড়সারা হার মেনেছে। গোলন্দাজ গুবরেদের দিয়ে ইমারত উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেও বিফল হয়েছে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিরন্তর আহ্বান জানিয়ে চলেছে দু'খানা বাড়ি ! একখানা এই রহস্যময় সাদা ইমারত, আর একখানা জানালাবিহীন কালো সৌধ। যার ভেতরে অজস্র জাল পেতে বসে আছে মৃত্যুরাজা স্বয়ং।

বিমূঢ়ের মত চেয়েই রইল নিপুল। চমক ভাঙলো কড়া ধমকে,—কি করছ এখানে ?

শুচিতা এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে।

নিপুল বললে,—দেখছি।

—চাকরদের এখানে আসতে দেওয়া হয় না।

—জানতাম না। বোনেদের দেখতে যাচ্ছিলাম। আচমকা গোলমালে গাড়ি উল্টে গেল।

—চলো আমি নিয়ে যাচ্ছি। হুকুম আছে তো যাওয়ার ?

—রাজা নিকাডো হুকুম দিয়েছে।

—নতুন সর্দার ?—একটু যেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বললে শুচিতা।

গড়গড়িয়ে গাড়ি চলেছে শহরের অন্যদিকে।

নিপুল শুধোয় শুচিতাকে,—কয়েকটা প্রশ্ন করব ?

ধারালো চোখে তাকায় শুচিতা,—চাকরদের প্রশ্ন করা বারণ।

—করলে কি হবে ?

—সাগরপাড়ের সুখের দেশে পাঠানো হবে।

—সুখের দেশে কি শান্তি পাবো ?

অদ্ভুত চোখে তাকায় শুচিতা,—চাকরদের বয়স হয়ে গেলেই যেতে হয় সেদেশে।

—সুখে থাকার জন্যে ? কিরকম সুখ ?

—জানি না।

নিপুল চুপ করে গেল। উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে এটুকু বুঝে ফেলেছে, সাগরপাড়ের সুখের দেশের রহস্য মানুষদের জানানো হয় না।

গাড়ি এসে গেছে একটা চওড়া রাস্তায়। রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের ডগায় ছুঁচের মত তীক্ষ্ণমুখ বর্শা পোঁতা সারি সারি। এক জায়গায় একটা লোহার ফটক। ফটকের দু'পাশে দাঁড়িয়ে দুটো নেকড়ে মাকড়সা।

শুচিতাকে মান্যগণ্য করে নেকড়ে-মাকড়সারা। ওকে দেখেই সরে দাঁড়াল ফটক ছেড়ে। অমনি ওদিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল কালো পোশাক পরা একটা মেয়ে। মুখে রাগ আর বিরক্তির ছাপ।

হেঁকে বললে,—এখানে কেন ?

বাচ্ছাদের মহলে যাবো। মেয়েদের দেখতে চায়।—বলে দেখালো সিস-কে।

—ছেলেদুটো কেন এসেছে ?

—ওদের বোন। হুকুম আছে আসার।

রাগতমুখে প্রকাণ্ড চাবি বের করে ফটকের তালা খুলে দিল মেয়েটা। একটু দূরে গিয়ে বললে নিপুল,—মেয়েটা এত রেগে রেগে কথা

বলল কেন ?

—এদিকে পুরুষ মানুষদের আসার হুকুম নেই। এলেই মৃত্যু।

রাস্তা বিলকুল ফাঁকা। চাকর, নেকড়ে-মাকড়সা, গাড়ি—কিচ্ছু নেই। মাথার ওপরে ঝুলন্ত মাকড়সার জালেও বিস্তর ধুলো জমে রয়েছে। সঙ্কীর্ণ রাস্তা শেষ হয়েছে একটা চৌকোনা ঘাস জমির ধারে। চত্বরের চারদিকে উঁচু থাম।

আঙুল তুলে বললে শুচিতা,—মেয়ে মহল।

জায়গাটার রঙের বাহার দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় নিপুলের। এতক্ষণ দেখেছে শুধু কালো আর ধোঁয়াটে রঙের বাড়ি। এই চত্বরের চারদিক ঘিরে থামগুলোর সামনে ভারি সুন্দর বাড়িগুলোয় যেন হাজার হাজার রামধনু ঝলমল করছে। দরজা জানলা অটুট। একটাও ভেঙে পড়েনি।

মেয়ে মহলের পাশ দিয়ে গাড়ি এল নদীর পাড়ে। ওপাড়ে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো সাদা বাড়ি। নদীর ওপর ব্রীজ একটাই—কিন্তু তা ভাঙা।

শুচিতা গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললে,—ওই হল বাচ্ছা মহল।

নিপুল বললে,—ব্রীজ ভাঙা, নদী পেরোবে কি করে ?

পাড়ে বাঁধা নৌকোটা দেখিয়ে শুচিতা বললে,—নৌকোয় করে।

-ব্রীজ ভাঙা কেন ?

—ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ছেলেমেয়েদের দেখতে এসে অনেক মা সবাইকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চায়। এসো, সিস।

নৌকোর দিকে এগিয়ে যায় শুচিতা আর সিস। নদীর ওপাড়ে কুঠার কাঁধে দানবীর মত দাঁড়িয়েছিল একটা মেয়ে। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে এদিকে।

ও কে ?—নিপুলের প্রশ্ন।

—ওর কাজ মানুষ বলি দেওয়া।

—তার মানে ?

—বাচ্ছামহল থেকে বাচ্ছাদের নিয়ে যে-মা পালাতে চায় তার মুণ্ডুখানা ধড় থেকে আলাদা করে দেওয়া। গত সপ্তাহেই একজনের মুণ্ডু নামিয়েছে।

—সেটা কী একটা অপরাধ ?

—অপরাধ নয় ? বাচ্ছাদের জন্যে মায়েদের প্রাণ কাঁদবে কেন ? বাচ্ছারা আপনি মানুষ হবে। কেউ কাউকে চিনবেও না।

সিসকে নিয়ে নৌকোয় উঠে বসল শুচিতা।

এপাড়ে দাঁড়িয়ে কুঠারধারী মেয়েটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল নিপুল। বজ্জাতি বুদ্ধিটা আবার মাথার মধ্যে চাড়া দিয়েছে। নদীর এপাড়ে দাঁড়িয়ে মনকে ফোকাস করল ওপাড়ের কুঠারধারিনীর মনের মধ্যে। কিন্তু ঢুকতে পারল না কিছুতেই। কোথায় যেন আটকে যাচ্ছে। বারকয়েক চেষ্টা করার পর হাল ছেড়ে দেয় নিপুল। তার পরেই সন্দেহ হয়, কুঠারধারিনীর মন কি মানুষের মনের নিচের স্তরে বেঁধে দেওয়া হয়েছে ?

সন্দেহটা মাথার মধ্যে জাগতেই, আবার চেষ্টা চালায় নিপুল। এবার অতি সহজেই নাগাল পায় কুঠারধারিনীর আশ্চর্য মনের। আশ্চর্য এই কারণে যে, মনটা মানুষের মন নয়—ইতর প্রাণীর মন। মাকড়সারাই ক'রেছে এই কাণ্ড। মানুষের মন বড় জটিল। কব্জায় রাখা কঠিন। ইতর প্রাণীর মনে ঘোরপ্যাঁচ কম—নিয়ন্ত্রণ করতে সুবিধে।

নিপুলও সহজেই মুঠোর মধ্যে এনে ফেলল কুঠারধারিনীর মনকে। মনে মনে হুকুম দিলে, কাঁধ থেকে কুঠার নামাতে, একপা এগিয়ে যেতে, তারপর ডাইনে ঘুরে দাঁড়াতে। হুবহু তাই করে গেল বিশাল মেয়েটা।

একক্ষণে বুঝল নিপুল, মৃত্যুরাজা কেন তাকে নিয়ে এত ভাবনায় পড়েছে। নিপুলের গুপ্ত রহস্য জানতে না পেরে উদ্বেগে ছটফট করছে। মানুষ যদি মন নিয়ন্ত্রণের কৌশল রপ্ত করে ফেলে, তাহলে তো দিন ফুরিয়ে গেল মাকড়সাদের। চাকরদের মন যে চাবি দিয়ে খোলা যায়—তার নকল যদি নিপুলের মনের মধ্যে থাকে—তাহলে যে কোনো মনের দরজা খুলে হুকুম দেবে খুশি মত।

গাড়ি এসে দাঁড়াল সবুজ প্রাসাদের সামনে। নিকাডোর সদর দপ্তর এখানেই। কিন্তু এখন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কেন দু-দুটো নেকড়ে মাকড়সা ?

দুপুরের সূর্য মাথার ওপর গনগন্ করছে। আরামে রোদ পোহাচ্ছে দুই আটপেয়ে লোমশ দানব। ভেতর থেকে হনহন্ করে বেরিয়ে এল কৃষ্ণবসনা এক সুন্দরী। কালো পোশাক তারাই পরে যারা কালো মাকড়সাদের হুকুমে খাটে। মৃত্যুরাজার খাস বান্দা এরা।

বিশেষ এই মেয়েটার মুখ তেতো হয়ে রয়েছে বিষম বিরক্তিতে। দুই চোখে জঘন্য বিতৃষ্ণা নিয়ে বারবার তাকাচ্ছে নিপুল, নিজয় আর সিস-এর দিকে।

নিপুল কারণ খোঁজবার জন্যে সুট করে নিজের মন চালান করে দিলে

তার মনের মধ্যে। তার দু চোখের মধ্যে দিয়েই দেখল নিজের মা-কে। *ঠিক যেন বাঁদরী ! নিজয়কে মনে হল একটা নোংরা পোকা।*

তাই এত বিতৃষ্ণা মেয়েটার ! মরুভূমির বর্বরদের সম্বন্ধে এত কদর্য ধারণা এর মাথায় কে ঢুকিয়েছে ? এর কালো প্রভুরা নিশ্চয়।

শুচিতা সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণবসনার সামনে। নিপুল, নিজয় আর সিস নেমে দাঁড়াতেই চকিতে গাড়িতে উঠে উধাও হয়ে গেল রাস্তার মোড়ে।

মুখ বেঁকিয়ে বললে কৃষ্ণবসনা,—এসো।

☐ *এগারো* ☐

বাইরের হলঘরে পা দিয়েই বুকটা ধড়াস করে ওঠে নিপুলের। ঘর থিকথিক করছে কালো মাকড়সায়। অগুন্তি কালো চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে। করাল ইচ্ছাশক্তি হিমেল হাওয়ার মতই কনকনে ঝাপটা মেরে যাচ্ছে সর্বাঙ্গে।

ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুটে পালানোর প্রবল ইচ্ছাটাকে সামলে নেয় নিপুল। আচমকা ভয়কে দমন করে শক্তভাবে। ইচ্ছাশক্তি যে সারা শরীরে কনকনে পরশ বোলাতে পারে—এই অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম। নেগেটিভ চার্জ দিয়ে যেন তাকে শক্তিহীন করে দিতে চাইছে।

ঘরভর্তি মাকড়সাদের মাঝখান দিয়ে গটগট করে হেঁটে গেল কৃষ্ণবসনা। পেছনে নিপুল, নিজয় আর সিস। ঘর পেরিয়ে লম্বা গলিপথ। নিকাডোর হলঘরের সামনে দিয়ে গিয়ে একটা ছোট ঘরে সিস-কে ঠেলে ঢুকিয়ে দরজায় তালা দিলে বাইরে থেকে। তার পাশের ঘরটায় ঢোকাল নিজয়কে। এ ঘরেও তালা পড়ল। নিপুলকে নিয়ে গেল দোতালায়। এখানকার দেওয়াল ভাঙা, সিঁড়ি ভাঙা। চারদিকে হতশ্রী অবস্থা। নিঝুম, নিস্তব্ধ। একটা ঘরে নিপুলকে লাথি মেরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা টেনে বন্ধ করে দিলে বাইরে থেকে।

হুমড়ি খেয়ে আছড়ে পড়ল নিপুল। নোংরা স্যাঁৎসেঁতে মেঝে। ডুকরে কেঁদে উঠল এই প্রথম। সামলে নিল পরক্ষণেই। বাবার কথা মনে পড়ছে। হারলে চলবে না।

মৃত্যুরাজা কি জানতে পেরেছে, কালো মাকড়সার মৃত্যু ঘটেছে তারই হাতে ? ধাতুর চোঙা এখন আর নিপুলের কাছে নেই। থলির জিনিসপত্র কি মৃত্যুরাজার কাছে ? চোঙার গায়ে মাকড়সার রক্ত লেগেছিল, কিন্তু তা সাফ করেছিল নিপুল। মৃত্যুরাজা কি তীক্ষ্ণ অনুভূতি দিয়ে চোঙার গায়ে মৃত মাকড়সার চিহ্ন পেয়েছে ? চোঙাটা সঙ্গে করে না আনলেই হত। মরুভূমির গর্তে রেখে এলেই হত।

আচমকা নিপুলের মনে হল, কেউ ওকে পলকহীন চোখে দেখছে।

ঘর অন্ধকার। দিনের আলো ঢুকছে না। মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়েছিল নিপুল। ধারণাটা মনের মধ্যে আসতেই মুখ তুলে চাইল দরজার দিকে। অমনি মন থেকে মিলিয়ে গেল অদ্ভুত ধারণাটা।

আবার মুখ গুঁজে চোখ বুজতেই মনে হল কে যেন তাকে দেখছে।

আর মুখ তুলল না নিপুল। আড়াল থেকে কেউ যে তার মনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল তা বুঝেছে। অবসন্ন শরীরে মনকে আলগা করে দিয়েছিল লাথি খেয়ে আছড়ে পড়ার পর। ভাবনাগুলো ছাড়া পেয়ে খেলে বেড়াচ্ছিল মনের মধ্যে। কেউ তা পড়ে নিয়েছে আড়াল থেকে।

সে কে ?

মনকে শূন্য করে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নিঃসাড়ে পড়ে রইল নিপুল। একটু পরেই কঁ্যাচ করে শব্দ হল পাসের ঘরের দরজায়। গলিপথের পুরোনো পাটাতন মচ্‌মচ্‌ করে উঠল। তারপর আবার সব নিস্তব্ধ।

বুঝে নিল নিপুল। এরকম হাল্‌কা চরণে যেতে পারে কেবল মাকড়সা। আটখানা পা ছড়িয়ে হেঁটে গেল বলেই বেসি শব্দ হল না। কঁ্যাচ করে দরজা খুলে পাশের ঘর থেকে বেরিয়েছে এই জঘন্য জীবটাই।

নিপুলের পেছনে গুপ্তচর লাগিয়েছে মৃত্যুরাজা!

ঘন্টা কয়েক পরে দরজা খুলে গেল। একটি মেয়ে ঢুকল ঘরে। তাকে চেনে নিপুল। নিকাডোর পেছনে দাঁড়িয়েছিল।

সে বললে,—এসো, নিপুল।

একটি কথাও না বলে তার পেছন পেছন সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নিপুল। ঢুকল নিকাডোর ঘরে।

ঘরে নিকাডো ছাড়া এখন কেউ নেই।

বিশালদেহী রাজা খাতির করে নিপুলকে বসাল তার সামনে।

তারপর বললে স্পষ্ট গলায়,—মারণ-মাকড়সাকে তুমি মেরেছো?

হ্যাঁ। —সঙ্গে সঙ্গে বললে নিপুল ঃ গুপ্তচরে খবর দিয়ে গেল?

গুপ্তচর!— চমকে উঠেছে নিকাডো।

— এতক্ষণ যে-ঘরে ছিলাম, তার পাসের ঘরে ছিল একটা মাকড়সা। আমার মনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।

তুমি বুঝলে কি করে? চোখ ছোট হয়ে গেছে নিকাডোর।

আমি বুঝতে পারি।—ছোট্ট জবাব দিল নিপুল।

চেয়ে রইল নিকাডো,—এই জন্যেই মৃত্যুরাজা তোমাকে কাজে লাগাতে চায়।

—কি কাজে?

—তোমার মত আরও যারা আছে, তাদের খুঁজে বের করতে হবে। পারবে?

—না পারার কি আছে? তবে ও কাজ তো আমি করব না। তার চাইতে আমাকে মেরে ফেলুক মৃত্যুরাজা।

—নিপুল, এরা তা চায় না। এরা বুঝেছে, তোমার মত মানুষদের এবার কর্তৃত্ব নেবার সময় হয়েছে। এই উজবুক মানুষগুলোকে সংগঠিত রাখার জন্যে আমাদের দরকার।

—আপনাকে কেন ?

—মানুষ আমাকে শ্রদ্ধা করে। মৃত্যুরাজা তা বুঝতে পেরেই আমাকে খেয়ে ফেলেনি। লাখলাখ মানুষ রয়েছে খাবার জন্যে, আমার মত একজনও নেই।

—কেন নেই ?

—দশ প্রজন্ম ধরে মানুষকে আহাম্মক বানিয়েছে মাকড়সারা। কলের পুতুল বানিয়েছে। এখন বুঝেছে, কলের পুতুলদের চালানোর জন্যেও মানুষ দরকার। সেই জন্যেই মরুভূমির বর্বরদের এদের দরকার। ওরা জানে কে কোথায় আছে। তুমি ওদের সঙ্গে যাবে, তোমার মত মানুষদের শুধু চিনিয়ে দেবে।

—ওবা জানে কে কোথায় আছে ?

—সব জানে। অত বেলুন উড়ে যায় এই কাবণেই। এরা চায় মানুষ টিকে থাকুক যে-যার জায়গায়—কিন্তু মাথা তুলতে যেন না পারে। কিছু বুদ্ধিমান মানুষ দরকার শুধু এইজন্যেই।

—মাকড়সাদের গোলামি করার জন্যে ?

—নিপুল, লোক এরা খারাপ নয়। মাকড়সাদের 'লোক' বলছি বলে মুখ বেঁকিও না। এদের মধ্যে রাজনীতিবিদ আছে, ইঞ্জিনীয়ার আছে, শিল্পী আছে। মগজের শক্তি এদের অসাধারণ।

—সেইজন্যে মানুষ খায় ?

—মানুষ এককালে ঘরে পোষা জন্তুদের ভালোওবাসত—আবার খিদে পেলেই তাদের খেত। এরা'ও মানুষকে পোষে, খিদে পেলে তাদের খায়—দোষটা কোথায় ? মরুভূমিতেও মানুষ পুষে রেখেছে—দরকার পড়লেই সেখান থেকে তাদের তুলে আনবে বলে।

তা তো বটেই। দু-শ বছরে এই প্রথম একটা মারণ-মাকড়সা মারা গেল মানুষের হাতে। এই ঘটনা বিচলিত করেছে কর্তা-মাকড়সাদের। এতদিন ভেবেছিল, মাকড়সারা অজেয়, অবধ্য। যে মাকড়সাটা মারা গেছে, তার মগজ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দেখে এরা থ হয়ে গেছে। ব্যাপারটা কম কথা নয়।

মগজ গুঁড়োনোর সময় পেলে কি করে ? ইচ্ছাশক্তি দিয়েই তো তোমাকে অসাড় করে দিত, কাছেও ঘেঁষতে দিত না।

সে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আটকাতে পারেনি।

—মারলে কি দিয়ে ?

'চুপ করে রইল নিপুল। গুপ্ত রহস্য ফাঁস করতে চায় না।

বালিশের তলা থেকে ধাতুর চোঙাটা টেনে বের করে বললে নিকাড়ো, —এই দিয়ে ?

না চমকে নিপুল বললে,—হ্যাঁ।

—কিভাবে ?

চোঙাটা হাতে নিয়ে বোতামে চাপ না দিয়ে শুধু আছাড় মারা ভঙ্গী করে বললে,—এইভাবে।

চোঙা কিন্তু আর হাতছাড়া করল না।

নিকাড়ো তা দেখল। বলল—ওটা তোমার কাছেই রাখো। কিন্তু আজ রাতটা ভাবো। কাল বলবে, মৃত্যুরাজার কাজ করবে কিনা। আমাকে দেখো। আমি কি নিজের জন্যে এত করছি ? করছি সবার জন্যে। একটা কথা শুনে রাখো—মৃত্যুরাজা এখনও জানে মারণ-মাকড়সাকে মেরেছে তোমার বাবা। তাকে খতম করা হয়েছে সেইজন্যে। শোধবোধ হয়ে গেছে। এখন তুমি মানুষের মঙ্গলের জন্যে এদের কাজ করবে না কেন ? আবার বলছি, এরা লোক ভালো। তবে অসম্ভব শক্তি মনে। মানুষকে নির্বংশ করতে পারে ইচ্ছে করলেই। এদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে লাভ নেই। এসো। কাল দেখা হবে।

বাইরে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা। অন্য একটা ঘরে রেখে গেল নিপুলকে। একটু পরে এনে দিল খাবারদাবার আর জল।

নিপুল বললে,—মা আর দাদা কোথায় ?

– এখানেই আছে। ভালো আছে। আর কিছু দরকার ?

-- না।

চলে গেল মেয়েটা। ভেজিয়ে দিয়ে গেল দরজা। তালা বন্ধ করল না।

চুপ করে বসে রইল নিপুল। খিদে নেই, তবুও দু-চার গ্রাস খেয়ে জল খেয়ে নিয়ে আবার বসে রইল উবু হয়ে। হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে।

ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল এইভাবে। দিনের আলো মিলিয়ে গেল, এল সন্ধ্যা। তারপর রাত। চাঁদ উঠল আকাশে। গোটা মাকড়সা শহর এখন নিস্তব্ধ।

হাঁটু থেকে মুখ তুলল নিপুল। মেঝে থেকে তুলে নিল ধাতুর চোঙা। বোতামে আঙুল ছোঁয়াতেই শিরশির করে উঠল আঙুলটা। ঠিক এই রকম অনুভূতি জেগেছিল সারা শরীরে—সাদা ইমারতের দেওয়ালে হাতের চেটো চেপে ধরার পর।

উঠে দাঁড়াল নিঃশব্দে। মনস্থির হয়ে গেছে।

বেরিয়ে এল বাইরে। গলিপথ খাঁ-খাঁ করছে। নিকাডোর হলঘরের দরজা খোলা। কেউ নেই ভেতরে। তারপরের বড় হলঘরে আর নেই কালো মাকড়সার দল। রাস্তায় নেই নেকড়ে-মাকড়সা। মাথার ওপর জালের ফাঁক দিয়ে ঝকঝক করছে চাঁদ। এ সময়ে মানুষ বেরোয় না শহরের রাস্তায়। কিন্তু নিপুল সম্পূর্ণ নির্ভয়। ধাতুর চোঙা হাতে হেঁটে চলেছে সাদা ইমারতের দিকে। সবুজ ঘাস জমি পেরিয়ে সাদা দেওয়ালের সামনে পৌঁছে দেখলে বহুদূরে কালো ইমারতের সামনে দাঁড়িয়ে দুটো নেকড়ে-মাকড়সা চেয়ে রয়েছে এই দিকেই।

চোঙার বোতামে আঙুল ছোঁয়ায় নিপুল। চিন্‌চিন্‌ করে ওঠে মাথার ভেতর। সাদা দেওয়াল ওকে টানছে চুম্বকের মত। চোঙার ডগা ঠেকে যায় দেওয়ালে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে যায় মাথা। অন্ধকারের রাশি নামে চোখের সামনে। সারা গা পাক দিচ্ছে, বমি পাচ্ছে। আচমকা ঘোর কেটে যায়। মাথা পরিষ্কার হয়ে গেছে। অন্ধকার কেটে গেছে। আলো, আলো, শুধু আলো।

নিপুল এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে সাদা ইমাবতের ভেতরে।

চোখের ধাঁধা কাটাতে একটু সময় গেল। হতভম্ব হল তারপরেই।

সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে আছে নিপুল। কয়েক গজ দূরে ঢেউ ভেঙে পড়ছে শ্যাওলা-সবুজ পাথরের ওপর।

এ কী স্বপ্ন ?

মনে পড়ল ঠাকুর্দার কথা। জাদুকররা ইচ্ছে করলে এমনি ভেলকি দেখাতে পারে। তাহলে, ম্যাজিকই দেখছে নিপুল। আকাশ ফিকে নীল রঙের। ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গাছগুলো একেবারেই অচেনা। এমন কি সমুদ্রের রঙও ধূসর রঙের। দুদিন আগে যে সমুদ্র পেরিয়ে এসেছে, সেরকম রঙের নয়।

চোখ ফিরিয়ে আনতেই চমকে উঠল ভীষণভাবে। শ্যাওলা-সবুজ পাথরের ওপর বসে আছে একটা বুড়ো মানুষ। একটু আগেও ছিল না সেখানে।

জাদুকর তাহলে এই বুড়ো-ই।

মাথা হেঁট করে বসেছিল বৃদ্ধ। মুখ তুলতেই অবাক হয়ে গেল নিপুল। এ যে তার ঠাকুর্দা জোমো !

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মন্ত্রমুগ্ধের মত। ভুলটা কেটে গেল সঙ্গে

সঙ্গে। বৃদ্ধকে দেখতে জোমোর মত—কিন্তু জোমো নয়। ভাই-টাই কেউ হবে।

উঠে দাঁড়িয়েছে বুড়ো। হাল্কা সবুজ রঙের অদ্ভুত ডিজাইনের জামা-কাপড় ঢেকে রয়েছে গলা থেকে পায়ের গোছ পর্যন্ত। পায়ে চকচকে কালো জুতো। তার চোখের মণিও হাল্কা সবুজ রঙের। জোমোর চোখের মণিতে ছিল ঘোলাটে হলদে রঙ।

হাসল বৃদ্ধ। বললে,—তোমার নাম নিপুল ?

– হ্যাঁ।

–আমার নাম বিস্পে। আমাকে ছোঁবার চেষ্টা করবে না।

কেন ?

—পরে বুঝবে। ওই পাথরটায় বোসো।

- বসছি। আপনি আগে বসুন।

ঠিক আছে। কোথায় এসেছো বলে মনে হচ্ছে ?

—সাদা ইমারতের ভেতরে . . . না . . . ছিলাম সাদা ইমারতের ভেতরে।

– এখনও রয়েছো সাদা ইমারতের ভেতরে। চোখ বুঁজে পাথরে হাত দাও।

– চোখ বন্ধ করল নিপুল। হাত বুলিয়ে গেল পাথরে। পাথর বলে তো মনে হচ্ছে না –বেশ মসৃণ—হাত পিছলে যাচ্ছে।

চোখ খুলল তক্ষুনি। পাথরই দেখছে। খড়খড়ে—শ্যাওলা লেগে আছে মাঝেমাঝে।

হেসে বললে বিস্পে,—আবার চোখ বোজো। জুতো খুলে পা বুলোও।

এবার খালি পায়ে বালি ঠেকছে বলে মনে হল না। মসৃণ কিছু একটা ওপর পা হড়কে যাচ্ছে। চোখ খুলে দেখলে, বালি হয়েছে পায়ের তলায়। হেঁটে আসবার সময়েও মনে হয়েছে, বালির ওপর দিয়ে হাঁটছে। শক্ত মসৃণ কিছু তো ছিল না বালির জায়গায়।

নিপুল বললে,—আপনি জাদুকর।

মাথা নেড়ে বৃদ্ধ বললে,—না। ম্যাজিক আমি জানি না। এই সমুদ্র সৈকত-ও ম্যাজিকের ধোঁকাবাজি নয়। এর নাম প্যানোরামিক হলোগ্রাম। মানুষ যখন পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়িয়েছে, তখন বাচ্ছাদের মজার মাঠে থাকত এই দৃষ্টিবিভ্রমের খেলা।

সাগ্রহে শুধোয় নিপুল,—কদ্দিন আগে ? কত বছর আগে মানুষ রাজত্ব করেছে এই পৃথিবীতে ? জানেন কিছু ?

—সব জানি।

—আপনি কি সেই প্রাচীন মানুষদেরই একজন ?

না, আসলে আমি এখানেই নেই। আমার হাতটা ধরো, তাহলেই বুঝবে।—বলে হাত বাড়িয়ে দেয় বৃদ্ধ। নিপুল কিন্তু পাঞ্জার মধ্যে আনতে পারল না বুড়োর মুঠোকে। মুঠোর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেল নিজের হাত। বেশ মজা তো !

হাসল বৃদ্ধ। যেন কতদিনের চেনাজানা।

নিপুল বললে,—কিন্তু আপনার বয়স তো অনেক।

—মোটেই না। তোমার চাইতেও বয়স কম আমার।

—কত বয়স ?

—কয়েক মিনিট। . . . অবাক হচ্ছো ? চলো ওপরে যাই—সব বলব।

ওপরে কোথায় ? ওপরে তো নীল আকাশ। কিন্তু ওপর দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল নীল আকাশ। সে জায়গায় দেখা গেল আলো ঝলমলে সাদা সিলিং। দূর দিগন্তের পাহাড়গুলো হয়ে গেল সাদা ইমারতের শুভ্র দেওয়াল। শ্যাওলা-সবুজ পাথরে বসে নেই—রয়েছে মসৃণ কাঠের টুলে। বৃদ্ধও বসে রয়েছে একই রকম টুলে। ঘরটা গোলাকার। আসবাব একদম নেই। শুধু একটা চোঙা উঠে গেছে ঘরের মেঝের মাঝখান থেকে সিলিং পর্যন্ত। চোঙার গা থিরথির করে কাঁপছে—ধোঁয়ার মত অস্থির—অনবরত নড়েচড়ে সরে যাচ্ছে।

টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বৃদ্ধ। হেঁটে গিয়ে সটান ঢুকে গেল থামের মধ্যে। আর তাকে দেখা গেল না। ভেতর থেকে ভেসে এল কণ্ঠস্বর,—হেঁটে চলে এসো নিপুল, যেভাবে আমি এলাম।

ধোঁয়াময় সাদা থামের ভেতরে পা দিতেই নিপুল দেখলে, সাদা কুয়াশা ঘিরে ধরেছে চারদিক থেকে। বেগে ওপর দিকে ধেয়ে যাচ্ছে গোটা শরীরটা। একটু পরে একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বন্ধ হয়ে গেল ঊর্ধ্বগতি।

বৃদ্ধ বললে,—হেঁটে বেরিয়ে এসো।

মুহূর্তের জন্যে নিপুলের মনে হল, মাথার ওপর রয়েছে রাতের আকাশ। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চাঁদ আর তারা। চারপাশে রয়েছে মাকড়সা শহর। মৃত্যুরাজার কালো বাড়ি দেখা যাচ্ছে, কয়েক শ গজ দূরে। দরজায় দাঁড়িয়ে নেকড়ে-মাকড়সা দুটো।

হেঁটে বেরিয়ে এসে দু-হাত সামনে বাড়িয়ে দিতেই হাতে ঠেকল কাঁচের দেওয়াল। অদ্ভুত রকমের স্বচ্ছ। ভেতরের জোরালো আলোর কণাও

যাচ্ছে না বাইরে।

নেকড়ে-মাকড়সাদের দিকে আঙুল তোলে নিপুল, —ওরা কি দেখতে পাচ্ছে আমাকে ?

—না। এ ঘর থেকে আলো বাইরে যায় না, বাইরের আলো ভেতরে আসে।

ঘরটা গোলাকার। চেয়ার আর সোফা কালো চামড়ার মত বস্তু দিয়ে মোড়া। মেঝেতে পাতা নরম কালো কার্পেট। কাঁচের দেওয়ালের গায়ে একটা লম্বাটে কালো বাক্স ; বাক্সর সামনের ঢালু দিকে অর্ধস্বচ্ছ কাঁচের প্যানেল ; প্যানেলে অনেকগুলো বোতাম। অবিকল এই যন্ত্র মরুভূমিতে দেখেছিল নিপুল।

এটা কী ?—বললে আঙুল তুলে দেখিয়ে।

—এখানকার সবচাইতে দামি জিনিস। গোটা শহর তৈরি করতে যা খরচ, তার চাইতে বেশি খরচ হয়েছে শুধু একে বানাতে গিয়ে।

—এর কাজ ?

—অনেক। যেমন ধরো, আমাকে সৃষ্টি করা।

—ভগবান নাকি ?

—না, মেশিন।

—শুধু ভগবানই সৃষ্টি করতে পারে বলে জানি।

—সত্যি নয়। এই তো তুমিও আমাকে সৃষ্টি করে চলেছো।

—মানে ?

—তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আমাকে সেইভাবে তৈরি হতে হচ্ছে। এমন কি আমার চেহারাটাও তোমার স্মৃতির খাতা থেকে ধার নেওয়া।

কথাগুলোর অর্থ বুঝতে গিয়ে বেশ খানিকটা সময় গেল নিপুলের। তারপর বললে,—ইমারতটা কার সৃষ্টি ?

—মানুষের। বহু বছর আগে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে বানিয়ে গেছিল মানুষ। বানিয়েছিল মিউজিয়াম হিসেবে—পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাস এর মধ্যে রেখে দেবে বলে। তৈরির পর জানা গেল, একটা প্রকাণ্ড রেডিও অ্যাকটিভ ধূমকেতুর ল্যাজের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে পৃথিবীকে।

—ধূমকেতু কী ?

—দেখিয়ে দিচ্ছি।

কথা শেষ হতেই পাল্টে গেল মাথার ওপরকার আকাশ। রূপোর

থালার মত চাঁদ এখন একফালি নখের মত ভাসছে বাড়ির ছাদের ওপর। পাল্টে গেল বাড়িগুলোর চেহারাও। এখন ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে—জানালায় জানালায় আলোর বিচ্ছুরণ দেখা যাচ্ছে। জোরালো সার্চলাইট লেহন করে যাচ্ছে একটা পর একটা বাড়ি। রাজপথের একদম শেষে আকাশের বুকে ঝুলছে চোখ ধাঁধানো একটা সাদা বাষ্পপিণ্ড। নিচের দিকে নীলচে-সবুজ রঙ ঠিকরে যাচ্ছে লম্বাটে ল্যাজ থেকে। এরকম জিনিস মরুভূমিতে থাকার সময় দেখেছে নিপুল। আকাশ থেকে যখন তারা খসে পড়ে—তখন এইরকম দেখায়। তবে পুরোপুরি এই রকম নয়। খসে পড়া তারা চক্ষের নিমেষে ধেয়ে যায়। এ জিনিসটা কিন্তু স্থিরভাবে ঝুলছে আকাশের গায়ে।

বৃদ্ধ বললে,—এরই নাম কণিষ্ক ধূমকেতু। এর মাথার ব্যাস বারো হাজার মাইল। কেন্দ্রীণকে মুড়ে রেখেছে যে খোলসটা—তার ব্যাস পঞ্চাশ হাজার মাইল। ল্যাজ সাত কোটি মাইল, কি তারও বেশি লম্বা।

দেখলে ভয় হয় ঠিকই—কিন্তু সেরকম ভয়ানক নয়। মাথাভর্তি শুধু ক্ষুদে বস্তুকণা। বালির দানার চাইতে বড় নয় একটাও। পৃথিবীতে সরাসরি আছড়ে পড়লেও পৃথিবীকে ধ্বংস করতে পারত না। তবে সৌরজগতের বাইরে থেকে এসেছিল কণিষ্ক ; অত্যন্ত শক্তিশালী রেডিও-অ্যাকটিভ ধূমকেতু। অর্থাৎ, জন্তু জানোয়ারকে খতম করে দেওয়ার মত পদার্থ ছিল এর মধ্যে। পৃথিবী ছেড়ে চম্পট দিতে হয়েছিল মানুষকে সেই কারণেই—হাতে পুরো একটা বছর সময়ও পায়নি। একশ কোটিরও বেশি মানুষ বিরাট বিরাট মহাকাশযানে চেপে চলে যায় নিরাপদ জায়গায়। যাওয়ার আগে তৈরি করে দিয়ে যায় এই ইমারত—সেইদিনের জন্যে, যেদিন মানুষ ফিরে আসবে পৃথিবীতে।

মাথা নেড়ে বললে নিপুল,—বুঝলাম না।

—বোঝানোর জন্যেই তৈরি হয়েছিল ইমারত—ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে।

—আমার নিরেট মাথায় কিস্সু ঢুকছে না।

—ভুল ধারণা। এই মিশিন যিনি বানিয়েছিলেন, তাঁর নাম বিস্পে। তোমার মেধা তাঁর মেধার সমান। কিন্তু বিস্পে মারা গেছেন অনেক আগে। তাই তাঁর ভাষ্য তুমি বুঝতে পারছ না।

—আপনি যে বললেন, আপনাম নাম বিস্পে ?

—ও নামে আমার অধিকার আছে। বিস্পের মস্তিষ্কের কিছুটা এখনো

রয়ে গেছে ওই মেশিনের মধ্যে।

কালো বাক্সটাকে দেখায় বৃদ্ধ,—আসলে আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে নেই। রয়েছি ওই কমপিউটারের মধ্যে। সত্যি সত্যিই তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ না- বলছ কমপিউটারের সঙ্গে।

—কম-কমপিউটার কি জিনিস ?

—সব প্রশ্নের জবাব পাবে। তবে অনেক সময় লাগবে। ততক্ষণ থাকার ইচ্ছে আছে ?

—আছে। কিন্তু--

—মা আর দাদার জন্যে ভাবনা হচ্ছে ?

গা শিরশির করে ওঠে নিপুলের। অলৌকিক ব্যাপার নাকি ? নিজের চিন্তা পর্যন্ত গোপন থাকছে না।

--কি করে বুঝলেন ?

বিম্পে মাস্টার জানে। যেদিন তুমি মরুভূমির উড়ুক্কু মেশিন চালু করেছিলে, সেইদিন থেকে বিম্পে মাস্টার— কালো কমপিউটারকে দেখায় বৃদ্ধ ঃ তোমার খবর রেখে চলেছে। আজ রাতেও তোমাকে ডেকে এনেছে।

—কেন ?

—সবই জানবে। তার আগে কি একটু ঘুমিয়ে নেবে ?

—না। চিন্তা হচ্ছে মা আর দাদার কথা ভেবে।

—কিচ্ছু ভেবো না। নিকাডো তাদের মাথায় তুলে রাখবে তুমি না ফিরে যাওয়া পর্যন্ত। তুমি যে পালিয়ে এসেছো, ভয়ের চোটে তা জানাবে না মৃত্যুরাজাকে। উল্টে বলবে ডাহা মিথ্যে কথা। বহাল তবিয়তে আছো তার আশ্রয়ে। নিকাডোর চামড়া তাতে বাঁচবে।

—আপনি তা জানলেন কি করে ?

—নিকাডোকে অনেক দিন ধরে লক্ষ্য করে যাচ্ছি বলে। সে ধূর্ত, কিন্তু দুর্বোধ্য নয়।

—মৃত্যুরাজার মনের খবর ধরতে পারেন ?

—খুব সহজে। একটাই বাসনা তার—যেভাবেই হোক পৃথিবীর সম্রাট হয়ে থাকতে হবে। এই মুহূর্তের মূল বাসনাটা অবশ্য তোমাকে জপিয়ে তার দলে ভেড়ানো। তোমার সাহায্য সে চায়।

—কেন চায় ?

—তোমার মত নিশ্চয় আরও অনেকে আছে। তোমাকে দিয়েই তাদের

খুঁজে বের করতে চায়। সে কাজ হয়ে গেলেই তাদের সবাইকে মারবে, তোমাকে মারবে, তোমার মা-ভাই-বোনেদেরও সাবাড় করবে।

—হারানো যাবে কি মৃত্যুরাজাকে ?

—না গেলেও, তোমাকে ভয় করতে শিখবে।

—কিভাবে তা হবে ?

—এত তাড়াতাড়ি তা জানতে চেও না। ধাপে ধাপে জানাবো। এস আমার সঙ্গে।

আবার থামটার মধ্যে হেঁটে ঢুকে গেল বৃদ্ধ। নিপুলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে গায়ে তার পোশাক ঠেকল বটে, কিন্তু ঠেকেছে বলে বুঝতে পারল না নিপুল।

উঠে দাঁড়িয়ে হেঁটে গিয়ে ফের থামের মধ্যে সেঁধিয়ে যায় নিপুল। আবার সেই সাদা কুয়াশা তাকে ঘিরে ধরে চারদিক থেকে। নিজের শরীরটাকে মনে হয় পাখির পালকের মত হাল্কা। শরীর তলিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

একটু পরে হেঁটে বেরিয়ে এল থামের মধ্যে থেকে। বিস্পের ম্যাজিক এবার চোখ ছানাবড়া করার উপক্রম করেছে। দৃষ্টিবিভ্রম এরকম হয় ? এ যে মাঠের মত বিশাল হলঘর। দেওয়ালে ঝুলছে নীল আর সোনালী রঙের ব্রোকেড—ফাঁকে ফাঁকে ছবি আর ছবি। কিছুদূর অন্তর পাথরের মূর্তি। কৃস্ট্যাল ঝাড়বাতি ঝুলছে মাথার ওপরে।

বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে সামনে,—খিদে পেয়েছে ?

—হ্যাঁ।

—এসো।

দুজনে এগিয়ে গেল জানলার সামনে। এখানে একটা মেশিন রয়েছে। নীল রঙের লম্বা বাক্স। সামনে টেবিল আর চেয়ার। একটা প্যানেলে ইকড়ি-মিকড়ি আঁচড় কাটা।

আঁচড়গুলোর দিকে দেখিয়ে নিপুল বললে,—কিসের দাগ ?

—হরফ। অক্ষর। তুমি পড়তে জানো না। চলো। আগে পড়তে শেখাই।

নিপুলকে নিয়ে বৃদ্ধ এল অন্য একটা জানলার সামনে। সেখানে একটা সবুজ মেশিনের সামনে লম্বা খাট পাতা রয়েছে। মেশিনের মাথা থেকে ছাতার মত একটা জিনিস উঠে এসে ঢেকে রেখেছে খাটটাকে। ঠিক যেন চাঁদোয়া।

নিপুলকে খাটে শুইয়ে দিল বৃদ্ধ। খুটখাট বোতাম টিপতেই সবুজ আর নীল দ্যুতি দেখা গেল ছাতার মধ্যে। বড় স্নিগ্ধ আলো। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবার পর ঘুমিয়ে পড়ল নিপুল।

ঘুম ভাঙার পর মনে হল, মাথা বেশ হাল্কা হয়ে গেছে। উদ্বেগ দুর্ভাবনার চাপ সরে গেছে।

বৃদ্ধ দাঁড়িয়েছিল সামনে। বললে,—উঠে এসো নিপুল।

নিপুল বললে,—এটা কি মেশিন ?

—শান্তি মেশিন। তোমাকে শুধু ঘুম পাড়ায়নি, জ্ঞান আর বিজ্ঞানকে ছাপ মেরে মেরে ঢুকিয়ে দিয়েছে ব্রেনের মধ্যে। এখন তুমি পড়তে পারবে—আমার সব কথা বুঝতে পারবে। এসো।

খাবার মেশিনের সামনে এসে দাঁড়াতেই ইকড়ি-মিকড়ি লেখাগুলোকে এবার বুঝতে পারে নিপুল। হরেক রকম খাবারের নাম।

তিনটে বোতাম টিপে দিল বৃদ্ধ। মেশিন থেকে বেরিয়ে এল তিনটে সুদৃশ্য বাটি। মাংস, ভাত আর চাটনি। ধোঁয়া উঠছে তখনও।

—খাও, নিপুল। খাবার তৈরির জন্যে শাকসব্জী মাছ মাংস দরকার হয় না এই মেশিনের। প্রাচীন মানুষদের অত সময় ছিল না। মৌলিক পদার্থদের মিশিয়ে খাবার তৈরির কায়দা রপ্ত করেছিল অনেক আগেই। কমপিউটার যা পারে, তার জন্যে মানুষের দরকার হয় না।

গোগ্রাসে গরম গরম ভাত মাংস খেতে খেতে বললে নিপুল,—কমপিউটার তো আপনাকেও তৈরি করেছে।

—পুরোপুরি মানুষের মত করতে পারেনি। তোমার কথা চিন্তার আকারে যখন মনের মধ্যে ভাসে, তখন তা ধরে ফেলি।

—কিভাবে ?

—তোমার ব্রেনের বাঁদিকে চিন্তার ঢেউ ওঠে। কমপিউটার সেই তরঙ্গ থেকে তোমার চিন্তার চেহারা বের করে নেয়। কিন্তু তোমার মেজাজ, আবেগ, অনুভূতি ধরতে পারে না। মানুষের সঙ্গে কমপিউটারের তফাৎ তখন ছিল। এখন নিশ্চয় নেই। এত বছরে আরও ভাল কমপিউটার নিশ্চয় তৈরি হয়ে গেছে।

চাটনির বাটি টেনে নেয় নিপুল,—আপনার শরীর তো নিরেট নয়, তাই না ?

—না।

—অথচ বোতাম টিপছেন, টুল সরাচ্ছেন। কিভাবে ?

—পরিবেশকে কব্জার মধ্যে রাখলেই তা করা যায়।

বলেই হাত নাড়ল বৃদ্ধ। অমনি চেয়ারগুলো শূন্যে ভেসে গিয়ে হেলেদুলে নেচে নেচে আবার ফিরে এল টেবিলের পাশে। তাজ্জব ব্যাপার দেখে দেখে চোখ সয়ে গেছে বলে নিপুল মোটেই অবাক হল না। খাওয়া শেষ করে বললে,—এবার ?

—পৃথিবীর আগেকার প্রভুদের কীর্তি দেখতে চাও ?

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল নিপুল,—হ্যাঁ।

তাহলে পৃথিবীটাকে আগে দেখো।- শান্তি মেশিনের সামনে এসে নিপুলকে শুয়ে পড়তে ইঙ্গিত করল বৃদ্ধ। সবুজ ধাতুর চাঁদোয়ার তলায় শুতে না শুতেই রিমঝিম করে উঠল মাথার ভেতরটা। আবেশের অনুভূতিতে আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে এল দু'চোখের পাতা। কিন্তু ঘুম এল না। আনন্দবোধ ছেয়ে রইল মগজকে। এত আনন্দ, এত শান্তি সে জীবনে পায়নি। চোখ বুঁজেও মনে হচ্ছে, ওপরের সবুজ চাঁদোয়ার ভেতর থেকে যেন একটা চোখ অস্বচ্ছ কাঁচ ফুঁড়ে চেয়ে আছে তার দিকে। অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় দৃশ্যর পর দৃশ্য ঢুকিয়ে দিচ্ছে মস্তিষ্কের মধ্যে। সেই সঙ্গে বুকের মধ্যে শোনা যাচ্ছে একটা কণ্ঠস্বর। মানুষের গলা নয়—মানুষের ভাষাও নয়। নিপুলের অন্তর্দৃষ্টিকে খুলে দিচ্ছে একটু একটু করে।

মাকড়সা শহরকে সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে যেভাবে প্রথম দেখেছিল—সেইভাবে দিগন্ত বিস্তৃত শহরের আকাশছোঁয়া বাড়িগুলোকে দেখে আর অবাক হচ্ছে না। এদের নাম স্কাইস্ক্র্যাপার—বহুতল অট্টালিকা। শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে বিরাট নদীটা। নিপুল যেন খাড়াইভাবে শূন্যে ভেসে উঠছে। শহরকে এখন দেখা যাচ্ছে পায়ের তলায়। সেকেন্ড কয়েক পরেই দেখতে পেল সমুদ্র আর পাথরের চাঁই দিয়ে তৈরি বন্দরটা। তারপর সমুদ্র আর বন্দর দুটোই ছোট্ট হতে হতে প্রকাণ্ড সবুজ প্রান্তরের মধ্যে একাকার হয়ে গেল। এখন দেখা যাচ্ছে, সমুদ্রের দুদিকের ডাঙা, আর পাহাড়ের মাঝে লাল মরুভূমি। ওইখানে কোথাও রয়েছে ছেলেবেলার গর্ত—যার মধ্যে রয়েছে বাবার মৃতদেহ। পুরো দৃশ্যটাই দেখতে দেখতে আরও ছোট হয়ে এল। মাকড়সা শহরের দক্ষিণ দিকেও একটা সমুদ্র চোখে পড়ল এবার। দ্রুত আরও ওপরে উঠছে নিপুল। পৃথিবী গোলকের বৃত্তাকার আভাস ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সবুজ প্রান্তর নীল সমুদ্রের সঙ্গে মিশে গিয়ে ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে উঠছে। একটু পরেই দেখল গোটা পৃথিবীর চেহারা—বলের মত আস্তে

আস্তে ঘুরছে মহাশূন্যে। অতিকায় আর উজ্জ্বলতর মনে হচ্ছে নক্ষত্রগুলোকে। ঠিক যেন কৃস্ট্যাল বরফ দিয়ে তৈরি—আলো ঠিকরে আসছে ভেতর থেকে। ডান দিকে জ্বলন্ত একটা গোলক—সূর্য। সেদিকে তাকানো যাচ্ছে না। চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। চাঁদকে এতদিন একটা চ্যাপ্টা থালা মনে হয়েছিল—এবার দেখা যাচ্ছে তার রূপোর গোলকের মত বিশাল বপু।

এর পরই মহাকাশে এসে পৌঁছোলো নিপুল। সূর্যকে এখন মনে হচ্ছে চক্ষু গোলকের মত ছোট। দেখে যাচ্ছে একটার পর একটা গ্রহকে। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো। প্লুটোর কাছ থেকে পৃথিবীকে মনে হচ্ছে আলপিনের ডগার মত ছোট্ট। অথচ সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রলোক এখনও অনেক দূরে।

মা, বাবা ঠাকুর্দার মুখে গল্প শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেত নিপুল। নিবিষ্ট হয়ে থাকত কল্পলোকের ধ্যানে। কিন্তু এই মুহূর্তের তন্ময়তা অন্য জিনিস। আবিষ্ট নিপুলের মনের মধ্যে ভিড় করছে অজস্র প্রশ্ন। রাশি রাশি জ্ঞান আহরণের পিপাসা অকস্মাৎ জাগ্রত হয়েছে মস্তিষ্কের মধ্যে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সব জানতে চায় এখুনি।

বুকের মধ্যে ধ্বনিত হল বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর,—বিস্পে মাস্টার সমস্ত জ্ঞান ধরে রেখেছে নিজের মধ্যে। তোমার প্রথম প্রশ্নটা বলো।

—দেখতে চাই মাকড়সাদের রাজত্বের আগের পৃথিবীর চেহারা !

—পঁচিশ কোটি বছর পেছিয়ে যেতে হবে। দ্যাখো।

দেখল নিপুল। লোমহর্ষক দৃশ্য। চোখ ধাঁধানো বিস্ফোরণের পর সৃষ্টি হল সৌরজগৎ। পৃথিবীতে অজস্র পরিবর্তনের পর এল মানুষ। দেওয়াল ঘেরা বাড়ি তৈরি করতে শিখল আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে। শিখল চাষবাসের কায়দা।

এবার বুঝলে তো, মাকড়সারা মানুষদের দশ হাজার বছর পেছনে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে রেখেছে।

□ *বারো* □

চোখ খুলল নিপুল। বৃদ্ধ নেই ধারে কাছে। রোদ্দুর ঢুকছে জানালা দিয়ে। একনাগাড়ে আট ঘন্টা শুয়ে থেকেছে শান্তি মেশিনে। বিকেলের সূর্য তার প্রমাণ। এত নিবিড় শান্তি কখনও উপলব্ধি করেনি নিপুল।

খিদে পেয়েছিল। নিজেই গেল খাবার মেশিনের সামনে। খাওয়া শেষ করার ইচ্ছা হল স্নান করার। মাথার মধ্যে ফের ধ্বনিত হল বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর। বললে, কোথায় আছে স্নানঘর। কোন বোতাম টিপলে ঝর্ণাজল বেরোবে।

স্নান শেষ করে ফের এসে শুয়ে পড়ল শান্তি মেশিনের চাঁদোয়ার তলায়। চোখ বুজল।

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল বিশাল সরোবরের ধারে। দূরে দেখা যাচ্ছে পর্বতশ্রেণী। আধ মাইল দূরে একটা শহর—পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কাদামাটি আর পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছে পাঁচিল আর বাড়িগুলো।

জায়গাটা খুব চেনা-চেনা ঠেকছে। পরক্ষণেই চিনতে পারল। এই সেই অঞ্চল যেখানে মারণ-মাকড়সাকে বধ করেছিল নিপুল।

কণ্ঠস্বর বললে মাথার ভেতরে,—বলো তো শহরটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কেন ?

—বন্য জন্তুদের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে।

—না। মানুষের আক্রমণ ঠেকানোর জন্যে। অন্যের জিনিস লুঠ করতে শিখেছিল মানুষ সভ্য হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। এই প্রবৃত্তিটাই বেড়ে গেছে হাজার হাজার বছর ধরে। মানুষ লড়ে গেছে কামান বন্দুক এমন কি

অ্যাটম বোমা ফাটিয়েও। পৃথিবীর ইতিহাস দেখো নিজের চোখে।

চোখ বুজল নিপুল। দেখল পৃথিবীজোড়া বহু সভ্যতার উত্থান আর পতনের দৃশ্য। দেখল অ্যাটম বোমা ফাটিয়ে পৃথিবী কাঁপানোর দৃশ্য। চোখ খুলল সভয়ে।

কণ্ঠস্বর বললে তৎক্ষণাৎ,—একাদশ শতাব্দীর শুরুতে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়ে গেল ভয়ানকভাবে। মানুষ তখন পিঁপড়ের মতই পিলপিল করছে পথেঘাটে। এই সময়ে অদ্ভুত একটা অস্ত্র আবিষ্কার করল যুদ্ধ পাগল বৈজ্ঞানিকরা। তার নাম কোতল। এক ধরনের মেসিনগান। অ্যাটমিক এনার্জি ঠিকরে গিয়ে চোখের পাতা ফেলবার আগেই মোটা গুঁড়ি কেটে দুটুকরো করতে পারে, রাস্তার দু'ধারের সমস্ত বাড়ি গুঁড়িয়ে দিতে পারে। কোতল আবিষ্কাকারের পর থেকেই যুদ্ধ মোড় নিল অন্যদিকে। টেররিস্টরা এই হাতিয়ার হাতে নিয়ে দেশে দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে গেল। তাদের রোখা গেল না কিছুতেই।

একাদশ শতাব্দীর মাঝখানে দুজন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করলেন এই শান্তি মেশিন। সমস্ত উদ্বেগ তাড়ানোর মেশিন। টেনশনের জন্যেই মানুষ ধ্বংস করে যাচ্ছিল নির্বিচারে। শান্তি মেশিন তাদের রেহাই দিলে এই সর্বনাসা টেনশন থেকে। মারামারি কাটাকাটি কমে এল। একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে জনসংখ্যা বেশ কমে গেল, ঊনবিংশ শতাব্দীর জনসংখ্যার চাইতেও কম হয়ে গেল।

মানুষ কিন্তু তখনও সুখে থাকার উপায় খুঁজে পায়নি। এই সুখের সন্ধানেই হানাহানিতে ভরা পৃথিবী ছেড়ে রওনা হল প্রক্সিমা সেন্টরীর গ্রহজগতের দিকে। গোটা মহাকাশযানটাই তৈরি হল আস্ত একটা গ্রহ-র অনুকরণে। গাছ, পাহাড়, নদী সবই রইল সেখানে। লেজার চালিত এই মহাকাশযান দশ বছর পরে, ২১৩০ খ্রীষ্টাব্দে পৌঁছোলো সেখানে। নতুন উপনিবেশ রচনা করে তার নাম দিলে নতুন পৃথিবী। কিন্তু বাড়ির জন্যে মন কেমন করছিল বলে ফিরে এল দশ বছর পরে।

ফিরে এসে দেখলে, মানুষ আবার হানাহানিতে মেতেছে। দশ লক্ষ বছর সময় নিয়েছে মানুষ গুহাবাসী অবস্থা থেকে শহরবাসী অবস্থায় পৌঁছোতে—কিন্তু মাত্র কয়েক হাজার বছর অথবা তিনশ প্রজন্মের মধ্যে শিখে নিয়েছে মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার কৌশল। অঢেল আরাম পেয়ে আবার কুঁড়ের বাদশা বনে যাচ্ছে। অন্যের সর্বনাশ করে নিজে সুখে থাকতে চাইছে।

ঠিক এই সময়ে কণিষ্ক ধূমকেতুকে দেখা গেল আকাশে। পাঁচ বছর পরে সংঘাত লাগবেই—এই তথ্য জানবার পর থেকেই শুরু হল পৃথিবী ত্যাগের আয়োজন। ২১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর প্রায় সব মানুষই চলে গেল নতুন পৃথিবীতে। তার দেড়মাস পরে ধূমকেতুর ল্যাজ ঘষটে দিয়ে গেল পৃথিবীকে। মারা গেল দশ ভাগের ন'ভাগ জীবজন্তু।

তার কয়েক সপ্তাহ পরে শেষ মহাকাশযান ছেড়ে গেল পৃথিবী। রেখে গেল এই ইমারত এবং এই রকমই আরো ঊনপঞ্চাশটা ইমারত পৃথিবীর নানান জায়গায়। এদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য, পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাস নিজের মধ্যে ধরে রেখে দেওয়া। মিউজিয়াম অথবা টাইম-ক্যাপসুলের যা কাজ। আরও একটা কাজ আছে এদের। পৃথিবী ত্যাগের পর কি-কি ঘটছে পৃথিবীতে—তার খবরাখবর নেওয়া।

নিপুল শুধোয়,—ইমারত থেকে না বেরিয়ে খবর নেওয়া কি যায়?

যায়। মানুষের মন থেকে সেই খবর নিতে হয়। একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে চিন্তা-পঠন মেশিন আবিষ্কৃত হয়েছিল।

—আমার মনের কথা জানতে পারছেন এই কারণেই ?

—মনকে পুরোপুরি জানা যায় না। মনের ওপর যে চিন্তাগুলো ভেসে ওঠে, সেই সঙ্কেতগুলোকে ভেঙে নিতে হয়। ঠিক রেডিও তরঙ্গের সঙ্কেত ভাঙা হয় যেভাবে। শক্তিশালী চিন্তা-পঠন মেশিন তোমার বহু পুরোনো স্মৃতি উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু তোমার আবেগ অনুভূতি ইচ্ছাশক্তির নাগাল পায় না। মানুষ যখন ঘুমোয়, তখন তার ব্রেন থেকেই বেশির ভাগ তথ্য জোগাড় করে নিই।

—কেন ?

—যাতে নতুন পৃথিবীর মানুষ জানতে পারে, কি-কি ঘটে চলেছে এই পৃথিবীতে।

—ওদের সঙ্গে কথা বলেন ?

—এখানকার সব খবর বিস্পে মাস্টার পাঠিয়ে দেয় সেখানে।

—আমার খবর তারা জেনে গেছে ?

—নিশ্চয়।

—তাহলে নিশ্চয় ফিরে এসে শায়েস্তা করবে এদের ?

—না। কেন আসবে ?

—মানুষদের বাঁচানোর জন্যে।

—কিন্তু দশ বছর সময় লাগবে আসতে। পাঁচ বছর পরে তোমার ইচ্ছে

জানবে, তারপর দশ বছর ধরে যাত্রা করবে। এত ঝামেলায় যাবে কেন ? শায়েস্তা নিজেরাই করতে পারো।

—পারি কী ?

—যদি না পারো, তাহলে টিকে থাকার যোগ্য নও। পৃথিবীটা শক্তিমানদের জন্যে।

—এই ইমারতে ঢুকে প্রথমেই জানতে চেয়েছিলাম, কিভাবে হারাতে পারি মাকড়সাদের। আপনি বলেছিলেন, সেপথ আপনি জানেন। বলবেন আমাকে ?

—বলার অনুমতি নেই।

—কেন নেই।

—প্রশ্নের জবাবটা যদি নিজে থেকেই দিতে পারো—তাহলে পাবে আমার সাহায্য।

—হেঁয়ালি করছেন ?

—তোমার যোগ্যতা যাচাই করছি।

—সময় লাগবে।

—বেশি সময় নিলে ইমারত ছেড়ে বেরোতে পারবে না। মারণ-মাকড়সারা যখন জানবে, তুমি উধাও হয়েছো—পালে পালে ঘিরে ফেলবে ইমারত।

—ওরা জানে না আমি কোথায় আছি।

—জানে। দুটো নেকড়ে মাকড়সা তোমাকে দেখেছে এদিকে আসতে।

—মা আর দাদা এখন কি করছে ?

—দেখতে চাও ?

—হ্যাঁ।

—চোখ বন্ধ করো।

চোখ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে নিপুল দেখলে, সে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিকাডোর বড় হলঘরে। একগাদা কুশনের ওপর কাঠ হয়ে বসে রয়েছে তার মা আর নিকাডো। পাশে নিজয়। শক্ত শরীরের একজন কৃষ্ণবসনা সুন্দরী দাঁড়িয়ে আছে নিকাডোর সামনে।

নিকাডো বলছে,—নিশ্চয় শহরে কোথাও লুকিয়ে আছে। মাকড়সারা যদি খুঁজে বের করে—জ্যান্ত থাকবে না। তার আগেই খুঁজতে হবে আমাদের।

নিজয় বললে,—কেন পালালো, সেটা বুঝতে পারলেই—

পালানোটাই আহাম্মকি হয়েছে।—রাগতভাবে বললে নিকাডো।

বাচ্ছাদের মহলে যেতে চায় বলেই পালিয়েছে।—কথা শেষ করে নিজয়।

অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে সিস। নিপুলকে সে দেখতে পেয়েছে। নিকাডোর চোখও এখন নিপুলের দিকে। সে চোখে বিষম বিস্ময়।

পরক্ষণেই গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে উল্লাসধ্বনি,—কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

কথা বলতে গেল নিপুল, কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোলো না। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য মিলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। চোখ মেলে নিজেকে দেখলে সাদা ইমারতের মধ্যে।

—এ কী হলো !

বৃদ্ধ বললে,—কথা বলতে গিয়েই তো সব মাটি করে দিলে।

—মাথা ব্যাথা করছে কেন ?

—মুখ দিয়ে শব্দ বের করতে গিয়ে শক্তির অপচয় করেছো, তাই।

—নিকাডো আর মা কিন্তু আমাকে দেখেছে।

—মনের চোখ দিয়ে দেখেছে। তোমার সূক্ষ্ম শরীরকে দেখেছে।

—সূক্ষ্ম শরীর মানে ?

—যার আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, সে রক্তমাংসের এই শরীর থেকেই আর একটা অদৃশ্য শরীরকে টেনে বের করতে পারে। এই সূক্ষ্ম শরীরেই মহাকাশে ঘুরে এলে এখুনি।

—আমার সেই শক্তি আছে ?

আছে। এসো।—বৃদ্ধ এগিয়ে গেল শান্তি মেশিনের পাশ দিয়ে। যেতে যেতে বললে ঃ নিকাডো ধরে নিয়েছে, তোমার ভেতরে অলৌকিক শক্তি আছে। তোমাকে তাই যেভাবেই হোক খুঁজে বের করবে।

—কেন ?

—তোমার শক্তিকে কাজে লাগাবে নিজের স্বার্থে।

ওরা এখন এসে দাঁড়িয়েছে সাদা থামের সামনে। পরপর দুজন ঢুকে গেল ভেতরে। ভেসে উঠল ওপরে। বেরিয়ে এল ইমারতের একদম ওপর তলার ঘরে। সৌধনগরীকে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। পশ্চিমে হেলে পড়েছে সূর্য।

কালো চামড়ার মোড়া সোফাটা দেখিয়ে বৃদ্ধ বললে,—শুয়ে পড়ো।

সোফার পাশে একটা কালো কাঁচের টেবিল। ওপরে একটা অদ্ভুত

টুপি। ধাতু দিয়ে তৈরি। টুপি থেকে একটা তার বেরিয়ে ঢুকে গেছে বিস্পে মাস্টার কমপিউটারের মধ্যে।

টুপিটা মাথায় পরো।—বললে বৃদ্ধ।

বাইরে ধাতু, কিন্তু ভেতরে নরম গদি—মাথায় গলাতেই কপাল আর রগ ঢেকে গেল। বৃদ্ধ টিপে দিল একটা বোতাম।

নিপুলের সারা শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ ছোট ছোট ঢেউ তুলে দিয়ে গেল তক্ষুনি। বড় আরামের অনুভূতি। চোখ বন্ধ হয়ে এল আপনা থেকেই।

এবার আর মানসিক দৃশ্য দেখতে হল না—তার বদলে খুলে গেল অন্তর্দৃষ্টি। বেলুন চেপে উড়ে যাওয়ার মত হাল্কা অনুভূতি মুহুর্মুহু জাগছে সারা শরীরে। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ মোলায়েম চিরিক মেরে যাচ্ছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত। ঘনীভূত হচ্ছে আনন্দ। সাদা আলোয় শরীর যেন ছেয়ে যাচ্ছে। স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত। সাদা প্রভা বেরিয়ে আসছে শরীরের ভেতর থেকে। আলোর তেজ যত বাড়ছে, ততই বাড়ছে নিপুলের সুখানুভূতি। তারপর মনে হল যেন নিজেই একটা সূর্য হয়ে গেছে। প্রখর দীপ্তির দিকে তাকানো যাচ্ছে না।

আর তারপরেই এল বিচিত্র সেই অভিজ্ঞতার অনুভূতি। মাত্র পাঁচ সেকেন্ডের জন্যে।

সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে টের পেল নিপুল—এই সূর্য, এই প্রখর দীপ্তি, এই অপূর্ব অনুভূতি জাগছে তার নিজেরই ভেতরের কোনো এক গুপ্ত কেন্দ্র থেকে। অবিশ্বাস্য শক্তি জমে রয়েছে সেখানে। ভাষা দিয়ে সেই বিপুল নগ্ন শক্তির বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। নিপুল নিজেই এই কল্পনাতীত শক্তির অধিকারী। শক্তির সামান্য প্রসাদেই তার তৃতীয় নয়ন খুলে গেছে। তুচ্ছ মনে হচ্ছে শক্তিমত্ত মাকড়সাদের।

আলো মিলিয়ে গেল এর পরেই। একটু একটু করে এল পরম শক্তির প্রচণ্ড ক্ষমতাবোধ। আস্তে আস্তে সরে গেল বৈদ্যুতিক প্রবাহ। সারা ঘর এখন নিশ্চুপ। আশ্চর্য প্রশান্তি নিপুলের নিজের ভেতরেও।

নিপুল এবার বুঝেছে মূল ঘটনা হল শক্তি। মানুষের মধ্যে রয়েছে এই শক্তি। কিন্তু মানুষ তা জানে না। এ শক্তি আপনি আসে না, তাকে ডেকে আনতে হয়। ডাকার কায়দা মানুষ ভুলে গেছে। কমপিউটার এক ঝলক শক্তির পরশ দিয়ে সচেতন করে দিয়ে গেল সেই কারণেই। বুঝিয়ে দিলে, মানুষ শুধু গায়ের শক্তি আর মগজের শক্তিকে কাজে লাগিয়েছে। ইচ্ছাশক্তিকে সেভাবে কাজে লাগাতে ভুলে গেছে।

মাকড়সারা ইচ্ছাশক্তিকে দৈহিক শক্তির মত কাজে লাগিয়েছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। দৈত্যাকার হওয়ার পর সেই ইচ্ছাশক্তি প্রবলতর হয়েছে। কিন্তু এই শক্তির উৎস কোথায়—মগজ খাটিয়ে তা কোনোদিন জানতে চায়নি। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে নিজেদের ভেতরে গুপ্ত সীমাহীন শক্তির সন্ধান করেনি।

আর শুধু এই ব্যাপারেই মানুষ টেক্কা দিয়েছে মাকড়সাদের আর শুধু এই কারণেই, মৃত্যুরাজা ভয় পায় মানুষকে।

মেশিন যে শক্তির স্বাদ পাইয়ে গেল মাত্র পাঁচ সেকেণ্ডের জন্যে, নিজের ইচ্ছায় কি তাকে ডেকে আনতে পারবে না নিপুল ?

চেষ্টা করল তৎক্ষণাৎ। ভুরু কুঁচকে মন সংযত করল দুই ভুরুর মাঝখানে। অমনি জলপ্রপাতের মত অকল্পনীয় শক্তি ভাসিয়ে দিয়ে গেল তার মনের দু'কূল।

চকিতে সামলে নিল নিপুল।

বললে শান্ত গলায়,—মাকড়সা শহরের প্ল্যান পাওয়া যাবে ?

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে গেল ঘর। অস্বচ্ছ হয়ে উঠল দেওয়ালগুলো। নিপুলের সামনের দেওয়ালে লাগল আলোর ছোঁয়া—ফুটে উঠল একটা প্রকাণ্ড ম্যাপ। যেন আকাশ থেকে তোলা একটা ফটোগ্রাফ।

মাকড়সা শহর যে গোল বৃত্তের মধ্যে তৈরি হয়েছে, এখন তা বোঝা যাচ্ছে। গোটা বৃত্তটাকে চারভাগ করা হয়েছে নদী আর রাজপথ দিয়ে। উত্তর-দক্ষিণে রাজপথ, পুব-পশ্চিমে নদী। মেয়ে-মহল রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমে। উঁচু পাঁচিল তুলে দেওয়া হয়েছে দক্ষিণের শহরের দিকে। নদীর উত্তরে আধখানা চাঁদের মত অংশটা গোলাম-মহল—সবচেয়ে বড় অংশ। নদীর দক্ষিণের শহরে যেমন চৌকোনা চত্বর আছে মাঝখানে, উত্তরেও রয়েছে একটা চৌকোনা চত্বর। মাঝে একটা বিশাল গম্বুজওলা বাড়ি।

বাড়িটা কিসের ?—নিপুলের প্রশ্ন।

—শাসক মহল—এককালে এইখান থেকেই শহরে শাসন চালিয়েছে মানুষ। এখন এখানে তৈরি হয় মাকড়সাদের সিল্ক।

—বেলুন তৈরির জন্যে ?

—বেলুন এবং অন্যান্য জিনিস তৈরির জন্যে।

—এখানেই কি বেলুন তৈরি হয় ?

—না। সিল্ক চালান যায় পাঁচ মাইল উত্তরে গোলন্দাজ গুবরেদের শহরে।

—এখানে তৈরি হয় না কেন ?

—মাকড়সাদের গোলামরা কাজকর্মে ততটা দক্ষ নয় বলে। বেলুন তৈরি করতে গেলে উঁচু দরের কারিগরি জ্ঞান থাকা চাই। গোলন্দাজ গুবরেদের চাকর-বাকরদের সেই বুদ্ধি আর দক্ষতা আছে।

—মানুষের বুদ্ধিকে যদি এতই ভয় মাকড়সাদের, তাহলে গুবরেদের অধীনে বুদ্ধিমান মানুষ রাখতে দিয়েছে কেন ?

—নিরুপায় বলে। মাকড়সা-বিষে কিচ্ছু হয় না গুবরেদের। ক্ষেপে গেলে তারা ভয়ঙ্কর।

—মেধাওলা মানুষ নিয়ে কি করে গুবরেরা ?

—মানুষের কীর্তিকলাপ নতুন করে দেখতে চায় গুবরেরা। মাকড়সাদের মতন নয় এরা। মানুষের সৃষ্টি করার ক্ষমতা আর ধ্বংস করার ক্ষমতা—দুটো ক্ষমতাই ওদের প্রাণে পুলক জাগায়। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আত্মরক্ষা করে এসেছে গুবরেরা। বিস্ফোরণ তাই ওদের কাছে বড় সুন্দর জিনিস। এদের চাকরবাকরদের মূল কাজ শুধু বিস্ফোরণ সৃষ্টি করা। তা করতে গেলে উঁচু মেধার প্রয়োজন হয়।

—তাতে নিশ্চয় অসুখী এই মাকড়সারা ?

—আগে তাই ছিল। পরে একটা সন্ধি হয়। এখন মেধাবী মানুষ চালান যায় মাকড়সাদের শহর থেকে গুবরেদের শহরে। বিনিময়ে আসে বেলুন আর বোকা মানুষ।

ম্যাপের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল নিপুল,—ঘাপটি মেরে থাকার পক্ষে সবচেয়ে ভালো জায়গা কোথায় ?

—গোলাম-মহলে। গোলামরা তোমাকে দেখলেও কোনো প্রশ্ন করবে না। কৌতূহল জিনিসটা ওদের মধ্যে লোপ পেয়েছে।

—কিন্তু মাকড়সা তো সেখানেও আছে।

—আছে বইকি। তবে তাদের কাছে সব মানুষই সমান। একটু হুঁশিয়ার হলেই ওদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারবে।

আচমকা আতঙ্ক আছড়ে পড়ে নিপুলের অন্তরে। এতক্ষণ এই নিরাপদ জায়গায় ছিল বড় শান্তিতে—আবার শুরু হবে পদে পদে প্রাণ নিয়ে টানাটানির খেলা।

বৃদ্ধ বললে,—যাওয়ার আগে শহরের প্ল্যান মুখস্ত করে নাও।

ক্লান্ত স্বরে বললে নিপুল,—তাতে সময় লাগবে।

--না, লাগবে না। কমপিউটারের পাসের ড্রয়ারটা টেনে দেখো।

ধাতুর ক্যাবিনেটের ড্রয়ার ধরে টান দিল নিপুল। ভেতরে লাগানো আয়নায় দেখতে পেল নিজের মুখের চেহারা। মনের দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে দু-চোখে।

আয়নার ওপরে একটা ছোট্ট চাকতি ঝুলছে সোনার আংটা থেকে। ধাতুর চেন লাগানো চাকতি। ব্যাস এক ইঞ্চির বেশি নয়।

বৃদ্ধ বললে,—গলায় ঝুলিয়ে নাও। এরই নাম চিন্তা-দর্পন।

চাকতিটার মাঝখানটা দাবানো। রঙ বাদামী-সোনালী। হীরের মত চারপাশে খাঁজকাটা। আয়নার মত চকচকে মসৃণ নয়। নিজের মুখ যেন অনেক কুয়াশার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে।

গলায় চাকতি ঝুলিয়ে নিল নিপুল। বৃদ্ধ বললে,—ওভাবে নয়, উল্টে নাও।

দাবানো দিকটা বুকের দিকে ঘুরিয়ে দিতেই ধক্ করে উঠল বুকের ভেতরটা—অদ্ভুত অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। আয়নায় তাকিয়ে দেখলে, মুখ থেকে মুছে গেছে অনিশ্চয়তার ছাপ।

বৃদ্ধ বললে,—এই পৃথিবীতে অ্যাজটেক নামে একটা প্রাচীন সভ্যতা ছিল। তারা চিন্তা-দর্পণকে নিখুঁতভাবে গড়ে তুলেছিল। মানুষ-বলি দেওয়ার আগে ধ্যানস্থ হওয়ার জন্যে পুরুতরা গলায় ঝোলাত এই দর্পণ। বিংশ শতাব্দীতে অতি প্রাকৃত গবেষণার ফলে নতুন করে আবিষ্কৃত হয়েছে এর গুপ্ত ক্ষমতা। ব্রেন, হার্ট আর মেরুদণ্ডের স্নায়ুগুচ্ছের সঙ্গে মানসিক অনুকম্পনের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে এই দর্পণ। ম্যাপটা মুখস্ত করার চেষ্টা করলেই বুঝবে।

ম্যাপের দিকে তাকায় নিপুল। এবার আর অসুবিধে হয় না। পাঁচ মিনিট আগে প্রকাণ্ড এই ম্যাপকে অতিশয় জটিল মনে হয়েছিল। এখন সেই জটিলতার প্রত্যেকটা ঘোরপ্যাঁচকে বুভুক্ষুর মতই মাথার মধ্যে টেনে নিচ্ছে ওর সত্ত্বা। এক মিনিটও গেল না--ম্যাপ গেঁথে গেল মগজে। বললে,—কেল্লা মানে ?

—শহরের সৈন্যরা থাকত আগে।

—অস্ত্রাগার মানে অস্ত্র রাখার জায়গা ?

—হ্যাঁ।

আঙুল তুলে ম্যাপের একটা জায়গা দেখায় নিপুল,—ব্রীজে পাহারা

আছে ?

—আছে। গত সপ্তাহে একজন সর্দারণী হাঁটু জল ভেঙে নিজের বাচ্চাকে দেখতে যাচ্ছিল—মন কেমন করছিল বলে। সেই থেকে ব্রীজের এ-মুখে আর ও-মুখে দুজন নেকড়ে-মাকড়সা পাহারায় বসেছে।

—মেয়েটি সাজা পেয়েছে নিশ্চয় ?

—গোটা শহরের লোক ডেকে এনে সবার সামনে তাকে একটু একটু করে খাওয়া হয়েছে।

—অন্য কোনো জায়গা দিয়ে নদী পেরোনো যাবে ?

—ব্রীজই সবচেয়ে ভালো জায়গা। নদী ওখানে অগভীর, হেঁটে যাওয়া যায়।

—কোন সময়ে নদী পেরোবো ?

—ভোরে। সেই সময়ে পাহারাদার বদল হয়।

আবার ম্যাপটা খুঁটিয়ে দেখে নেয় নিপুল। আধ মাইল অন্তর সিঁড়ি নেমে গেছে পাড় থেকে নদীর জলে।

প্রশ্ন করে,—গোলাম-মহলে গিয়ে ঠাঁই নেবো কোথায় ?

—বহু বাড়ি ভেঙে পড়েছে— ওপরতলাগুলো নেই। মাকড়সারা সেখানে জাল পাতে না। এই রকম একটা বাড়িতেই নিরাপদ থাকবে।

হঠাৎ চোখ টনটন করে ওঠে নিপুলের। কপাল আর রগ ঘষতেই ব্যথা মিলিয়ে যায়।

বৃদ্ধ বললে,—চিন্তা-দর্পণের জন্যে মাথাব্যথা করছে। অভ্যস্ত নও, মনকে চিন্তা-দর্পণের দিকে একমুখী না করতে শিখলে মাথাব্যথা করবে। যখনই এরকম হবে, দর্পণ উল্টে রাখবে বুকের ওপর।

দাবানো দিকটা ওপরদিকে করে দিল নিপুল। ব্যথা মিলিয়ে গেল। তবে নিজেকে বড় অবসন্ন মনে হল। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুখে জমা হয়েছে। তন্দ্রা আসছে।

বৃদ্ধ বললে,— ঘুমোনোর সময় এখন নয়। মৃত্যুরাজা এইমাত্র খবর পাঠিয়েছে নিকাডোর কাছে, তোমাকে যেন এখুনি রাজার সামনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নিকাডো নিজে গিয়ে বলবে—তোমাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে শহরের প্রত্যেকটা মাকড়সা বেরিয়ে পড়বে তোমার খোঁজে।

—নিকাডোর পরিণাম কি ঘটবে ?

—কিচ্ছু না। মৃত্যুরাজার বাস্তববুদ্ধি আছে। কিন্তু তোমাকে রওনা হতে হবে এখুনি।

অবসাদ কেটে গেছে নিপুলের শরীর আর মন থেকে। বিপদের সামনে এলে চিরকালই এমনি হয়েছে।

—যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে কিভাবে ?

—টেনে লম্বা করা যায় যে চোঙাটা—ওর মাধ্যমে। বিম্পে মাস্টার চিন্তার ছকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৈরি হয়েছে এই চোঙা। তবে হরদম ব্যবহার করতে যেও না। নেহাৎ দরকার না হলে চোঙায় হাত দেবে না। এর মধ্যে যে এনার্জি আছে—বেশ কিছু মাকড়সার অনুভূতিতে তা ধরা পড়ে যাবে। ধরা পড়বে তুমিও। এবার যাও। যাবার আগে কিছু খেয়ে নাও। সারা রাতের ধকল সইতে হবে।

—খিদে নেই।

—তাহলে সঙ্গে খাবার নিয়ে যাও। গোলামরা যে ধরনের জামাকাপড় পরে, তুমিও পরবে সেই জামাকাপড়। চলে এসো, আর সময় নষ্ট করা যাবে না।

পরপর দুজনে ঢুকে গেল সাদা থামের মধ্যে। হু-হু করে নেমে গেল নিচের দিকে।

নিচের তলায় এখনও রয়েছে সেই কাঠের টুল—যেগুলোকে পাথর বলে মনে করেছিল নিপুল। টুলের ওপর রয়েছে ওর ধাতুর চোঙা আর ধূসর রঙের মোটা কাপড়ের গোলাম-পরিচ্ছদ। গায়ে দিতেই ঘামের দুর্গন্ধে গা পাক দিয়ে ওঠে নিপুলের। দু-পাশে দুটো বড় পকেট। একটা পকেটে একটা ছোট্ট কাঠের বাক্স--আর একটা পকেটে একটা কালো নল—লম্বায় ছ-ইঞ্চি, ব্যাস এক ইঞ্চি। বাক্সের মধ্যে তুলো চাপা রয়েছে অনেকগুলো বড়ি—খুব ছোট্ট, হলুদ রঙের।

বৃদ্ধ বললে,—এই তোমার খাবার বড়ি। মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার সময় দরকার হয়।

—আর এটা ? কালো নলটা দেখায় নিপুল।

—খুব হাল্কা পোশাক, মহাকাশযাত্রীদের জন্যে তৈরি হয়েছিল। নলের শেষে চাপ দাও।

বুড়ো আঙুল দিয়ে নলের একটা দিক টিপে ধরতেই সড়াৎ করে লম্বা হয়ে গেল। তার পরেই ফটাৎ করে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা

অদ্ভুত জামা-প্যান্ট। সাইজে নিপুলের ডবল।

—এতবড় জামা-প্যান্ট নিয়ে কি করব ?

—কাজে লাগবে। নলের যেখানে আগে টিপেছিলে—আবার টিপ দাও সেখানে।

নিঃশব্দে অদ্ভুত পোশাকটা ঢুকে গেল নলের মধ্যে। নলটা নিজেও ছোট হয়ে গেল তক্ষুনি।

—এবার যাও, আর দেরি করলে সব মাটি হয়ে যাবে।

অদৃশ্য হয়ে গেল বৃদ্ধ। ধাতুর চোঙা তুলে নিল নিপুল।

মুঠোর মধ্যে আবার জেগেছে চিরিক মারা অনুভূতি। হাত লম্বা করে চোঙার ডগা ঠেকালো দেওয়ালে।

জোর কমে গেল হাঁটুর, ঘুরে গেল মাথা। টলতে টলতে এক পা এগিয়ে পেরিয়ে এল যেন অবর্ণনীয় একটা ঘূর্ণিপাক। গা-বমি ভাবটা রইল মুহূর্তের জন্যে। তারপর পরিষ্কার হয়ে গেল মাথা।

সাদা ইমারতের বাইরে ঘাসজমিতে দাঁড়িয়ে আছে নিপুল।

মুখে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগতেই সুস্থির হয় নিপুল। মেঘ সরে যেতেই চাঁদ বেরিয়ে এল। বৃষ্টি হয়েছিল দেখা যাচ্ছে—ভিজে ঘাস চক্‌চক্ করছে। দূরের পাথর বাঁধাই রাস্তা চলে গেছে উত্তরে ব্রীজের দিকে। নিপুল এগোলো মেয়ে মহল লক্ষ্য করে। হাতে ধাতুর চোঙা।

হাওয়ার দাপটে হেঁট হয়ে ঘাস জমি পেরিয়ে লম্বা বাড়ির আড়ালে এসে দাঁড়ল নিপুল। চাঁদ আবার ঢেকে গেছে কালো মেঘে। এদিকে লোকজন থাকে না। দক্ষিণ অঞ্চল আর গোলাম-মহলের এই তল্লাট ইচ্ছে করেই ফাঁকা রাখা হয়েছে।

মেঘ সরে যেতেই ফের ঝিলমিল করে উঠেছে সাদা ইমারত। চোখ জুড়িয়ে যায় সাদা প্রভার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে।

ইমারতের তলায় মেঘ জমেছে কেন ? নড়েচড়ে সরে সরে যাচ্ছে তালতাল কালো মেঘ। খরচোখে তাকালেই গা শিরশির করে ওঠে নিপুলের। মেঘ নয়—কালো মাকড়সা। দলে দলে জড়ো হয়েছে ইমারত ঘিরে।

আবার চাঁদ ঢেকে গেল। মেঘ এইদিকে এগিয়ে আসছে মনে হল।

দৌড়োবে নিপুল ? না, কক্ষনো না। লুকিয়ে পড়লো ভাঙাবাড়ির মধ্যে? মোটেই না। মাকড়সাদের ধৈর্য অসীম– তন্নতন্ন করে খুঁজবে প্রত্যেকটা বাড়ি।

তাই মেয়ে মহলের দিকেই পা চালাল নিপুল। বেজায় অন্ধকারে কিস্‌সু দেখা যাচ্ছে না। ম্যাপটা চোখেব সামনে ভাসছে বলেই আন্দাজে রাস্তার পর রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা মোড় পেরোনোর সময়ে উত্তরে ঘুরে যাচ্ছে—যাতে নদীর দিকে যাওয়া যায়। অন্ধের মত হেঁটে গেলেও পায়ের তলায় রাস্তার দুরবস্থা বুঝতে পারছে। ভাঙাচোরা ইঁটপাথর। আচমকা হোঁচট খেল একটা। হাত থেকে ঠিকরে গেল ধাতুর চোঙা।

চিন্তা-দর্পণ ফের উল্টে দিতেই শিথিল হল মস্তিষ্ক। কিন্তু বেশ খানিকটা এনার্জির অপচয় ঘটে গেল এইটুকু সময়ের মধ্যে।

আবার চাঁদ দেখা দিয়েছে। রাস্তা চওড়া হয়ে গেছে সামনের দিকে। ম্যাপ অনুসারে, উত্তরে আর দুখানা বাড়ি পেরোলেই নদী। চওড়া রাস্তার ওপরে বিশাল মাকড়সার জাল হাওয়ার ঝাপটায় উঠছে আর নামছে। এত হাওয়ায় মাকড়সারা জালের ওপর থাকবে না—হাওয়া যেখানে নেই, এমনি কোনো ঘরে সেঁধিয়ে থাকবে। তাছাড়া, এত কনকনে ঠান্ডায় আট পেয়েরা জালে বিচরণ করবে না কক্ষনো। কাজেই নির্ভয়ে চওড়া রাস্তায় পা বাড়াল নিপুল।

আকাশের অন্ধকার গাঢ় হয়েছে, চাঁদের মুখ মেঘের আড়ালে পড়তেই। আর মিনিট দশেক হাঁটলেই নদীর ধারে পৌঁছোনো যাবে। কিন্তু এত অন্ধকারে যাওয়া ঠিক হবে না। নদীর পাড়ে মাকড়সা পাহারাদার আছে। কোথায় টহল দিচ্ছে, অন্ধকারে দেখা যাবে না।

ছুটন্ত মেঘের আড়াল থেকে ঝলক-দর্শন দিয়েই আবার মুখ লুকোল চাঁদ। ওই আলোতেই দেখে নিয়েছে নিপুল—রাস্তা একদম ফাঁকা।

অন্ধকার আবার চেপে বসতেই এগিয়ে গেল হাতের চোঙা সামনে বাড়িয়ে—ঠিক যেন অন্ধের লাঠি। নদীর ধারে পৌঁছে ব্রীজে উঠল না—পাড় বরাবর চার ফুট উঁচু পাঁচিলে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে এগোলো পাশের দিকে। পাঁচিলের গায়ে এক জায়গায় ফাঁক রয়েছে বুঝে দাঁড়িয়ে গেল সেখানে। আবার চাঁদ দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। নিপুলও দেখে নিল সিঁড়িটা। দুপাশে থাম আর রেলিং—সিঁড়ি সোজা নেমে গেছে জলের ধারে। কয়েক ধাপ নামতেই আবার চাঁদ বেরিয়ে এল মেঘের আড়াল থেকে। থামের আড়ালে লুকিয়ে নিপুল দেখলে, ব্রীজের ওদিকে চৌকোনা ঘর রয়েছে। পাহারাদারের ঘর নিশ্চয়। ঘরের দেওয়ালে ছোট্ট জানলা। জানলার ওদিকে ঘরের মধ্যে কি যেন সরে গেল। মাকড়সা পাহারাদার ! একই সঙ্গে চোখ রেখেছে নদীর দিকে আর চওড়া রাস্তার দিকে। ভাগ্যিস অন্ধকারে এসেছে নিপুল—নইলে ঠিক ধরা পড়ে যেত।

কনকনে ঠান্ডা আর সওয়া যাচ্ছে না। খিদেও পেয়েছে। বাক্সটা বের করে, দুটো হলদে বড়ি মুখে দিতেই মনে হল যেন ভুরিভোজ হয়ে গেল এক্ষুনি। ছ ইঞ্চি লম্বা নলটার এক দিক টিপতেই বেরিয়ে এল হাল্কা পোশাকটা। অন্ধকারে পরে নিল নিপুল। হাতে ঠেকল একটা চেন—টান মারতেই ঢেকে গেল গলা পর্যন্ত। বেশ গরম লাগছে এখন। চোখেমুখে ঠাণ্ডা লাগলেও গা গরম রয়েছে বিলক্ষণ।

থামে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল নিপুল।

ঘুম ভাঙল ভোররাতে। সবে ঊষার আলো দেখা দিয়েছে পুবদিকে। হাল্কা পোশাক গা থেকে খুলে নলে চাপ দিতেই ঢুকে গেল নলের মধ্যে। তাজ্জব কাণ্ড বটে। নিরেট নল ছাড়া এখন আর তো কিছুই নয়।

পাহারাদার বদল হওয়ার সময় হয়েছে। বিম্পে মাস্টার বলেছে, গোলাম-মহল্লে ঢোকবার সময় পাওয়া যাবে তখনি। কিন্তু কিভাবে ? চৌকোনা ঘরের পাহারাদারদের নজর এড়ানো তো সম্ভব নয়।

□ *তেরো* □

ঠিক এই সময়ে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটে গেল। চৌকোনা খুপরি ঘর থেকে বেরিয়ে এল একটা নেকড়ে-মাকড়সা। আমীরীচালে ওপাড়ের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল জলের ধারে কাদার ওপর। একটি মাত্র লাফ মেরে নদী টপকে এসে পড়ল এ পাড়ের ছফুট চওড়া কাদার ওপর। নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল নিপুলের দিকে।

কাঠ হয়ে গেল নিপুল। নেকড়ে-মাকড়সা নিশ্চয় তাকে লক্ষ্য করেছে। থামের আড়ালে ঘুমোলেও চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনি। সারারাত তাকে নজরে রাখবার পর দিনের আলোয় লাফ মেরে নদী পেরিয়ে এল নিপুলের দফারফা করবার জন্যে। এখন উপায় ?

মরিয়া হয়ে হাতের চোঙা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল নিপুল।

নেকড়ে-মাকড়সা ততক্ষণে এসে গেছে থামের পাশে। চওড়া থামের এদিকে ঘুরে গেল নিপুল। সঙ্গে সঙ্গে মাকড়সার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি চাবুকের মত সপাং করে আছড়ে পড়ল ওর চোখেমুখে। মাথার মধ্যে গোলমাল হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। গড়িয়ে গেল ঢালু পাড় বেয়ে কাদাজমির দিকে।

গড়ানে গতি রুদ্ধ হতেই বিষদাঁতের কামড়ের জন্যে তৈরি হয়েছিল নিপুল। আটপেয়ে ভয়ঙ্কর এক লাফেই এসে পড়বে ঘাড়ে, তারপর ?

কিন্তু কোথায় নেকড়ে মাকড়সা ? ধারে কাছে তার চিহ্ন নেই। নিপুল একা পড়ে রয়েছে কাদাজমিতে।

হতভম্ব হয়ে যায় নিপুল। মাথা তখনও অশান্ত বলেই মন সংযত

করার জন্যে ঘাড় হেঁট করে তাকিয়েছিল কাদাজমির দিকে। রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

একলাফে নদী পেরিয়ে এসেছিল নেকড়ে-মাকড়সা। পড়েছিল কাদাজমির যেখানে, সেখানে রয়েছে মোটে সাতটা আঁকশি-থাবার ছাপ—আটটা নয় ! এদিক চারেট ওদিকে তিনটে।

মনে পড়ে যায়, ঝড়ের পর নৌকোর পাটাতনের দৃশ্য। ধুঁকছে নেকড়ে-মাকড়সা। একটা ভাঙা ঠ্যাং থেকে রক্ত ঝরছে।

কৃতজ্ঞ সেই আটপেয়ে দানবই পাহারায় ছিল কাল রাতে। নিপুলকে দেখে রেহাই দিল।

এ সুযোগ ছাড়া যায় না। পাহারাদারের ঘরে এখন কেউ নেই। ধড়মড় করে উঠে পড়ে নিপুল। ধাতুর চোঙা মুঠো থেকে ফস্কে গিয়ে পড়েছিল একটু দূরে। কুড়িয়ে নিয়ে, পায়ের জুতো খুলে দুটোই পকেটে রাখল নিপুল। তারপর হাঁটু জল ভেঙে পেরিয়ে এল নদী। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল পাড়ে।

তখন সূর্য উঁকি দিয়েছে পুব দিগন্তে।

নদীর ধারেই একটা বড় বাড়ি। দেওয়াল ফেটে গেছে, দরজা-জানলা খসে পড়েছে, ওপরতলাগুলো ভেঙে পড়েছে। এইখানেই প্রথম মোটর গাড়ির চেহারা দেখল নিপুল। মরচে-ধরা খোলসগুলো শুধু পড়ে রয়েছে। কিছু গাড়ির মাথায় হেলিকপ্টার লাগানো—ঠিক যেন ডানাওলা পতঙ্গ।

বেশির ভাগ বাড়িই এইরকম। দরজা-জানলা আস্ত রাখা হয়নি যেন ইচ্ছে করেই।

নদীর পাড় থেকে যে রাস্তাটা সটান চলে গেছে শহরের ভেতর দিকে, তার ওপরে নিবিড়ভাবে ঝুলছে মাকড়সার জাল। চাঁদোয়ার মত নিশ্ছিদ্র বললেই চলে। উঁকি মেরে একবার দেখেই সেদিকে আর পা দিল না নিপুল।

ঢুকল একটা ভাঙা অট্টালিকার ভেতরে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতেই দেখল একটা সরু রাস্তা। রাস্তার ওপরে জাল মেরামত করছে একটা মারণ-মাকড়সা।

ভেতরে সরে এল নিপুল। মনের আতঙ্কবোধকে তালাচাবি দিয়ে রেখে চেয়ে রইল সেদিকে।

সরু রাস্তায় লোকজন বাড়ছে। একটা বাচ্ছা মেয়ে পাঁউরুটি খেতে

খেতে বেরিয়ে এল পাশের বাড়ি থেকে। অমনি একটা হোৎকা ছেলে কোত্থেকে দৌড়ে এসে ছোঁ মেরে কেড়ে নিল তার পাঁউরুটি। কেড়ে নিয়েই গায়ের জোরে ছুঁড়ে দিলে মাকড়সাটার দিকে। জালে আটকে গেল পাঁউরুটি। তার পরেই যা ঘটে গেল, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারত না নিপুল।

বিদ্যুৎবেগে সুতো ধরে নেমে এল মাকড়সা, হোৎকা ছেলেটাকে ধাক্কা মেরে গড়িয়ে দিল রাস্তায়। পরক্ষণেই সুতো ধরে সাঁ-সাঁ করে উঠে গেল জালের ওপর। ছেলেটা হো-হো করে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়েই কেড়ে নিল আর একটা বাচ্চা মেয়ের হাতের পাউরুটি।

মারণ-মাকড়সা খেলা করছে বাচ্চাদের সঙ্গে !

বাচ্চাগুলোর মুখের গড়ন কিন্তু নিতান্ত নির্বোধের মতন। কপাল ছোট, গালের হনু উঁচু, চোখ গোল-গোল। চর্বি আর মাংস থলথল করছে সর্বাঙ্গে। খুবই নিম্ন স্তরের মানুষ।

এদের বাবা আর মায়েদের চেহারাও সেইরকম। যেমনি নোংরা তেমনি উজবুক আকৃতি। চোখে মুখে পাশবিক ছাপ -বুদ্ধির রোশনাই নেই কোথাও।

ভাঙা জানলার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে একতলার একটা ঘরে ভীষণ মোটা একটা মেয়ে বিশাল কড়া থেকে হাতায় করে খাবার তুলে দিচ্ছে। বাটি বাড়িয়ে খাবার নিয়ে কোঁৎ কোঁৎ করে গিলছে মেয়েপুরুষরা। তারপরে রাস্তায় নেমেই হনহনিয়ে যাচ্ছে একদিকে—নিশ্চয় কাজের হুকুম নিতে।

ভিজে জামাকাপড়ে বিচ্ছিরি লাগছিল নিপুলের। কাঁহাতক আর ঘাপটি মেরে থাকা যায়। নেমে পড়ল রাস্তায়। মনের ভয়কে একেবারে চেপে রেখে দিয়েছে। সচকিত হল না জালের মাকড়সা। একমনে তখনও সে জাল মেরামত করে চলেছে। কাল রাতের ঝড়ে বেশ কয়েকটা জায়গা ছিঁড়ে গিয়ে ঝুলছে।

নির্বিঘ্নে খাবার ঘরে ঢুকে গেল নিপুল। বাটির গাদা থেকে একটা বাটি তুলে নিয়ে বাড়িয়ে দিল সামনে। এক হাতা মাংসের ঝোল নিয়ে চেখে দেখল, মন্দ নয়। মাকড়সারা চায় মানুষরা ভালভাবে খেয়েদেয়ে গায়ে গতরে মোটা হোক। এক টুকরো পাঁউরুটি নিয়ে আহার শেষ করল নিপুল।

দলে দলে পুরুষ চলেছে যেদিকে, তাদের সঙ্গে গেলেই তো হল ! মন

ঠিক করে নিয়ে নেমে এল রাস্তায়। গোলামদের এখন অবিকল গোলাম বলেই মনে হচ্ছে। নিজের মনটাকে কৌটোয় পুরে রেখে দিয়েছে, যাতে মনের শক্তি মাথার ওপরকার জালে বসা মাকড়সারা টের না পায়।

এসে গেছে একটা প্রকাণ্ড চত্বর। গোলাম গিজগিজ করছে সেখানে। আর সেকি চিৎকাব ! গুঁতোগুঁতি মাবপিটিও চলছে অবাধে। এদের মধ্যে উঁচু মঞ্চে দাঁড়িয়ে একজন বিশালদেহী পুরুষ রক্তবর্ণ চোখে তাকাচ্ছে এদিকে সেদিকে। হঠাৎ তার চোখ আটকে গেল নিপুলের ওপর। কটমট কবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হুঙ্কাব ছুড়ল আকাশ কাঁপানো গলায়,—নতুন এলি মনে হচ্ছে ? আগে তো দেখিনি !

সামনে এগিয়ে এল নিপুল। তার এক হাত জামাব তলায় বুকের চিন্তা-দর্পণে। আয়নাব দিকটা বুকে ঠেকিয়ে মনকে সংযত করে চলেছে। বললে, -হ্যাঁ, নতুন।

—চেহারাটা দেখেই বুঝেছি। প্যাঁকাটি কোথাকার। কি দোষ করেছিলি?

—বেশি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—বেশ হয়েছে। যা চেহারা তোর, মাঠে পাঠানোও তো যাবে না, পাথর ভাঙতে যাবি ?

বলেই ঠোঁট কামড়ে ভাবতে লাগল বিশালদেহী পুরুষ। সঙ্গে সঙ্গে নিপুল ঠিক করে নিলে, কি করতে হবে। মাঠের কাজ অথবা পাথর ভাঙার কাজ নিলে সর্বনাশ। ওকে যেতে হবে গোলন্দাজ গুবরেদেব কাছে।

চিন্তা-দর্পণের আয়নার দিকটা ঘুরিয়ে দিলে অতিকায় লোকটার দিকে। আয়না যখন নিজেব বুকে ঠেকে থাকে, তখন তার নিজেব ভাবনাচিন্তা সূচাগ্র হয়ে ওঠে—আয়নার দিক লোকটার দিকে ঘুরিয়ে দেখতে চায় সূচাগ্র চিন্তা তার মগজকে এফোঁড় ওফোঁড় করে কিনা।

ফলটা হল অদ্ভুত রকমের। আচমকা চোখ ঘোলাটে হয়ে গেল বিশালদেহী পুরুষের। চিন্তা যেন গুলিয়ে গেছে। যা ভাবছিল, তা আর ভারতে পারছে না।

তীক্ষ্ণ চোখে তা দেখল নিপুল। হুকুম দিল মনে মনে। ওর সেই হুকুমই বেরিয়ে এল বিশালদেহী হেঁড়ে গলা দিয়ে,—

যা, যা, গোলন্দাজ গুবরেদের নর্দমা সাফ করে দিয়ে আয়। এদের নিয়ে যা সঙ্গে।

পাঁচ মিনিট পরে সেইদিকেই রওনা হল নিপুল। পেছন পেছন এল কুড়ি জন নিকৃষ্ট আকৃতির গোলাম।

দূরে সবুজ পাহাড়গুলোর দিকে হাঁটছে নিপুল। ফুরফুরে হাওয়ায় একটু করে শুকিয়ে যাচ্ছে গায়ের ভিজে জামাকাপড়। দু'পাশের আকাশছোঁয়া ইমারতগুলোর মাঝে এখনও ঝুলছে মাকড়সার জাল—ঝুলছে মাথার ওপরেও। এইসব জাল থেকে সন্ধানী চোখ নিরন্তর কৌতূহলী পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে তার সারা গায়ে। নিপুল তা টের পাচ্ছে বলেই নিজের মনকে খাঁচায় পুরে রেখেছে।

উঁচু বাড়ির সংখ্যা কমে এল একটু পরেই। নিচু নিচু বাড়িগুলোও অনেক দূরে দূরে খাড়া রয়েছে। ফলে, মাঝখানের বিরাট ফাঁকে জাল পাততে পারেনি মাকড়সাবা। নিশ্চিন্ত হল নিপুল। আলগা করে দিলে মন-কে।

যেতে যেতে মনের শক্তি পরীক্ষা করে নিলে বেশ কয়েকবার। কুড়িটা গোলামের মগজের ভেতর ঢুকিয়ে দিলে নিজের সূচাগ্র চিন্তাশক্তিকে। হুকুম দিয়ে গেল মনে মনে। ওরাও কাজ করে গেল সেইভাবে। মুখে কিছু বলতে হল না। কাউকে বললে—আস্তে হাঁটো। সে চলল শ্লথ গতিতে। কাউকে বললে—দৌড়োও। আচমকা সে দৌড়োতে শুরু করে দিলে।

খুশি হল নিপুল। চিন্তা-দর্পণের সাহায্যে মন-কে এখন সে আরও মুঠোয় এনে ফেলেছে। কখনো মন গুটিয়ে যাচ্ছে স্প্রিং-এর মতন। দর্পণ উল্টে দিলেই স্প্রিং যেন খুলে যাচ্ছে। মন তখন তেড়ে যাচ্ছে লক্ষ্যবস্তুর দিকে। মন দিয়ে এখন পরিস্থিতি পালটে দেওয়ার কৌশল শিখে ফেলেছে নিপুল।

এই একই ক্ষমতা রয়েছে মাকড়সাদেরও। হাত দিয়ে পৃথিবী গড়বার অভ্যাসের দাস হয়ে গেছে মানুষ—মাকড়সা পৃথিবী পালটাচ্ছে মন দিয়ে। এরা এখন মনের দাস। সুবিধেটা সেখানেই।

লক্ষ লক্ষ বছরের অভ্যাসের ফলে মানুষ মনকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। আর এখন বেশ কিছু মানুষ তাদের মন-ও হারিয়ে ফেলেছে। গভীর সমুদ্রের মাছের চোখ চলে যায় যেভাবে—ঠিক সেইভাবে।

হঠাৎ শেষ হয়ে গেল বাড়ির সারি। উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে নিপুল দেখলে, সামনের বিস্তীর্ণ ক্ষেতজমিতে চাষবাস করছে মানুষ-গোলামরা।

তদারকি করছে মেয়ে সর্দারণীরা।

গটগট করে এদের মধ্যে দিয়েই হেঁটে গেল নিপুল। কেউ ভ্রুক্ষেপও করল না। নিজের গোলাম বাহিনী এলোমেলোভাবে হাঁটছে দেখে মনে মনে হুকুম দিয়ে তাদের লাইনবন্দী করে নিল।

মাইলখানেক হাঁটবার পর দেখা গেল অদ্ভুত গড়নের চুড়োওলা লাল বাড়িগুলো। সবুজ পাহাড়ের তলায় থিকথিক করছে লাল চুড়ো। প্রত্যেকটা মাথা বেঁকানো। আরো কাছে যেতে দেখা গেল, মোমের মত চকচকে বস্তু দিয়ে তৈরি হয়েছে প্রত্যেকটা চুড়ো। প্রতিটাই বেজায় উঁচু এবং প্রত্যেকটা চুড়োকে যেন দানবিক হাতে মুচড়ে পাকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবুজ ঘাসজমি ঘিরে রয়েছে কিম্ভুত বাড়িগুলোকে। আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে গুবরেরা। একটা বাড়ির সামনের পুকুরে রুপোলি-সবজে পেট চিতিয়ে উল্টো হয়ে ভাসছে একটা বাচ্চা গুবরে।

এর পরের বাড়িগুলো নিচু-নিচু। ঠিক যেন নীল কাঁচ দিয়ে তৈরি। মানুষ মহল নিঃসন্দেহে। খোকা খুকুরা খেলা করছে। মেয়েরা কাপড় শুকোতে দিচ্ছে। পুরুষরা হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা বাড়ি ঘিরে রয়েছে ফুলের বাগান, আর সবুজ ঘাসের পটি।

হলুদ পোশাক পরা একজন পুরুষ এগিয়ে এল। তেড়ে উঠল নিপুলের ওপর, -এত দেরি কেন ?

এই এদের জন্যে।— পেছনের গোলামদের দেখিয়ে বললে নিপুল।

ঊনিশজন এনেছো কেন ?—চট করে গুণে নিয়ে বললে হলুদ পোশাক পরা লোকটা।

ঊনিশজন !—ঘুরে দাঁড়ায় নিপুল ঃ কুড়িজন বেরিয়েছে আমার সঙ্গে।

একজন গেছে মাকড়সাদের পেটে।—তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে লোকটা ঃ তুমিও যেতে, নতুন এসেছো তো ! চলো চলো।

একটু পরেই একটা চৌকোনা চত্বরে এসে গেল ছোট্ট দলটা। মাঝের নীল গম্বুজওলা বিশাল বাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে অনেকগুলো তেড়াবেঁকা চুড়োওলা লাল বাড়ি। গুবরেরা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে যাতায়াত করছে। মাঠে দাঁড়িয়ে বিস্তর মানুষ। চওড়া সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে হাঁকডাক করছে নাক-থ্যাবড়া কালো কুচকুচে একটা লোক। এক নজরেই চিনেছে নিপুল। আমুদে হরিশ।

হরিশও তাকে দেখেছে। কিন্তু না চেনার ভান করে পাশের লোকটার দিকে তাকিয়ে বললে কড়া গলায়,—বড্ড দেরি করলে। নিয়ে যাও

নর্দমায়। একে রেখে যাও। অন্য কাজ দেব।

বলে, আটকে দিল নিপুলকে। নিজে কিন্তু তরতর করে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। বড়বড় থামের পাশ দিয়ে গিয়ে পৌঁছোলো একটা ঘরের সামনে। দরজা ঠেলে ঢুকে গেল ভেতরে। ফিরেও দেখল না নিপুল পেছনে আসছে কিনা।

নিপুল কিন্তু তার সঙ্গ ছাড়েনি। ঘরের মধ্যে ঢুকেও গেল। সবুজ কাঁচের দেওয়ালে একটাও জানলা নেই। কিন্তু সবুজাভ আলোয় আশ্চর্য প্রশান্তি বিরাজ করছে।

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে কটমট করে কিছুক্ষণ নিপুলের দিকে চেয়ে রইল হরিশ। তারপর বললে কর্কশ গলায়, -মরবার সাধ হয়েছে দেখছি।

নিরীহ গলায় বললে নিপুল,--মোটেই না।

--কোথায় আছো এখন ?

—গোলাম-মহলে।

—রাতে থাকবে কোথায় ?

—গোলাম-মহলে।

—ফিরতে পারলে তো ! সকাল থেকেই খোঁজ-খোঁজ আরম্ভ হয়েছে। এখানেও এসেছিল।

—তারপর ?

—বলে দিয়েছি, পাওয়া গেলেই পাকড়াও করে ফিরিয়ে দেব।

—তাই কি করবে ?

গলার স্বর নরম হয়ে এল হরিশের,—পিপুল !

—আমার নাম নিপুল।

—মাকড়সা ব্যাটাচ্ছেলেদের সঙ্গে গুবরেদের একটাই বোঝাপড়া হয়ে আছে—কেউ কারও ব্যাপারে নাক গলাবে না। তা না করলেই যুদ্ধ লাগবে। তা আমরা চাই না। তোমার সঙ্গে কথা বলাও এখন বিপদ।

দাঁড়িয়েই ছিল নিপুল। এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে,—তাহলে চলি।

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল হরিশ,—কোন চুলোয় ?

—লুকিয়ে থাকি কোথাও, সুযোগ পেলেই পালাবো।

—কোনো দরকার নেই। এখানে ওরা আসবে না। আমার সঙ্গে থাকো, স্বাভাবিকভাবে ঘোরাফেরা করো। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আমাকে—বলে দেব, চিনি না।

—তাই ভাল।

চোখের মণি দুটোকে ছোট করে অনেকক্ষণ নিপুলের দিকে চেয়ে রইল হরিশ। তারপর বললে,—টের পেয়েছে তাহলে।

—হ্যাঁ।

—হুঁশিয়ার করেছিলাম এই কারণেই। ধরতে যদি পারে, ছিঁড়ে খাবে।

—জানি।

—নিজের দেশে ফিরে যাও। নৌকোয় চাপিয়ে চুপিসারে পৌঁছে দেব।

—যাবো না। মা আর দাদাকে ফেলে কোথাও যাবো না।

– তুমি মরলে তারা কি বাঁচবে ?

- আমি মরছি না এত সহজে।

– কি করতে চাও ?

-গোলাম-মহলে লুকিয়ে থাকব।

—সেখানেও খুঁজে বের করবে।

—তবুও চেষ্টা চালিয়ে যাব।

কিসের চেষ্টা।

- মাকড়সাদের খতম করার চেষ্টা।

অনুকম্পার হাসি হেসে হরিশ বললে,—কিভাবে ?

—মাকড়সাদের গায়ের জোর আমাদের গায়ের জোরের চেয়ে খুব বেশি নয়। কিন্তু ইচ্ছাশক্তির জোর ওদের বেশি। আমরা লড়ব আমাদের মেধাশক্তি দিয়ে।

—এই কারণেই ওরা তোমাকে নিকেশ করতে চায়।

নিপুল জামার তলায় হাত গলিয়ে চিন্তা-দর্পণের আয়নার দিক ঘুরিয়ে দিলে হরিশের দিকে। নিজের চিন্তার শক্তি দিয়ে হরিশের চিন্তার মোড় ঘোরাতে গেলে এছাড়া আর উপায় নেই।

মুখে বললে,—বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দাও মাকড়সা শহর।

—তা পারি। কিন্তু অত বারুদ নেই। থাকলেও ও-কাজ করব না।

—কেন ?

—আমরা তো গুবরেদের চাকর। গুবরেরা অনুমতি দেবে না।

—মানুষ হয়ে এদের চাকর হয়ে থাকব কেন ? মানুষই তো পৃথিবীকে পায়ের তলায় রেখেছিল একসময়ে।

হাসল হরিশ,—আর এই মানুষই নিজের সর্বনাশ করেছে। এসো নিজের চোখে দেখে যাও।

হরিশ ওকে নিয়ে গেল একটা প্রকাণ্ড গম্বুজ ঘরে। ময়দানের মত প্রকাণ্ড ঘরে গিজগিজ করছে অতিকায় গুবরে পোকারা। গোলঘরের দেওয়াল বেশ মসৃণ। কিন্তু সব্বাই তাকিয়ে চারদিকের দেওয়ালের দিকে।

হরিশ ঘরে ঢুকে হাঁক দিতেই ঘরের আলো নিবে গেল। একই সঙ্গে চারপাশের সাদা দেওয়ালে যেন মিলিয়ে গেল। সে জায়গায় দেখা গেল যুদ্ধক্ষেত্র। বড়বড় বাড়ির ওপর ডিমের সাইজে বোমা পড়ছে এরোপ্লেন থেকে। তাসের বাড়ির মত ধ্বসে পড়ছে বাড়িগুলো। কান ফাটানো আওয়াজে ময়দানের মত ঘরটা থরথর করে কাঁপছে। কামান থেকে গোলা ছুটে যাচ্ছে। ট্যাঙ্ক গড়গড়িয়ে চলেছে। একটার পর একটা বিধ্বংসী দৃশ্য আসছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। চারদিকের দেওয়ালে গোটা পৃথিবীটার অতীত ধ্বংসাত্মক কাণ্ডকারখানা আসছে আর যাচ্ছে। সবশেষে দেখা গেল পরের নর অ্যাটম বোমা ফাটার দৃশ্য। ব্যাঙের ছাতার মত ধোঁযার কুণ্ডলী, মেঘের রাশি, শ্মশান হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী।

জ্বলে উঠল ঘরের আলো। চারদিকের সাদা দেওয়ালি আবার ফিরে এসেছে। ঠিক যেন ম্যাজিক।

উত্তেজিত এবং উল্লসিত গুবরেদের মাঝখান থেকে নিপুলকে হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে এল হরিশ। বললে,—এখন বুঝেছো, মানুষকে পৃথিবীর অধীশ্বর বানাতে চায় না কেন এরা ?

ভয়ানক দৃশ্যপরম্পরা দেকে নিপুল তখনও ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছে। এরকম দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড তো কল্পনাতেও আনা যায় না।

ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললে,—এই দৃশ্য এরা কেন দেখে?

—দেখে বড় খুশি হয়—তাই। এর আগে চোদ্দবার দেখেছে। এদের জন্যেই এতসব বানিয়েছি। আমিই এদের বিস্ফোরক পণ্ডিত।

চাঁদের আলোয় বাইরের কুয়াশা যখন রূপোলি হয়ে উঠেছে, তখন ছোট্ট দলটা রওনা হল মাকড়সা-শহরের দিকে।

মাকড়সা-গোলামদের বুঝিয়ে দিয়েছে নিপুল, আজ রাতটা এখানেই থাকা হবে। ওরা তাই খানাপিনায় ব্যস্ত। নিপুলের সঙ্গে চলেছে এখন হরিশ আর তার আঠারোজন অনুচর। প্রত্যেকেই অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় মেতে উঠেছে। গুবরেদের চাকর যারা, তারা মাকড়সাদের একেবারেই ডরায় না। তাই রাতের অভিযানে ওদের এত দুঃসাহস। প্রত্যেকেই মাকড়সা-গোলামদের নোংরা পোশাক পরেছে।

চাঁদের আলোয় মাঠঘাট স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে চলে গেলেও, হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসছে পরের মুহূর্তে। ফুটফুটে আলোয় চারদিক দেখতে দেখতে মাকড়সা-শহরে ঢুকে পড়ল দলটা।

আর তখন থেকেই গা ছমছম করতে লাগল নিপুলের। মাথার ওপর ঘন বুনট জালের সংখ্যা যত বাড়ছে, ততই বাড়ছে গা ছমছমানি। অনেক চোখ যেন দেখছে অনেক দিক থেকে—চোখের মালিকদের শুধু দেখা যাচ্ছে না।

শহরের ম্যাপ মুখস্ত করে নিয়েছিল বলেই নিপুলের হাঁটিতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। মোড়ের মাথায় এসে ঠিক ঘুরে যাচ্ছে সঠিক দিকে—এগিয়ে যাচ্ছে সঠিক পথে। চলতে চলতে কখনও চাঁদের আলো মিলেয়ে যাচ্ছে—তখন ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। দুপাশের বাড়িগুলোর ভাঙা জানলা দরজা দিয়ে কেবল দেখা যাচ্ছে তেলের পিদিমের মিটমিটে আলো ! রাস্তায় লোকজন নেই একদম। সন্ধ্যার পর সাবধান—এই নিয়মটা গোলামদের মগজে বেশ ভালভাবেই গেঁথে গেছে।

একটা সরু রাস্তায় ঢুকতে না ঢুকতেই হঠাৎ চাঁদ চলে গেল মেঘের আড়ালে। নিঃসীম অন্ধকারে পাশের লোককেও দেখা যাচ্ছে না তখন। ঠিক তখনি অস্ফুট চিৎকার শোনা গেল পেছনে,—এ আবার কী !

খুট করে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে বললে হরিশ,—কি হল ?

পিতয় যার নাম, ভ্যাবাচাকা মুখে সে বলে উঠল,—মিশু কোথায় গেল ? আমার পাশেই তো ছিল।

নিপুল তক্ষুনি বুঝে নিল, কি ঘটে গেল এক্ষুনি।

বললে,—হরিশ, আলো নেভাও।

নিভে গেল আলো। নিপুল বললে কানে কানে,—চেঁচিয়ে বলে দাও, মিশু এখানে আছে। কেউ যেন না চেঁচায়।

অন্ধকারেই চাপা গলায় হরিশ তাই বলে দিলে দলের প্রত্যেককে। তারপর নিপুলের কানে বললে,—কি ব্যাপার বলো তো ?

—মাকড়সার পেটে গেছে। ওপরের জাল থেকে লাফিয়ে পড়েই বিষদাঁত ফুটিয়েছে। তার আগে ইচ্ছাশক্তি দিয়ে অসাড় করে দিয়েছে বলে চেঁচাতেও পারেনি। ঠিক এইরকমভাবে একজন গোলামকে খেয়েছে সকালে যখন যাচ্ছিলাম গুবরে শহরে।

—মিথ্যে বলতে বললে কেন ? মিশু তো নেই।

—না বললে ওরা ভয় পাবে। ভয়ের বিচ্ছুরণ মাকড়সাদের টনক নড়াবে—ও কী !

আবার চাঁদ উঠেছে। রাস্তার পাশের ঝাঁকালো গাছটার ডালপাতা নড়ছে। অথচ হাওয়া বইছে না।

যার গায়ের ধাক্কায় ডালপাতা নড়ে উঠেছিল, আচমকা সে এসে গেল সামনে। একটা ভীষণাকৃতি কালো মাকড়সা। খপ করে সামনের লোকটাকে ধরে ঘাড়ে বিষদাঁত ফুটিয়ে দিয়েই ন্যাতা মতন দেহটাকে অক্লেশে তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল একটা ভাঙা দরজার দিকে।

চোখের সামনে এই নারকীয় দৃশ্য দেখে নিপুলও নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না। একটা ভাঙা পাথর তুলে নিয়ে ধাঁই করে মারল মাকড়সার বিপুল বপুতে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল আটপেয়ে দানব। মানুষের এত সাহস সে কখনো দেখেনি। তাই মুখের খাবার ফেলে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল নিপুলের দিকে। অসীম শক্তিমানের মতই তার অগ্রগতিতে নেই বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা। ধীর স্থির প্রত্যয়কঠিন আটখানা চরণ ফেলে ফেলে সে এগোচ্ছে নিপুলের দিকে।

সেই সঙ্গে তরল বরফ-থাবার মত প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি প্রবাহ ধেয়ে এসে নিথর করে তুলেছে নিপুলকে। ক্রোধে নিষ্করুণ মাকড়সার ইচ্ছাশক্তি প্রবলতর হচ্ছে একটু একটু করে এগোনোর সঙ্গে। নিপুলও একটু একটু করে জমে যেন পাথরের পুতুল হয়ে যাচ্ছে।

তবে চিড়বিড় করে জ্বলে যাচ্ছে বুকের ওপরটা। যেখানে চিন্তা-দর্পণ মুখ উপুড় করে ছুঁয়ে রয়েছে বুকের চামড়া, সেই জায়গাটা তেতে আগুন হয়ে উঠছে। কারণটা বুঝে নিল নিপুল। মাকড়সার ইচ্ছাশক্তি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে চিন্তা-দর্পণের মধ্যে দিয়ে।

নিপুলের মন তাই অচঞ্চল। মনের শক্তি চিন্তা-দর্পণের সহায়তায় একাগ্র করে সহসা ছুঁড়ে দিলে আগুয়ান কালো মাকড়সার দিকে। মাকড়সার কেন্দ্রীভূত ইচ্ছাশক্তিও চিন্তা-দর্পণে প্রতিহত হয়ে ঠিকরে গেল মাকড়সার দিকেই।

চাঁদের আলো ছিল বলেই অভূতপূর্ব সেই দৃশ্যটা দেখা গেল স্পষ্ট।

টলে উঠল মারণ-মাকড়সা। যেন একটা ভয়ানক কঠিন অদৃশ্য বাধায় ধাক্কা খেয়ে থমকে গেল চকিতের জন্যে। একই সঙ্গে মুড়ে গেল আটখানা পা।

পরমুহূর্তেই দ্বিগুণ ক্রোধে সর্বশরীর ঝাঁকিয়ে আবার যেই এগোতে যাচ্ছে, নিপুল তার সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে মনের সব জোর দিয়ে নিক্ষেপ করলে আগুয়ান মৃত্যুকে লক্ষ্য করে।

ফলটা যে এরকম হবে, তা ভাবা যায়নি। গত দু'শ বছরেও এরকমভাবে হেরে যায়নি কোনো মারণ-মাকড়সা।

কয়েকফুট পেছনে ঠিকরে গেল মৃত্যুদূত। চোখে দেখা যায় না, এরকম একটা মহাশক্তি অকস্মাৎ যেন তাকে সবলে হটিয়ে দিলে পেছন দিকে।

এবং সেই প্রথম ভয়ার্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিল নরকের কীট। বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েই বিষ জর্জর মানুষটাকে টপ করে তুলে নিয়েই সাঁৎ করে উধাও হয়ে গেল ভাঙা দরজার ভেতরে।

বুকে হাত দিয়ে চিন্তা-দর্পণ উল্টে দিল নিপুল। বুকের চামড়া সত্যিই জ্বলে গেছে—অনেকগুলো ফুসকুড়ি দেখা দিয়েছে। চিন্তা-দর্পণ উল্টে দিতেই অসীম অবসাদের ঢল নামল শরীর আর মনে। এভাবে সে কখনো ইচ্ছাশক্তিকে একাগ্র করেনি। জয়ের আনন্দে মন তাই ভরপুর। সেই সঙ্গে শক্তির ভাঁড়ার কমিয়ে আনায় বড় অবসন্ন।

বিমূঢ়কণ্ঠে বললে হরিশ, -নিপুল, কিভাবে তাড়ালে ব্যাটাকে ?

পরে বলব। -শ্রান্তস্বরে বললে নিপুল ঃ ডান দিকের রাস্তা ধরে পা চালাও তাড়াতাড়ি। দুখানা বাড়ি পেরোলেই পাবে কেল্লা। তাড়াতাড়ি . তাড়াতাড়ি . . খবর ছড়িয়ে যাবে এখুনি !

চোখের সামনে একজন সঙ্গীর শোচনীয় মৃত্যু দেখে দলের সবাই তখন ভয়ে কাঁপছে। হরিশ না থাকলে এদের সামলানো যেত না। কড়া গলায় সে হুকুম দিয়ে সবাইকে টেনে নিয়ে গেল ডান দিকের রাস্তায়। ঘনঘন তাকাতে লাগল মাথার ওপরকার মাকড়সার জালের দিকে।

দু'খানা বাড়ি পেরিয়ে আসার পরে বেশ খানিকটা ফাঁকা জমি। মাকড়সার জাল আর নেই মাথার ওপর। অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে বিরাট উঁচু দেওয়াল। কম করেও বিশ ফুট উঁচু। পাঁচিলের মাথায় সারবন্দী ছুঁচের মত সরু গজাল। পাঁচিলের ওদিকে কি আছে, তা এতদূর থেকে দেখা যাচ্ছে না। তবে থমথম করছে পুরো অঞ্চলটা। জীবন্ত প্রাণীর চিহ্ন নেই কোথাও।

পেছনের রাস্তাটা একবার দেখে নিয়েই নিপুল দৌড়ে গেল সেদিকে। পেছনে হরিশ আর তার দলবল।

কাছে গিয়ে দেখা গেল, এ-পাঁচিল টপকানো সম্ভব নয়। গজালগুলো

এত গায়ে গায়ে বসানো যে ফাঁক দিয়ে মানুষ গলতে পারবে না। লোহার ফটকটা নিরেট আর বিশাল। আঠারোজন মিলে তার ওপর লাফিয়ে পড়েও পাল্লা কাঁপাতে পারল না এতটুকুও।

পাঁচিলের গা বরাবর কিছু দূর যেতেই পাওয়া গেল আর একটা ফটক। এর দু'পাশে দুটো থাম। থামের মাথায় পোঁতা গজালগুলো ততটা গায়ে গায়ে লাগানো নয়।

কেল্লাই বটে।—বিড়বিড় করে বলে ঘাড় বেঁকিয়ে ওপরে চেয়ে রইল হরিশ।

আগে থেকেই নাম শুনেছো মনে হচ্ছে ?- বললে নিপুল।

—কানাঘুসোয় শুনেছি। কোথায় যে আছে, তা কেউ জানত না। মাকড়সারাও এ-তল্লাট মাড়ায় না।

—কেন ?

—ভেতরে গেলেই বুঝবে।

ভেতরে যাবে কিভাবে ?—আবার পেছনে ঘুরে চাঁদের মায়াবী আলোয় মাকড়সা নগরীর দিকে তাকিয়ে বললে নিপুল।

এইভাবে।—বলে পকেট থেকে তিনটে গায়ে-গায়ে লাগানো আঁকশি আর দড়ি বের করল হরিশ। ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল ওপরে। থামের ওপর গজালে আঁকশি আটকে যেতেই দড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে। পকেট থেকে আর একগাছি দড়ি বের করে, গজালে বেঁধে ঝুলিয়ে দিল ওদিকে। তারপর দুটো গজালের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে দড়ি বেয়ে নেমে গেল কেল্লার ভেতরে।

নিপুল এবং তারপরে পনেরোজন অনুচর কেল্লার মাটিতে পা দিল একইভাবে। সবশেষে যে লোকটা গজালের ফাঁক দিয়ে গলে দড়ি ধরে ঝুলে পড়েছিল—হঠাৎ কাতরে উঠেই সে বিশফুট ওপর থেকে সটান আছড়ে পড়ল নিচে। আর নড়ল না।

চাঁদের আলোয় তার প্রাণহীন মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল প্রত্যেকেই। এইটুকু সময়ের মধ্যেই মুখ কালো হয়ে গেছে। গলার কাছে একটা ক্ষত—রক্ত ঝরছে।

নিপুল বললে,—বিষ ছিল গজালে। খোঁচা খেয়ে মারা গেল।

নিরস গলায় হরিশ বললে,—অস্ত্রাগারটা কোথায় ?

সচমকে নিপুল বললে,—অস্ত্রাগারের কথা তো তোমাকে বলিনি। জানলে কি করে ?

—সেই খোঁজেই এসেছি।—কোথায় ?

ওই বাড়িটা।—আঙুল তুলে দেখায় নিপুল। মনের চোখে পুরো ম্যাপটা তখন জ্বলজ্বল করছে।

—কিন্তু ওটা তো অফিসবাড়ি মনে হচ্ছে।

—ম্যাপে ওকেই বলা হয়েছে অস্ত্রাগার।

দলবল নিয়ে দরজার পর দরজা ভেঙে ঘরে ঘরে ঢুকে তল্লাসি চালিয়ে গেল হরিশ। কিন্তু অফিসের কাজের জন্যে রাশি রাশি টেবিল, চেয়ার, আলমারি ছাড়া কিচ্ছু দেখা গেল না। পর্দায় হাত দিতেই খসে গেল আপনা থেকে। ধূলোর মেঘ উঠল ঘরে ঘরে পা দিতে না দিতেই।

শেষকালে একটা ড্রয়ার ধরে টান দিল হরিশ। তালা বন্ধ দেখে লোহার শিক ঢুকিয়ে ভেঙে বের করল ড্রয়ার। ভেতরে পেল একটা অদ্ভুত জিনিস। ইঞ্চি ছয়েক লম্বা একটা নল। নলের একদিকে কাঠের হাতল। নলের মাঝখানটা ডিমের মত ফুলে আছে।

হাতলটা মুঠোর মধ্যে ধরে পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললে,—এতক্ষণে পেলাম একটা অস্ত্র।

অস্ত্র !—নিপুল তো অবাক।

তবে দ্যাখো ! -বলেই দেওয়ালের দিকে নলটা তাগ করে হাতলের একটা বোতাম টিপে ধরতেই ঠিক যেন নীল বিদ্যুৎ ঠিকরে গেল নলের মুখ থেকে। দেওয়ালের গায়ে দেখা গেল একটা ফুটো। ধোঁয়া বেরুচ্ছে গা থেকে।

মাথা চুলকে বললে নিপুল,—এ আবার কি অস্ত্র !

এরই নাম রশ্মি-বন্দুক। চল্লিশ গজ পর্যন্ত এর জারিজুরি। আমি চাইছি এর চাইতেও জোরালো হাতিয়ার। কিন্তু এ বাড়িতে সেসব পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।—দেওয়ালের গায়ে সাজানো কাঠের আলমারি, স্টীলের ফাইলিং ক্যাবিনেট আর অন্যান্য অফিস সামগ্রীর দিকে তাকিয়ে বললে হরিশ।

মনের তীব্র শক্তি দিয়ে ম্যাপকে মনের পর্দায় গেঁথে নিয়েছিল নিপুল। ভুল তার হয়নি। অস্ত্রাগার লেখা ছিল এই বাড়িটাতেই। তাই বললে,—এখানেই পাবে। মাটির তলায় গুপ্তঘরে নেই তো ?

লাফিয়ে উঠল হরিশ,—ঠিক বলেছো। এসব জিনিস তো চোখের সামনে রাখা যায় না ! বিশেষ করে ভবিষ্যতের মানুষদের জন্যে ধ্বংসের জিনিস কেউ বাইরে সাজিয়ে রাখবে না।—এই, দ্যাখ কোথায় আছে

পাতাল-ঘর।

পনেরোজন অনুচর সঙ্গে সঙ্গে তন্নতন্ন করে খুঁজে গেল ঘরে ঘরে।

খবর এসে গেল একটু পরেই। একটা ঘরের দেওয়াল আলমারির পেছনে রয়েছে একটা দরজা। কিন্তু তা খোলা যাচ্ছে না।

দৌড়ে গেল হরিশ। রশ্মি-বন্দুক তাগ করে ফুটো করে দিলে দরজার তালা-কলের জায়গাটা। তারপর এক লাথি মারতেই দু-হাট হয়ে গেল পাল্লা। লম্ফের আলোয় দেখা গেল একসার সিঁড়ি নেমে গেছে পাতালে।

হুড়মুড় করে আগে নামল হরিশ– পেছনে ভিড় করে এল সবাই। লম্বা করিডরের দু'পাশে সারি সারি ঘর। কিন্তু সব ঘরেই অফিসের কাগজপত্র ঠাসা। অস্ত্র নেই কোথাও।

মুখ চুন করে বেরিয়ে এসে হরিশ বললে, ব্যাপার কি বলো তো? তোমার কি মনে করতে ভুল হচ্ছে?

মোটেই না।—রীতিমত আত্ম-প্রত্যয় নিয়ে বলে নিপুল : চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি অস্ত্রাগার লেখাটা। তবে সেটা রয়েছে এ বাড়ির সামনের দিকে।

এ বাড়ির সামনের দিকে।–বিড়বিড় করে আউড়ে গেল হরিশ। লাফিয়ে উঠল পরের মুহূর্তেই। তীরবেগে বাড়ির বাইরের দিকে ছুটতে ছুটতে বললে বারবার : পেয়েছি ! পেয়েছি ! পেয়েছি !

অফিসবাড়ির সামনে একটা খোলা চত্বর। পিচমোড়া মসৃণ মেঝে। যেন একটা কালো ময়দান। ধুলোয় ঢেকে আছে।

তারস্বরে হুকুম দিয়ে গেল হরিশ,--পা ঠুকে ঠুকে দ্যাখো গোটা চত্বরটা। ফাঁপা আওয়াজ পেলেই বলবে। পাতাল ঘর এখানেই আছে।

সতেরোজনে একইসঙ্গে লাইন দিয়ে পা ঠুকে গেল বিশাল চত্বরের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ! কিন্তু নিরেট আওয়াজ উঠল সর্বত্র।

চোখ জ্বলছে হরিশের। উৎকণ্ঠা-কাঁপা গলায় বলছে বারবার,—এখানেই আছে। আমার মন বলছে এখানেই আছে পাতালে ঢোকার রাস্তা।

গম্ভীর গলায় নিপুল বলে উঠল, —আমারও মন তাই বলছে, হরিশ। কিন্তু সেকালের মানুষরা কি এতই বোকা যে এমনভাবে পাতালপুরীর দরজা বানিয়ে যাবে যার ওপর পা ঠুকলেই আওয়াজ হবে ঢপ ঢপ করে ?

তবে ?—অসহায় চোখে তাকায় হরিশ।

পকেট থেকে ধাতুর চোঙা বের করে বোতাম টিপল নিপুল। নিমেষে লম্বা হয়ে গেল চোঙা।

হতভম্ব গলায় হরিশ বললে,—এটা কি ?

পরে শুনবে।—বলেই লম্বা চোঙাকে দু'মুঠোয় শক্ত করে ধরে মেঝের সঙ্গে সমান্তরালে ধরল নিপুল। তারপর কোণাকুণিভাবে এগিয়ে গেল চত্বরের এক কোণ থেকে আর এক কোণের দিকে।

চোঙা কাঁপল না একটুও।

এবাব আশ্চর্য অভিযান শুরু হল। তৃতীয কোণ থেকে চতুর্থ কোণেব দিকে। কয়েক'পা এগুতেই চোঙার মুখ ধাক্কা খেয়ে উঠে গেল আকাশেব দিকে। ধাক্কাটা এল মেঝে থেকে। কিন্তু কে ধাক্কা মারল, তাকে দেখা গেল না।

অদৃশ্য শক্তির ধাক্কা! — বিমূঢ়কণ্ঠে বললে হরিশ ঃ কি আছে চোঙায়?

পরে শুনবে।—সিগন্যালের পব সিগন্যাল আসছে চোঙার মধ্যে। নিপুলের হাতের মধ্যে দিয়ে চিনচিনে অনুভূতি ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা দেহে। বিস্পে মাস্টার কম্পিউটারে সাদা ইমারত থেকেই ভেলকি দেখিযে যাচ্ছে বিরামহীনভাবে।

—এখানেই আছে পাতালপুরীর দরজা। চালাও তোমার রশ্মি বন্দুক।

চলল রশ্মি বন্দুক। দু-ফুট ব্যাসের একটা গর্ত হয়ে গেল চত্বরে। গভীরতায় ছ-ফুট। গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে তরল পিচ। পিচের মধ্যে দিয়েই দেখা যাচ্ছে একটা ধাতুর পাত। রশ্মি বন্দুকের রশ্মি গলাতে পারেনি সেই ধাতুকে।

হরিশ বললে,—রশ্মির তেজ কমিয়ে রেখেছিলাম, এবার বাড়িয়ে দিচ্ছি।

বলে, বোতামটাকে একটা টানা লম্বা ঘাটের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে গেল সামনের দিকে। ধাতুর পাতের দিকে তাগ করল নল। নিজে শুয়ে পড়ল মেঝের ওপর। চাপ দিল বোতামে।

পুঞ্জ পুঞ্জ কালো ধোঁয়া ঠিকরে গেল গর্ত থেকে ওপর দিকে। সারা শরীরে গলা পিচমাখা অবস্থায় গড়িয়ে সরে এল হরিশ।

ধোঁয়া সরে যাওয়ার পর উঁকি মেরে দেখল নিপুল। ধাতুর পাত উড়ে

গেছে। পুরু ধাতু গলিয়ে ফুটো করে দিয়েছে মারাত্মক রশ্মি বন্দুক। গর্তের পিচ আরও গলছে এবং ঝরে ঝরে পড়ছে তলার সিঁড়ির ধাপে।

উঠে দাঁড়িয়ে বললে হরিশকে,—গরম পিচ ঢাকতে হবে, নইলে নামা যাবে না।

অফিসঘরেই পাওয়া গেল বিস্তর পর্দা। ছিঁড়ে এনে গর্তের গায়ে চেপে দিতেই লেগে গেল তরল পিচের গায়ে। ওপর থেকে দড়ি ঝুলিয়ে নেমে গেল হরিশ—পেছনে সব্বাই।

চাঁদের আলোয় এতক্ষণ কাজ দিয়েছে— এবারে জ্বলল তেলের লম্ফ। সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে পাতাল গর্ভে, শেষ হয়েছে চাতালে। চাতালের সামনে একটা ধাতুর দরজা। চারপাশে ছ'ইঞ্চি চওড়া ফ্রেম।

ফ্রেমটার দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে হরিশ বললে, -এখানেও কলের খেলা !

মানে ?—নিপুলের প্রশ্ন।

— যে ধাতুর পাত ফুটো করে এলাম, তার ওজন কম করেও একমন। হাতে করে খোলা যায় না—নিশ্চয় সুইচ আছে অফিসঘরে। তাড়াহুড়োয় রশ্মি বন্দুক দিয়ে উড়িয়ে দিলাম ঠিকই, কিন্তু এ দরজাটার ফ্রেম এরকম কেন ? এধরনের গোবরাট তো কখনো দেখিনি। ফাঁদ পাতা আছে মনে হচ্ছে।

হেসে বললে নিপুল,—ফাঁদের দাওয়াই-ও আছে আমার কাছে।

বলেই, হাতের চোঙা বাড়িয়ে দিলে চওড়া গোবরাটের দিকে।

চকিতে কি যেন একটা ঝলসে উঠল লম্ফের আলোয়। বাঁ পাশের ফ্রেম থেকে একটা ধারালো ধাতুর পর্দা নিমেষে বেরিয়ে এসে খট করে আটকে গেল ডান দিকের ফ্রেমে। নিপুল যদি চোঙা না বাড়িয়ে ধরে নিজেই হাত দিতে যেত ধাতুর কপাটে— নতুন এই পাত তাকে কেটে দু'টুকরো করে দিত চোখের পলক ফেলার আগেই। লোকসানের মধ্যে ধাতুর চোঙাটা আটকে গেল ফাঁকে। ধাতুর ফাঁদ চেপে ধরেছে তাকে, কিন্তু টোল খাওয়াতে পারেনি মনে হচ্ছে।

কঠিন মুখে পিছু হটে এল হরিশ। হাতের রশ্মি বন্দুক তাগ করল মৃত্যুফাঁদের দিকে।

পরক্ষণেই ফুটো হয়ে গেল পর-পর দুটো পাতেই। আর সঙ্গে সঙ্গেই ক্লিক করে একটা শব্দ করে সামনের পাতটা ঢুকে গেল গোবরাটের খাঁজে। আছড়ে পড়ল ধাতুর চোঙা।

তুলে নিল নিপুল। আশ্চর্য কাণ্ড। ধারালো পাত এতটুকু টোল খাওয়াতে পারেনি আজব চোঙায় :

ফের বাড়িয়ে ধরল সামনের দিকে। এবার আর ধাতুর পাত বেরিয়ে এল না দেওয়ালের খাঁজ থেকে। রশ্মি বন্দুকের তাপে বিগড়েছে কলকব্জা। ধাক্কা মারতেই দমাস করে খুলে গেল দ্বিতীয় দরজার পাল্লা।

লম্বা সুড়ঙ্গপথে বিশ গজ যেতেই আবাব সামনে পড়ল একটা ধাতুর গরাদ দেওয়া দরজা। এ দরজাব তলায় একটা গোল মত চাকা। তাতে অনেকগুলো সংখ্যা খোদাই কবা রয়েছে। সংখ্যা মিলে গেলে খুলে যাবে তালা- নইলে নয়।

রশ্মি বন্দুক উঁচিয়ে ধরেছিল হরিশ। তাবপর কি ভেবে আর বোতাম টিপল না। তালার ডায়ালে কান পেতে রইল কিছুক্ষণ। আঙুল দিয়ে আলতো করে সামনে পেছনে ঘুরিয়ে গেল বোতামটা। মিনিট দশেক পরে শোনা গেল পর-পর অনেকগুলো ক্লিক-ক্লিক আওয়াজ। ধাক্কা মেরে কপাটি খুলে দিলে হরিশ।

আর তখনই বোঝা গেল হরিশের বিচক্ষণতা। রশ্মি বন্দুক দিয়ে তালা খুলতে গিয়েও থেমে গেছিল যা ভেবে, তা থরে থরে সাজানো রয়েছে চোখের সামনে।

লাল বিস্ফোরকের বাক্স। সাজানো রয়েছে দরজার গা ঘেঁষে। প্রত্যেকটা বাক্সের গায়ে আঁকা মড়ার মাথার খুলি। আর আড়াআড়ি করা দুটো মানুষের হাড়।

এই দরজাই শেষ দরজা। এবং বিস্ফোরকের এই স্তুপটাই সর্বশেষ বাধা। বাক্সগুলো নামিয়ে করিডরে রেখে শেষের এই ঘরে ঢুকল হরিশ সদলবলে। ঘরটার সিলিং নিচু—কিন্তু খুব লম্বা। ধাতুর আর কাঠের বাক্স থাক দিয়ে সাজানো দু'পাশে। লম্ফের আলো উঁচু করে ধরেছে হরিশ। দুই চোখে বিচিত্র উল্লাস। সারা জীবনের চাওয়া যেন সে আজ পেয়েছে।

চোখ কুঁচকে বললে নিপুল,—হরিশ, তুমি জানতে এই ঘরের কথা?

চোদ্দ

যেন স্বপ্নভঙ্গ ঘটল হরিশের। বিষম চমকে উঠে বললে,—গুজব শুনেছিলাম অনেক। বিশ্বাস করিনি। নিপুল, যুদ্ধ শুরু করার মত রসদ রয়েছে এখানে। এই দ্যাখো রকেট, আগুনবোমা, বাড়ি ধ্বসানোর ক্যাপসুল, অ্যাটম গ্রেনেড .

আপনমনে আরও নাম বলে গেল বাক্সগুলোর সামনে দিয়ে যেতে যেতে। তারপর সবশেষের বাক্সর গাদায় বসে পড়ল ধপ করে। আবার স্বপ্ন ঘনিয়েছে দু-চোখে।

সামনে গিয়ে বললে নিপুল,—শরীর [illegible] আছে তো ?

—বেঠিকটা কি দেখলে ?

—দেখছি বলেই বলছি।

—শরীর ঠিকই আছে, নিপুল। তবে ভয় হচ্ছে।

—কিসের ভয় ?

—এই এত শক্তি সামলানোর ভয়। এই শক্তি দিয়ে পৃথিবীকে পাল্টে

দেওয়া যায়। যা চাও, তাই করা যায়।

—আমি তো চাই মাকড়সাদের খপ্পর থেকে মানুষ জাতটাকে বাঁচাতে।

– তাও পারবে।

—কিন্তু কি করে হরিশ ? বিস্ফোরকের অভাব তো কখনও হয়নি তোমার। আজ একথা বলছ কেন ?

—নিছক বিস্ফোরক নয় নিপুল। দেখেছো কি রয়েছে এখানে ?

আঙুল তুলে যেদিকে দেখায় হরিশ, সেদিকে রয়েছে কালো ধাতু দিয়ে তৈরি একগাদা বাক্স। লম্বায় আঠারো ইঞ্চি আর চওড়ায় তিন ইঞ্চি প্রত্যেকটার সাইজ। ওপরে লেখা ঃ অটোমেটিক লেজার বন্দুক।

মানে ?—শুধোয় নিপুল।

-চালু কথায় বলতে পারো, কোতল বন্দুক।

নামটা শুনেছি।

জবাব দিল না হরিশ। খুব সাবধানে একটা বাক্স নামিয়ে ঢাকনি খুলে ফেলে ভেতর থেকে বের করল একটা কিম্ভুত-কিমাকার হাতিয়ার। হাতিয়ার না বলে তাকে খেলনা বলাই উচিত। দেড়ফুট লম্বা একটা পেল্লায় স্ক্রুর মত দেখতে। একপাশে একটা কাঠের হাতল। হাতলের গায়ে এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা।

সন্তর্পণে উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে বললে নিপুলকে, -প্রথম যেটা দেখেছিলাম, তাকে কাজে লাগানো যায়নি। কলকব্জা নষ্ট হয়ে গেছিল।

নিপুল বললে,—এটাকে কাজে লাগিয়ে দেখবার সময় কিন্তু ঘনিয়ে আসছে। যা করবে, তাড়াতাড়ি করো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি . . তাড়াতাড়ি . . . আর সময় নষ্ট নয়।

লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল হরিশ। কোতলকে ঝুলিয়ে নিল কাঁধে। ফিতেটা গোটানো ছিল হাতলের শেষে। টান দিতেই গেল খুলে। মুখ চলছে কিন্তু সমানে,—হাইড্রোজেন বোমার চাইতেও মারাত্মক হাতিয়ার এখন আমার হাতে। ডরাইনা আর কাউকেই।

হাইড্রোজেন বোমা কী ?—শুধোয় নিপুল।

—এক-একটা দেশ উড়িয়ে দেওয়ার মত বোমা। কিন্তু তার চাইতেও মারাত্মক এই কোতল অস্ত্র। হাইড্রোজেন বোমা দিয়ে বিশেষ কিছু ধ্বংস করা যায় না। কিন্তু এই ক্ষুদে কোতল বন্দুক, একজন মানুষ থেকে আরম্ভ করে গোটা সৈন্যবাহিনীকে কোতল করে দিতে পারে। হাঃ হাঃ হাঃ ! খাসা হাতিয়ার।

—রশ্মি বন্দুকের চাইতেও কি শক্তিশালী ?

--নিশ্চয় ! রশ্মি বন্দুকের রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে। তাই চল্লিশ গজের বাইরে কিছুর দিকে টিপ ঠিক রাখা যায় না। কিন্তু আমার এই কোতল দু-মাইল দূরের মানুষেরও হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দেবে সুন্দরভাবে।

—হরিশ, মানুষ খুনের কথা একদম ভাববে না। নেহাৎ যদি দরকার পড়ে--

তা তো বটেই, তা তো বটেই। মানুষ হল গিয়ে আমার জাতভাই—মাকড়সা আমার জাতশত্রু।

—দু-মাইলের ভিতরে লক্ষ্যবস্তুকে টিপ করবে কিভাবে ?

–কী বোকা ? এই যে দেখছো এক থেকে দশ পর্যন্ত লেখা রয়েছে- ছোট্ট এই হাতলটা টেনে নিয়ে গিয়ে রাখবে কখনো এক-এর ওপর। তখন পঞ্চাশ গজ দূরের বাছাধনের আর রক্ষে নেই। দরকার হলে রাখবে দশে। দুমাইল দূরের কচুপোড়া কচুকাটা হয়ে যাবে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই। হাঃ হাঃ হাঃ।

কোতল হাতে নিল নিপুল। বেশ ভারি হাতিয়ার।

তবে হাতল চেপে ধরলে মনে হয় যেন অভ্যেসটা বহুদিনের। এই প্রথম কোতল হাতে এল বলে মনেই হয় না।

হরিশের অনুচররা একটার পর একটা বাক্স খুলে চলেছে। হরিশ ঘুরে ঘুরে দেখছে আর সোল্লাসে চেঁচাচ্ছে,—অপূর্ব ! আগুন বোমা ! ছুঁড়ে মারলেই লঙ্কাকাণ্ড ! –ক' বাক্স আছে ?

বারোটা বাক্স।– বললে – কজন।

– একমুঠো করে পকেটে রাখো প্রত্যেকে। আগুনকে ভয় পায় সব ব্যাটাচ্ছেলেই—মানুষ বাদে ! হাঃ হাঃ হ.।

একটা প্রশ্ন করব ?– বললে নিপুল।

স্বচ্ছন্দে . . . স্বচ্ছন্দে।—হরিশের দু'চোখ নেচেই চলেছে বিপুল উল্লাসে।

— আজ সন্ধ্যায় যখন বেরোলাম তোমার ডেরা থেকে, তখন কি তুমি জানতে, কোতল পাবে এখানে ?

—আশা করেছিলাম।

—তাহলে মত পাল্টালে কেন ?

--কি বিষয়ে ?

—মাকড়সাদের খতম করার বিষয়ে।

—নিপুল, মাকড়সাদের সঙ্গে লড়তে আমি চাই না। আমি চাই দর কষতে। এই কোতল দেখিয়ে ব্যাটাচ্ছেলেদের চড়া দাম দিতে বাধ্য করব।

—দাম ? কিসের দাম ?

—স্বাধীনতার দাম। বুঝলে ?

—না।

—নিপুল, মানুষের কোনো ব্যাপারে নাক গলাতে দেওয়া চলবে না কাউকেই। কোতল আমাদের দখলে থাকলে পাবোই পাবো সেই স্বাধীনতা। ইলেকট্রিক টর্চ ব্যবহার করতে পারি না —তার বদলে চলছে এই তেলের লম্ফ। দেশলাই তৈরি করতে পারি না চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালাতে হয়। কেন ? না, মাকড়সাদের তাই ইচ্ছে। ওদের ইচ্ছেয় আমাদের চলতে হবে। কেন ? কেন ? কেন ?

—গুবরেরাও কি ওদের ইচ্ছেয় চলে ?

আরে বাবা, সন্ধি হয়েছে যে সেইভাবে। শান্তি চুক্তি লেখা আছে ঃ গুবরেদের কোনো চাকর যন্ত্র তৈরি করতে বা ব্যবহার করতে পারবে না।

— চুক্তি ভাঙলে কি হবে ?

— যুদ্ধ। এবার যুদ্ধ লাগলে হারামজাদারা একেবারে শেষ করে ছাড়বে আমাদের।

—শেষ করে ছাড়বে ? এত শক্তি কি মাকড়সাদের আছে ?

—সংখ্যায় ওরা এখন গুবরেদের হাজার গুণ। চুক্তির সময়ে ছিল সমান সমান। একেকটা গুবরের পেছনে এক হাজার মাকড়সা তেড়ে গিয়ে একেবারে ধ্বংস করে ছাড়বে। বুঝেছো ?

বুঝেছি। এবার বেরোও এখান থেকে।

—হ্যাঁ, বেরোই। . . .এই, তোরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গিয়ে রাখ বাইরে।

নিপুল বললে,—এ জায়গার সন্ধান যদি ওরা পায় ?

—অত সোজা নয়।

—নিকাডোকে খাটো করে দেখতে যেও না।

সে ব্যবস্থা করে যাচ্ছি।—বলে উঠে পড়ল হরিশ। বাক্স বাক্স হাতিয়ার নিয়ে অনুচররা বেরিয়ে যেতেই করিডর থেকে লাল বিস্ফোরকের বাক্সগুলো এনে দরজার সামনে তাগাড় করে রাখল হরিশ নিজেই। তারপর পেল্লায় কপাট টেনে বন্ধ করে দিয়ে নম্বরী তালার ডায়াল বেঁকিয়ে দিলে গায়ের জোরে। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ঠুকে ঠুকে ভেঙে দিল সব কটা সংখ্যা। হৃষ্টকণ্ঠে, বললে—নিকাডোর চোদ্দপুরুষও এখন খুলতে পারবে

না এই তালা। নিপুল, কৃতজ্ঞ রইলাম তোমার কাছে এখানে নিয়ে আসার জন্যে।

—কৃতজ্ঞ রইলাম আমিও—আমার সঙ্গে আসার জন্যে।

বাইরে নিবিড় অন্ধকার। চাঁদ পালিয়েছে ঘন কালো মেঘের আড়ালে। হাওয়ার জোর বাড়ছে। হেলে পড়ছে তেলের লম্ফের ছোট ছোট শিখাগুলো।

দাঁতে দাঁত পিষে বললে হরিশ, –হারামজাদা মাকড়সারা এই অন্ধকারে আমাদের দেখতে পাবে। আমরা কিন্তু শয়তানের বাচ্ছাদের দেখতে পাবো না।

নিপুল বললে,—ভোর না হওয়া পর্যন্ত কি এখানেই থেকে যাবে?

—কক্ষনো না।—বেরোতে হবে এক্ষুণি। চলো যাই ফটকের সামনে।

বিশ ফুট উঁচু পুরু ধাতব কপাটের সামনে গিয়ে হরিশ একহাতে উঁচিয়ে ধরল রশ্মি বন্দুক। আরেক হাতে কোতল বন্দুক। বললে, মজাটা দ্যাখো।

বলেই, বোতাম টিপলো রশ্মি বন্দুকের। নীল বিদ্যুৎ আছড়ে পড়ল ধাতুর কপাটে। বাতাসে ভেসে এল ধাতু তেতে ওঠার গন্ধ। পুরো কপাট লাল হয়ে গেল নিদারুণ তাপে। তারপর হল সাদা, কিন্তু গলে গেল না। রশ্মি বন্দুক নামিয়ে নিল হরিশ।

বললে,—ক্যালিক্স নামে একরকমের ধাতু দিয়ে তৈরি হয়েছে এই দরজা। দেওয়ালেও রয়েছে একই ধাতু। সন্ত্রাসবাদীরা যখন দেশে দেশে সরকারের গদি টলিয়ে ছাড়ছিল, তখন আবিষ্কৃত হয় এই ধাতু। রশ্মি বন্দুককে হার মানানোর জন্যে। এবার দ্যাখো।

বলেই তুলে ধরল কোতল। খুব সরু নীল রশ্মি ধেয়ে গেল প্যাঁচানো নলের মধ্যে থেকে—ঠিক যেন একটা আলোর পেন্সিল। পেন্সিলের ডগা ফটকের ধাতু স্পর্শ করতেই ছোট্ট একটা ফুটো দেখা দিল সেখানে। ওপর দিকে একটু একটু করে কোতল তুলতেই ছোট্ট নীল শিখা টানা লম্বা লাইন টেনে গেল কপাটের গায়ে। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যেই মস্ত বড় চৌকোনা একটা অংশ সশব্দে খসে পড়ল বাইরের দিকে। আওয়াজ শুনেই বোঝা গেল, ওজন তার কম নয়। কাছে গিয়ে দেখল নিপুল। তিন ইঞ্চি পুরু পাত দিয়ে তৈরি হয়েছে পুরো কপাটটা।

হুকুম দিল হরিশ,—লম্ফগুলো নিভিয়ে বেরিয়ে এস আমার পেছন

পেছন। না, না, নিপুল আগে তুমি বেরোও।

নিপুলও তাই চাইছিল। মাকড়সাদের ইচ্ছাশক্তির প্রচণ্ডতা রোখবার ক্ষমতা তো শুধু তারই আছে। তাই নির্ভয়ে একটা পা বাড়িয়ে দিল বাইরে চৌকোনা ফুটোর মধ্য দিয়ে।

ধপ করে একটা শব্দ শোনা গেল পেছনে। দেহ আছড়ে পড়ার আওয়াজ।

নিমেষে পেছনের পা-খানাও বাইরে নিয়ে এল নিপুল। সঙ্গে সঙ্গে পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেল সর্বাঙ্গ।

চাঁদ ফের মুখ বাড়িয়েছে মেঘের আড়াল থেকে। মাকড়সারা জড়ো হয়েছে ফাঁকা জায়গায়। মোট ছ'জন। ঠিক যেন কালো পাথরের মূর্তি। কালো চোখ থেকে ঠিকরে যাচ্ছে চাঁদের আলো।

এবার আর ভয়ে ঘাবড়ে যাচ্ছে না নিপুল। পক্ষাঘাত ওর মাংসপেশীকে অসাড় করেছে ঠিকই, কিন্তু চোখ নাড়াতে পারছে অনায়াসেই। মগজও কাজ করে চলেছে। চিন্তা-দর্পণ উল্টে গিয়ে বুকে ঠেকে থাকায়, মনের শক্তি সংহত রয়েছে। একাগ্র এই মনঃশক্তিকে একটু একটু করে হাতে আর পায়ে চালনা করল নিপুল। খসে পড়ল পক্ষাঘাতের শেকল।

মাকড়সারা বুঝতে পারেনি নিপুল ওদের সমবেত ইচ্ছাশক্তির নিগড় খসিয়ে ফেলেছে। তাই একজন এগিয়ে এল সামনে।

ধীরে সুস্থে কোতল তুলে ধরল নিপুল। সেফটি ক্যাচ থেকে বোতাম সরিয়ে এনে টিপতেই নীল আলোর পেন্সিল ছুটে গিয়ে মাকড়সাকে ফুটো করে পেছনের বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল সোজাসুজি। পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে গেল মাকড়সাটা—সেই সঙ্গে পেছনের বাড়ির বেশ খানিকটা।

ইচ্ছাশক্তির বাঁধন খসে পড়ল তৎক্ষণাৎ। ছ'টা মাকড়সা একসাথে যে শক্তি প্রয়োগ করেছিল—একজন অদৃশ্য হয়ে যেতেই যৌথ প্রচেষ্টায় ভাঙন ধরল তক্ষুণি।

চৌকোনা ফুটো দিয়ে হরিশ বেরিয়ে এসে দাঁড়াল নিপুলের পাশে। কোতল তুলে বোতাম টিপে নীল রশ্মি রেখার ছোঁয়া বুলিয়ে গেল পাঁচটা মাকড়সার ওপর। দু'টুকরো হয়ে গেল প্রত্যেকের দেহ। পাগুলো পড়ে রইল চত্বরে। মাথাগুলো আছড়ে পড়ল পেছনে।

কোতল নামিয়ে বললে হরিশ,—নিপুল, তুমি বড় বেশি তেজালো করে তুলেছিলে কোতলের এনার্জিকে।

পাঁচ-য়ে ছিল যে !—কোতল তুলে দেখাল নিপুল।

হাত বাড়িয়ে বোতামটাকে সেফটি পয়েন্টে নামিয়ে দিল হরিশ। বললে,—চলো।

—কোথায় ? বৃষ্টি এসে গেল দেখছো না।

সত্যিই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

হরিশ বললে,—এখানে আর নয়। মাটির নীচে কোনো ঘরে ঠাঁই নিতে হবে রাতের মত। ছোট জায়গায় সুবিধে অনেক।

দৌড়ে চত্ত্বর পেরিয়ে গেল হরিশ। ছুটছে এখন প্রত্যেকেই। বৃষ্টির ফোঁটাও বড় হচ্ছে। রাস্তার পাশে একটা বড় বাড়ি দেখেই হরিশ ঘুরে গেল সেদিকে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নীচে। রশ্মি বন্দুক চালিয়ে দরজার তালা গলিয়ে দিয়ে, এক লাথি মেরে ঢুকে গেল ভেতরে। দলবল হুড়মুড় করে নেমে এল পেছন পেছন। বাইরে ততক্ষণে বৃষ্টি নেমেছে মুষলধারে।

লম্ফ জ্বালিয়ে ঘরের চেহারাটা ভালই লাগল। মেঝেতে কার্পেট, চেয়ার, টেবিল- সবই আছে।

ভাঙা দরজায় চেয়ার টেনে আটকে দিল হরিশ। বললে, -রাতটা এখানেই কাটানো যাক। কিন্তু খালি পেটে ঘুম আসবে কি ?

পকেট থেকে হলদে বড়ির বাক্স বের করে প্রত্যেকের হাতে একটা করে বড়ি দিয়ে নিপুল বললে,—মুখে ফেলে দাও ।

হরিশ বললে,—কেন ?

—খিদে মিটবে।

—কোথায় পেলে ?

—একটা মেশিনের কাছে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিপুলের মুখের দিকে একবার চেয়েই বড়ি মুখে ফেলল হরিশ। কয়েক সেকেন্ড পরেই ক্লান্তি কেটে গেল। ঢেঁকুর তুলে বললে,—গরম গরম কত খাবার খেলাম মনে হচ্ছে। আশ্চর্য বড়ি তো!

অনুচরদের চোখেমুখেও জ্যোতি ফিরে এসেছে বড়ি ভক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে। ক্লান্তি পালিয়েছে নিমেষে। সেই সঙ্গে ভয়-ভয় ভাবটা।

নিপুল বললে,—ঘুমোও। অঘটন ঘটলে আমি আছি। আমার ঘুম আগে ভাঙবে।

ভাঙলোও বটে। সবাই যখন ঘুমিয়ে কাদা, যখন ভোরের আলো ফুটছে পূবদিগন্তে, তখন আচমকা যেন একটা গনগনে শলাকা ঢুকে গেল নিপুলের মগজের মধ্যে। যন্ত্রণায় ঘুম উধাও হল তৎক্ষণাৎ।

ঘুমের সময় চিন্তা-দর্পণকে উল্টে বুকের দিকে রেখে দিয়েছিল নিপুল ইচ্ছে করেই। মাকড়সারা ইচ্ছাশক্তি ছুঁড়ে দিলেই তা ধাক্কা মারবে চিন্তা-দর্পণে—ঘুমও ভেঙে যাবে নিজের ইচ্ছাশক্তির জাগরণে।

ধড়মড় করে উঠে পড়ল নিপুল। সঙ্গীরা সবাই অসাড়। ঘুমের মধ্যেই পক্ষাঘাত অবশ করেছে প্রত্যেককে।

শুধু নিপুল খাড়া রয়েছে চিন্তা-দর্পণ আর নিজের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির দৌলতে।' খপ করে কোতল তুলে দরজার দিকে টিপ করে বোতাম টিপতেই নীল রশ্মি পাল্লা ফুটো করে জ্বালিয়ে দিল খানিকটা অংশ।

ইচ্ছাশক্তির বাঁধনও খসে পড়ল তৎক্ষণাৎ। সবার আগে উঠে বসল হরিশ, কী হয়েছে নিপুল ?

- ওরা এসে গেছে।

পনেরো জন অনুচর ঘিরে ধরেছে নিপুল আর হরিশকে। হরিশের কালো মুখের থাবড়া নাক শক্ত হয়ে উঠেছে। পুরু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঝকমকে দাঁত। কুঁচকানো কালো চুলে হাত চালিয়ে বললে চড়া গলায়,—হাঁ করে দেখছিল কী ? দরজার ফুটোটা বন্ধ করে দিয়ে আয়।

একজন অনুচর দৌড়ে গিয়ে একটা টেবিল উল্টে ঠেস দিয়ে ফিরে এসে দাঁড়ালো হরিশের সামনে। দু'চোখে তার ভয়। একই ভয় দেখা দিয়েছে প্রত্যেকের চোখে মুখে। ঘুমের মধ্যে পক্ষাঘাতে পঙ্গু হওয়ার অভিজ্ঞতা তাদের এই প্রথম। নিকাডোর লোকজনকে ঠিক এইভাবেই কাবু করা হয়েছিল--নিপুল তা জানতো বলেই চিন্তা-দর্পণকে দিয়ে নিজের মনকে সজাগ রাখার ব্যবস্থা করেছিল ঘুমোবার আগেই।

সাদা দাঁত বের করে হাসল হরিশ। কালো মুখে কালো চোখ দুটো জ্বলছে বাঘের চোখের মত। বললে থেকে থেমে,—ভয় পেয়েছিস ?

ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল পনেরো জনেই।

হরিশ টিবিয়ে টিবিয়ে বললে, মাকড়সারা কিভাবে মানুষদের পঙ্গু করে দেয় জানিস ? শোন, সম্মোহনী শক্তি দিয়ে মানুষের অবচেতন মনকে যা হুকুম দেয়—মানুষ তাই করে। কিন্তু কোনো মানুষ যদি মনে মনে ঠিক করে, সম্মোহিত হবে না, তাকে সম্মোহন করা যায় না। এই যে নিপুল—এইটুকু বয়েসেই সেই কায়দা রপ্ত করেছে। তাই মাকড়সারা ওকে ভয় পায়।—ঠিক কিনা নিপুল ?

ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল নিপুল। তার শক্তির পরম সহায় যে

চিন্তা-দর্পণ, তা আর বলল না।

হরিশ কালো চুলে আর একবার হাত চালিয়ে নিয়ে বললে,—কোতল হাতে নে প্রত্যেকে। ইচ্ছাশক্তি যখনি অবশ করে দিতে চাইবে, মানুষের মতই মনের শক্তি দিয়ে রুখে দাঁড়াবি। যা' আর কিছু বলার নেই।—কে আসছে ?

দরজার বাইরে সিঁড়ির ওপর ভেসে এল পায়ের শব্দ। জুতো মসমসিয়ে নামছে একটা ভারী দেহ। তাড়াহুড়ো করছে না একদম। জুতোর শব্দ এসে থেমে গেল বন্ধ দরজার ওপারে। শোনা গেল গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর,— আমি রাজা নিকাড়ো বলছি। হরিশ আছো নাকি?

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল নিপুল আর হরিশ।

গলা খাঁকারি দিয়ে হরিশ বললে,—আছি বটে। আপনি এসেছেন কেন ?

দুটো কাজের কথা বলতে। পাঠিয়েছে মাকড়সাদেব রাজা।

—তাই নাকি ! তাই নাকি ! ওরে তোরা দৌড়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দে না !

দুজন অনুচর ছুটে গিয়ে টেবিল সরিয়ে রেখে খুলে দিল পাল্লা।

আমিরি চালে ঘরে ঢুকলো রাজা নিকাড়ো। ব্যক্তিত্ব ঠিকরে পড়ছে সর্ব অঙ্গ থেকে। চাহনিতে ঔদ্ধত্য। ঠোঁটের কোণে বিপুল তাচ্ছিল্য।

চৌকাঠ পেরিয়ে এসে ধীর গম্ভীর গলায় বললে,—বসবার জায়গা পাবো কী ?

ত্রস্তে এগিয়ে গেল একজন অনুচর। এগিয়ে দিলে একটা চেয়ার। বিরাট দেহ আর কথার জা_ তাকে স্পর্শ করেছে।

আয়েশ করে চেয়ারে বসল রাজা। এতক্ষণে যেন দেখতে পেল নিপুলকে। বললে ঈষৎ ব্যাঙ্গের স্বরে, তুমিও আছো। তা তো থাকবেই।

হ্যাঁ, থাকবই।—নীরস স্বরে বললে নিপুল। নিকাড়োর মতিগতি সে আঁচ করতে পেরেছে। তাই গলার স্বর একই রকম রেখে বললে : এসেছেন কি বার্তা নিয়ে ?

—মাকড়সারা তোমাদের ছেড়ে দেবে। কিছু বলবে না। চলে যাও যে-যার জায়গায়।

কিন্তু !—বলে একটু থামল নিকাড়ো : তোমাদের সমস্ত হাতিয়ার রেখে যেতে হবে এখানে।

না।—পাশ থেকে কঠোর কণ্ঠে বললে হরিশ। তাকে দেখে এখন

কালো বাঘ বলেই মনে হচ্ছে ঃ হাতিয়ার হাতেই বেরোবো এখান থেকে।

— তাতে শান্তি-চুক্তি হবে না, হরিশ।

—হাতিয়ার হাতে থাকলেই বরং হবে। তখন মাকড়সারা সমঝে চলবে। হাতিয়ার হাতে না থাকলে ওরাই আমাদের পায়ের তলায় রাখবে।

—কি চাও তুমি ? লড়াই ?

—ঠিক উল্টো—শান্তি।

মানুষের হাতে হাতিয়ার থাকলে কখনো শান্তি আসে ? মানুষমাত্রই অপরাধ আর ধ্বংস করতে ভালবাসে।

এ কথাটা শুধু মাকড়সারাই বলে।

— আমিও তা বিশ্বাস করি।

কারণ আপনি মাকড়সাদের গোলাম বলে।

চোখ জ্বলে উঠল নিকাড়োর, গোলাম যদি হতাম, এভাবে কথা বলতাম না। এখানেও ওরা আমাকে পাঠাতো না। হরিশ, গোলাম তুমি নিজে।

স্বাধীন গোলাম।—ব্যঙ্গের স্বরে বললে হরিশ।

ঝগড়া থামিয়ে দিল নিপুল। বললে, হরিশের সঙ্গে আমি একমত। অস্ত্র হাতছাড়া করলে মাকড়সারা আমাদের টিপে মেরে ফেলবে। তিনজনকে আমরা হারিয়েছি এই শয়তানদের জন্যে। রাতের অন্ধকারে, এমন কি দিনের আলোতেও সুযোগ পেলেই এরা মানুষ খায়। আবার এরাই মানুষের খোকাখুকুদের সঙ্গে খেলা করে। মানুষকে জিইয়ে রাখে। নরকের পোকার চাইতেও এরা জঘন্য জীব। অস্ত্র ছাড়া এদের সঙ্গে কথা বলতে রাজী নই।

ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে নিকাড়ো, নির্বোধ ! তোমার মা, ভাই, বোনেরা মাকড়সাদের হাতে রয়েছে। হাতিয়ার যদি না ছাড়ো, তারা কেউ বাঁচবে না।

বুক ধুক-ধুক করে ওঠে নিপুলের। মুখ কিন্তু নির্বিকার।

হরিশের দিকে তাকায় নিকাড়ো,—মাকড়সারা গুবরে শহর দখলে এনে ফেলেছে। তোমার ফ্যামিলি এখন তাদের হাতে। তাদের কি মারতে চাও ?

কি রকম যেন হয়ে গেল হরিশ ! গুঞ্জন উঠলো ষোল জন অনুচরের মধ্যে। তাদেরও আত্মীয়স্বজন তাহলে এখন মাকড়সাদের হাতে ? এই খবর নিয়েই এত তড়পে যাচ্ছে নিকাড়ো ?

নিপুল দেখল ওদের মুখের অবস্থা। হরিশ পর্যন্ত মনের জোর হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সে বললে,—সাফ কথা বলে দিচ্ছি, হাতিয়ার হাতছাড়া করব না। আপনি সেই কথাই বলুন আপনার প্রভুদের। ফিরে এসে বলে যান তাদের শেষ ইচ্ছে।

ভারী দেহটাকে চেয়ার থেকে টেনে তুলল রাজা নিকাডো। শ্লেষ ঝিলিক দিয়ে উঠল দুচোখে। কাটাকাটা গলায় বললে,—ভেবেছিলাম তোমার ঘটে একটু বুদ্ধি আছে।

সিঁড়িব দিকে এক পা এগিয়ে ফের ঘুরে দাঁড়ালো,—একটা কথা রাখবে ?

—বলুন।

—তোমাদের ওই হাতিয়ার একটা দেবে ?

—কেন ?

—মাকড়সাদের দেখিয়ে তাদেব সুর নরম করাতে চাই। তোমাদের এবং সমস্ত মানুষ জাতের স্বার্থেই বলছি !

দ্বিধায় পড়ল নিপুল। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিকাডোর দু-চোখের দিকে।

রশ্মি বন্দুকটা এগিয়ে দিল হরিশ,—এটা নিয়ে যান।

বাধা দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল নিপুল। রশ্মি বন্দুক জোব্বার পকেটে চালান করে দিয়ে শাহেনশা ভঙ্গিমায় গটমট করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল নিকাডো।

সঙ্গে সঙ্গে হরিশের দিকে ঘুরে দাঁড়াল নিপুল,—হাতিয়ার ওকে দিলে কেন ?

কালো চোখে দুষ্টু হাসি ভাসিয়ে হরিশ বললে,—রশ্মি বন্দুকের এনার্জি ফুরিয়ে এসেছে। এই ঘরের দরজা ওড়াতে গিয়েই তা টের পেয়েছি। তাই দিলাম . . . তুমিই বা হাতিয়ার দিতে চাইছ না কেন ? তোমার মা, ভাই-বোনেদের জন্যে প্রাণ কাঁদছে না ?

কাঁদছে বৈকি। তোমারও কাঁদছে। কিন্তু হরিশ মাকড়সারা কী ধরনের জীব তা আমি দেখেছি। এরা শত্রুকে টিকিয়ে রাখে না। যতক্ষণ আমাদের হাতে অস্ত্র আছে, ততক্ষণ ওরা আমাদের প্রিয়জনকে মারতে সাহস পাবেনা, ওরা জানে, তখন আমরা ক্ষেপে যাবো—দশ-বিশ হাজার মাকড়সা মেরে ফেলব এক-একটা কোতল দিয়ে। কিন্তু হাতিয়ার ওদের হাতে গেলেই ওরা আগেই ছিঁড়ে খাবে আমাদের। তারপর আমাদের

প্রিয়জনদের।

যুক্তির ধার স্পর্শ করে যায় প্রত্যেকের অন্তরকে—ঠিক কথা। লড়ে যাব হাতিয়ার নিয়েই। একজন অনুচর কথাটা বললে।

নিপুল বললে,—গুবরেদের শহর কি এত সহজে দখলে আনা যায় হরিশ ?

দ্বিধাজড়ানো গলায় হরিশ বললে,—এমনিতে সহজ নয়, তবে হঠাৎ চড়াও হলে—

সিঁড়িতে শোনা গেল ভারি পায়ের শব্দ। রাজা নিকাডো নেমে এল বাদশাহী ভঙ্গিমায়। কিন্তু ঘরে ঢুকলো না। সিঁড়ির শেষধাপে দাঁড়িয়ে বললে,—মাকড়সারা তোমাদের শর্ত মানতে রাজী নয়। হাতিয়ার ফেলে রেখে এখান থেকে বেরোবে।

বলেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে।

তখন দিনের আলো জোর হয়েছে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে মাকড়সার জালের মধ্যে দিয়ে। রাস্তার ঠিক ওপরেই চাঁদোয়ার মত ঝুলছে সেই জাল।

নিপুল বললে,—মনের জোর বজায় রাখবে প্রত্যেকে। হরিশ যেভাবে বলেছে। এর চেয়ে বড় শক্তি আর নেই দুনিয়ায়। এস আমার পেছন পেছন। কোতল তৈরি রেখো। মাথার ওপরে নজর রাখবে—ব্যাটাচ্ছেলেরা লাফিয়ে পড়ে জাল থেকে।

বলে, আগে চিন্তা-দর্পণকে উল্টে বুকে ঠেকিয়ে রাখল নিপুল। মনের শক্তিকে একাগ্র করতেই নিপুলের আত্মপ্রত্যয়ে সম্পূর্ণ নির্ভীক করে তুলল ওর প্রতিটি অনু-পরমানুকে, গটগট করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরের রাস্তায়।

রাস্তার ওপারে একা দাঁড়িয়ে নিকাডো। রাস্তার বাঁদিকে আর ডানদিকে দাঁড়িয়ে পালে পালে মারণ-মাকড়সা। এদিকে হাজার দশেক, ওদিকে হাজার দশেক তো বটেই।

রাস্তার মাঝে কেউ নেই। কিন্তু এইটুকু পথ পেরোনোও বিপজ্জনক। তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল নিপুল। হরিশ আর তার দলবল উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। এখন ওরা সতেরো জনেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে। ইচ্ছাশক্তির দানবিক বন্যা ঠিক তখনি আছড়ে পড়ল সতেরো জনের ওপর—এক সঙ্গে।

বিশ হাজার দানব মাকড়সার সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি যে কি বিপুল

বিপর্যয় ঘটিয়ে দিতে পারে—নিপুল তা খানিকটা আঁচ করেছিল বইকি। তা সত্ত্বেও পুরোপুরি রুখতে পারল না নিজেকে। নিমেষে যেন জমে পাথর হয়ে গেল আপাদমস্তক। শিথিল মুঠো থেকে মনে হল এই বুঝি খসে যাবে কোতল।

চোখের মণি ঘুরিয়ে দেখল, ঠিক তাই ঘটেছে ষোল জনের ক্ষেত্রে। অকল্পনীয় শক্তিপ্রবাহ অবর্ণনীয় যন্ত্রণাবোধ ফুটিয়ে তুলেছে ষোলজনের মুখের পরতে পরতে। সম্মোহনী শক্তি আলগা করে দিয়েছে হাতের আঙুল। সশব্দে ষোলটা কোতল আছড়ে পড়ল রাস্তার ওপর।

আর একটা সেকেন্ডও দেরি করল না নিপুল।

শক্তির জোয়ার ওর ওপর মুহুর্মুহু আছড়ে পড়া সত্ত্বেও মগজকে চালু রাখল চিন্তা-দর্পণের সংহত শক্তি দিয়ে। মগজের হুকুমকে নামিয়ে আনল আঙুলের মধ্যে। কোতল তুলল আস্তে আস্তে। ডানদিকের একটা বহুতল বাড়ি লক্ষ্য করে টিপে দিল বোতাম। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকুনি মেরে এনার্জি হাতিয়ার ঘুরে গেল বাঁদিকে। নীল বিদ্যুতের শিখা মাকড়সাদের মাথার ওপর দিয়ে বিশাল ইমারত ফুটো করতে করতে বেরিয়ে গেল নীল আকাশ লক্ষ্য করে।

ধসে পড়ল বাড়ির সামনের অংশটা সবার আগে। পড়ল মাকড়সাদের ঘাড়ে। তারপর একটু একটু করে কানফাটানো শব্দে আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল বিশাল বাড়ির এক-একটা দিক।

মাকড়সাদের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি তছনছ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। ওরা এখন পালাচ্ছে। যে যেদিকে পারে ছুটছে।

সম্মোহনের খপ্পর থেকে রেহাই পেয়েই কোতল কুড়িয়ে নিয়েছে হরিশ সবার আগে। বেপরোয়া ভাবে রশ্মি নিক্ষেপ করে যাচ্ছে ডাইনে-বাঁয়ে। ঠিক যেন ব্লেড দিয়ে নিখুঁতভাবে দু-টুকরো করে কাটছে কাতারে কাতারে আটপেয়ে দানবদের। মাংস পোড়া গন্ধে কটু হয়ে উঠেছে বাতাস।

রাস্তার ওপারের নর্দমা থেকে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল রাজা নিকাডো। তার চোখের নিচে চামড়া ছিঁড়ে ঝুলছে—দরদর করে রক্ত ঝরছে। দু-হাঁটু রক্তাক্ত। জোব্বা শতচ্ছিন্ন।

টলতে টলতে এগিয়ে এল রাস্তার এপারে। আশপাশ দিয়ে বায়ু বেগে ছুটে যাচ্ছে, লাফিয়ে পালাচ্ছে কালো মাকড়সার দল কালো বিদ্যুতের মতন। কোনো মানুষের দিকে আর তাদের লক্ষ্য নেই। গত দু'শো বছরের

ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি।

গলা জড়িয়ে গেল নিকাডোর, কথা বলতে গিয়ে,—এ কী করলে, নিপুল!

প্রশান্ত স্বরে নিপুল বললে, আমাদেব দলে আসছেন তো এবাব?

ঝাঁকুনি মেবে ঘাড ফিবিয়ে নিকাডো বললে, না।

টলতে টলতে রাস্তা পেরিয়ে মরা মাকড়সাদের স্তুপে হারিয়ে গেল বিধ্বস্ত রাজা।

নিপুল একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেদিকে। [illegible] তার ভাল লাগেনি।

হরিশও ভুরু কুঁচকে চেয়েছিল সেইদিকে।

বললে আপন মনে, লোকটা বজ্জাত, [illegible]

অন্য প্রসঙ্গে চলে এল নিপুল, এখন কোথায় যাবে?

অবাক হয়ে গেল হরিশ, [illegible], আমার কোথায়,

এ শহর থেকে বেরোতে পারবে?

পারব না?

না। মৃত্যুরাজা ভাল করেই জানে, শহব থেকে একবাব বেরিয়ে গেলে আর আমাদের খতম করা যাবে না।

তা বটে! তা বটে!

–শহর থেকে তাই আমাদের বেরোতে দেওয়া হবে না। যতবকম ভাবে পারে, বাধা দেবে।

কালো চোখে আর সাদা দাঁতে ঝিলিক তুলে হরিশ বললে,–মুরোদ থাকে তো দিক। কোতল দিয়ে গুষ্টিশুদ্ধ কোতল করে ছাড়ব শয়তানের বাচ্ছাদের।

–হরিশ, ওদের তফাতে পেয়েছিলে বলে বেধড়ক কোতল চালিয়েছো—তাও আমাকে কব্জায় আনতে পারেনি বলে।

পরেও আনতে পারবে না।—মজা চোখে বললে হরিশ।

—হঠাৎ যদি লাফিয়ে পড়ে দুপাশের বাড়ির ছাদ থেকে? অথবা জাল বেয়ে এসে ঝুলে পড়ে সড়াৎ করে? চকিতের জন্যে ইচ্ছাশক্তি দিয়ে অবশ করে দিয়েই তো বিষদাঁত ফোটাবে।

অ্যাঁ!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, অকারণে এরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়নি। শত্রুকে ছোট করতে যেওনা, হরিশ।

তাহলে কি এইখানেই বসে থাকবো ?—চটে যায় হরিশ।

—তা তো বলছি না। আমার মাথায় এসেছে অন্য প্ল্যান। মাকড়সাদের ভড়কি দেওয়ার প্ল্যান।

জুলজুল করে তাকায় হরিশ,—কি বলতো ?

—সিল্ক তৈরির ফ্যাক্টরিতে চলো।

—সিল্ক তৈরির কারখানায় ! কেন বন্ধু, কেন ?

—বেলুন ওখানেই পাওয়া যেতে পারে।

বেলুন ! —হাঁ হয়ে যায় হরিশ ? বেলুন তো বানাই আমরা।

—বানানোর পর পাঠাও তো এই শহরেই ?

—তা তো বটেই।

—সেই বেলুন রাখা হয় কোথায় ?

—তা তো জানি না।

আমার মন বলছে ঐ সিল্কের কারখানায় যেখানে বেলুনের সিল্ক তৈরী হয়, তৈরী বেলুনও তো থাকবে সেখানেই।

—ঠিক ! ঠিক ! ঠিক ! কিন্তু বন্ধু, সিল্কের কারখানাটা কোথায় তা তো জানি না।

—আমি জানি। ম্যাপে দেখেছি। এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে।

—কোথায় ? কোথায় ?

—ঐ তো ! গম্বুজওলা বাড়ির পাশেই।

—চলো।

প্রায় দৌড়েই ওরা রাস্তা পেরিয়ে ঢুকে গেল উত্তর মুখো বড় রাস্তায়। মরা আর আধপোড়া মাকড়সারা স্তূপাকারে পড়ে সর্বত্র। মাথার ওপর জাল লক্ষ্য করে ফূর্তিসে কোতল চালিয়ে গেল হরিশ। সটাসট করে কাটা জাল আছড়ে পড়ে সেঁটে গেল দু-পাশের বাড়িতে। বেঁটে, কালো লোকটা এখন কালো চিতার মতই ধেয়ে চলেছে। সঙ্গীরা নজর রেখেছে ছাদগুলোর দিকে। কালো আততায়ীদের লোমশ দেহ দেখমাত্র কোতল চালানোর হুকুম আছে ওদের ওপর।

কিন্তু এনার্জি খরচের দরকার হল না। মিনিট দশেকের মধ্যে পৌঁছে গেল ছোট্ট দলটা সিল্ক কারখানার সামনে। বিশাল তোরণের পরেই কাঠের দরজা। তিন মানুষ উঁচু কপাটে তালা ঝুলছে বাইরে থেকে।

দাঁত বের করে হেসে কোতল টিপ করে তালা উড়িয়ে দিল হরিশ। দড়াম করে লাথি মেরে পাল্লা দু'হাট করে দিয়ে দিগ্বিজয়ী বীরের মত

বুক চিতিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। পর-পর আরও দুটো তালাবন্ধ দরজা খুলে গেল ঠিক এইভাবেই আশ্চর্য অস্ত্র কোতল-এর নীল বিদ্যুতের ছোঁয়া পেতে না পেতেই। তারপরেই ওরা এসে দাঁড়াল একটা প্রকাণ্ড গোলাকার হলঘরে। তিনতলা উঁচুতে তার সিলিং। বিরাট সেই ঘরে এককালে হাজার হাজার নগরবাসী জড়ো হত আলাপ-আলোচনার জন্যে। পর-পর তিনটে বারান্দা গোল হয়ে ঘিরে রয়েছে গোল-ঘরকে।

ঘরের মেঝে জুড়ে এখন পড়ে কাঠের মই, হাতে-ঠেলা গাড়ি, দড়ি-দড়া এবং আরও অনেক কলকব্জা। কারখানাই [illegible]। শিল্পভবনের [illegible]। রঙিন কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরের রোদ অনেক রঙ ছড়িয়ে দিচ্ছে ঘরময়। রামধনু আলোয় ঘরের ঠিক মাঝখানে উঁচু মঞ্চের ওপর দেখা যাচ্ছে থাক দিয়ে সাজানো পটিকরা বিস্তর বেলুন। নগর প্রধানরা যে মঞ্চে বসে সভা করে গেছে এখন তা বেলুনের পাহাড়ে ঢেকে গেছে।

থ' হয়ে দাঁড়িয়ে কালো হরিশ চোখ মেলে চেয়েছিল সেইদিকে। তার ঘাড়ে হাত দিয়ে নিপুল বললে, বন্ধু, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার সময় এখন নয়। যে তিনটে দরজা ভেঙে ঢুকলে, মই, কাঠের বরগা, আর ঠেলাগাড়ি ঠেস দিয়ে সেগুলো আগে বন্ধ করো। ওরা এসে যাবে এক্ষুণি !

—তাই নাকি ! তাই নাকি ! এই, তোরা হাঁ করে দেখছিস কী ? যা, যা। নিপুল কি বলল, কানে গেল না ?

পাঁই পাঁই করে অনুচররা দৌড়োলো হুকুম তালিম করতে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে হরিশ—মালিক ! এবার কি হুকুম ?

ইয়ার্কি পরে মেরো,– হেসে বললে নিপুল ঃ বেলুন তো পাওয়া গেল। এবার তাকে ওড়ানো যায় কি করে ?

একগাল হেসে হরিশ বললে,—সে বিদ্যে আমার জানা আছে। চলে এসো পেছন পেছন।

চিতাবাঘের মতই ছুটল হরিশ গোল-ঘরের তলার খুপরি ঘরগুলোর দিকে। সব খুপরিরই দরজা দু'হাট করে খোলা। ভেতরে পড়ে হাবিজাবি জিনিস। একটা ঘরের দরজা বন্ধ—কড়ায় ঝুলছে তালা।

অম্লান বদনে কোতল চালিয়ে লাথি মেরে পাল্লা খুলে ভেতরে ঢুকেই সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল হরিশ,—পেয়েছি !

এ ঘরের দেওয়ালের কাঁচের জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে একটা মানুষ সমান উঁচু কাঁচের চৌবাচ্চার ওপর। চৌবাচ্চা ভর্তি নীলচে সবুজ

জলের তলায় পড়ে অদ্ভুত কতকগুলো জীব। ফুলছে আর দুলছে, নড়ছে আর গুটিয়ে যাচ্ছে। আকারে নারকেলের মত বড়। সামান্য এই নড়াচড়া দেখেই বোঝা যাচ্ছে, প্রাণ আছে তাদের বিদ্‌ঘুটে থলথলে অবয়বে? সারা ঘরে ভাসছে বিকট দুর্গন্ধ। বিজয়ী বীরের মত আঙুল তুলে দেখিয়ে হরিশ বললে,—এরাই উড়িয়ে দেবে বেলুন।

এরা কারা?—নিপুলের প্রশ্ন।

—পরিফিড।

পরিফিড! . . . মানে?

—পুরো নাম 'পরিফেরা মেফাইটিস'। ডাক নাম, পরিফিড। এক ধরনের স্কাঙ্ক স্পঞ্জ। বাতাসের চাইতে হাল্কা গ্যাস তৈরি করতে ওস্তাদ।

অবিশ্বাসী চোখে চেয়ে থেকে নিপুল বললে, এই থলথলে বদাকার জীবগুলো গ্যাস ছেড়ে বেলুন ওড়াবে?

হাতেনাতে দেখাচ্ছি—বলে চৌবাচ্চায় ডোবানো জাল দিয়ে তৈরি হাতটা দিয়ে একটা পরিফিড স্পঞ্জ তুলে আনল হরিশ। আঙুল দিয়ে টোকা মারতেই হাঁ করল ছোট্ট একটা মুখ। আঙুলটা ভেতরে ঢুকোতেই মুখ বন্ধ হয়ে গেল আঙুল ঘিরে। লকলকে সবুজ জিভ-টাকে সেই সময়ে দেখতে পেল নিপুল।

সঙ্গে সঙ্গে আঙুল টেনে বের করে নিল হরিশ। ফং করে শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল ছোট্ট মুখটা। সেই সঙ্গে ভক্ করে গা-পাক দেওয়া দুর্গন্ধ ভেসে এল নিপুলের নাকে।

নাক টিপে ধরে বললে,—এঁ কিঁ কাঁণ্ড!

হি-হি করে হাসল হরিশ,—গ্যাস ছাড়ল ব্যাটাচ্ছেলে। বলে, চৌবাচ্চার গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা চোঙার ভেতরে লম্বা হাতা ডুবিয়ে তুলে আনল কয়েক টুকরো পচা মাংস। জালের হাতায় সেগুলো উপুড় করে ঢেলে দিতেই স্কাঙ্ক স্পঞ্জ নিতান্ত বুভুক্ষুর মত হাঁ করল সেই দিকে। পুরো হাতাটাকে চৌবাচ্চার জলে উপুড় করে ঢেলে দিল হরিশ। সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হল স্থিরবপু স্পঞ্জগুলো।

বাইরে এসে দরজা টেনে বন্ধ করে দিল হরিশ। হেঁকে বললে,—এই, তোরা ছ-খানা বেলুন নিচে নামা।

মই লাগিয়ে বেলুনের গাদায় উঠে গেল অনুচরেরা। নামিয়ে আনল ছ-খানা ভাঁজ করা বেলুন।

—একটা বেলুন খুলে রাখ মেঝের ওপর।

খোলা হয়ে গেল একটা বেলুন। ফাঁকা মেঝের ওপর পড়ে রইল যেন ফিকে নীল রঙের একটা অতিকায় থালা। কেন না, এ-বেলুন গোল নয়। দুটো দাবানো থালা বা চ্যাপ্টা গামলা মুখোমুখি জুড়ে দিলে যে-রকম দেখতে হয়—ঠিক তাই। তলায় সিল্কের দড়িতে বাঁধা একটা চ্যাপ্টা দোলনা। মাকড়সা-বেলুনের চেহারা খুব কাছ থেকে কখনো দেখেনি নিপুল। দূর থেকে দেখেই ভয় পেয়েছে।

বললে,—গ্যাস তৈরি হবে কি করে ?

হরিশ চ্যাটালো বেলুনের মাঝের দড়ি ধরে টান মারতেই পাশাপাশি ভাবে হাঁ হয়ে গেল খানিকটা জায়গা। ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বেলুনের ভেতরটা। সেখানে রয়েছে একটা এক ফুট ব্যাসের বাটি। ওপরে জাল দিয়ে ঢাকা। বললে, ওই বাটিতে রাখা হয় [illegible] ভিজে।

—তারপর ?

ব্যাটারা অন্ধকার সইতে পারে না। গ্যাস ছাড়তে থাকে। বেলুন ফুলে উঠে আকাশে উড়ে যায়।

—নিচে নামা যায় কি ভাবে ?

—এই যে দড়িটা দেখছো, এটাকে ধরে টান মারলেই গ্যাস বেরিয়ে যায় ভালভ দিয়ে। বেলুন নেমে আসে নিচে।

—বুঝলাম। বেলা বাড়ছে, হরিশ। এবার ওড়াও বেলুন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার উড়ুক বেলুন।

গোল-ঘরের পেছনে মস্ত বড় একটা দরজা খোলাই ছিল। ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল বিশাল উঠোন। বেলুন ছ-টাকে সেখানে নিয়ে গেল অনুচরেরা। একটা বেলুনের বাটিতে স্পঞ্জ রেখে জোড়ের মুখ দড়ি টেনে বন্ধ করে দিতেই ফুলে উঠল বেলুন। দু'মিনিটেই ভেসে উঠল চারফুট উঁচুতে। তলার দড়িটা খুঁটিতে বেঁধে হরিশ বললে,—নিপুল, ছাদে যাও। দ্যাখো ব্যাটারা এসে গেল কিনা। অন্য কেউ গেলে হবে না।

—তা ঠিক, বলে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেল নিপুল।

চারপাসের রাস্তাঘাট কালো হয়ে গেছে মাকড়সায়। অগুন্তি মানুষও ভিড় করেছে পথে পথে। ছোট রাস্তা, বড় রাস্তা, সরু গলি, চওড়া গলি—সর্বত্র ছেয়ে গেছে মানুষ আর মাকড়সায়। ফাঁক নেই কোথাও। কেউ কিন্তু নড়ছে না। নিশ্চুপ প্রত্যেকেই।

ওরা দেখতে পেয়েছে নিপুলকে। বৈরী ইচ্ছাশক্তির শৈত্যবোধ কনকনে হাওয়ার মত বারে বারে ঝাপটা মেরে যাচ্ছে সর্বাঙ্গে। প্রবল

শীতে লোম খাড়া হয়ে যায় যেভাবে, ওরও প্রতিটি লোমকূপে রোমাঞ্চ জাগছে ঠিক সেইভাবে।

কিন্তু ওরা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে কেন ? বুঝতে পারে না নিপুল।

নিচের উঠোন থেকে ফুলে দুলে ছাদ পর্যন্ত উঠে এল একটা বেলুন। তলার দোলনায় তিনজনে তিনজোড়া পা এক করে বসে মুখোমুখি। দড়ি কেটে দিল হরিশ। এক লাফ মেরে আকাশে উড়ে গেল ফিকে নীল রঙের বিচিত্র বেলুন। তারপরেই হাওয়ার ঝাপটায় নীল বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল নীল আকাশে।

চোখ নামালো নিপুল। রাস্তার মানুষ আর মাকড়সারা এবার চঞ্চল হয়েছে। সবার চোখ আকাশের দিকে।

হরিশের চিৎকার শোনা গেল ঠিক সেই সময়ে,—যা, যা, উড়ে যা, উড়ে যা—বাড়ির মাথায় গিয়ে দড়ি টেনে নেমে পড়বি। মাকড়সা দেখলেই কোতল চালাবি—দেরি করলেই মরবি।

নিপুলের মাথা ঘেঁষে উড়ে গেল দ্বিতীয় বেলুন। আবার ছটফটিয়ে উঠল নিচের মানুষ আর মাকড়সার জনতা। কিন্তু ওরা এখনও তেড়ে আসছে না কেন ? ধাঁধায় পড়ে নিপুল।

একে একে উড়ে গেল আরও তিনটে বেলুন। উত্তরোত্তর চাঞ্চল্য বাড়ছে রাস্তায় রাস্তায়। তবুও কেউ ধেয়ে আসছে না দরজা লক্ষ্য করে। তবে প্রবলতর হচ্ছে বিদ্বেষের শৈত্যবোধ। মুহুর্মুহু ঝাপটা মেরে যাচ্ছে নিপুলের সর্বাঙ্গে। চিন্তা-দর্পণ স্থির রেখেছে ওর মস্তিষ্ককে।

হেঁকে উঠল হরিশ উঠোন থেকে,—নিপুল, নেমে এসো।

হেঁকেই জবাব দিল নিপুল,—সব ঠিক হলে তবে ডাকবে।

মিনিট কয়েক পরে আবার হাঁক দিল হরিশ,—কই হে !

দুর দুর করে নেমে এল নিপুল। নামতে নামতেই শুনল দমাদম করে ধাক্কা পড়ছে বাইরের দরজায়। বেগে বেরিয়ে এল উঠোনে। বেলুন তখন চারফুট ওপরে ভাসছে। হরিশ উঠে পড়েছে বেলুনে। দড়ি ধরে ঝুলে ঝুলে উঠতে উঠতে নিপুল দেখলে ছাদে আর্বিভূত হয়েছে একটা লোমশ মাকড়সা।

দড়ি কাটছে হরিশ। আধখানা কাটা হতে না হতেই ছাদ থেকে মাকড়সাটা লাফিয়ে নেমে এল বেলুনের মাথায়। হেলে পড়ল বেলুন। খোলা দরজা দিয়ে পিল পিল করে মাকড়সা ঢুকছে উঠোনে।

রাগের চোটে কোতল বের করে দড়িতে ঠেকিয়ে বোতাম টিপে দিল হরিশ। নিমেষে ঝটকান মেরে বেলুন ছিটকে গেল ছাদ ঘেঁষে। আর মাকড়সা লাফ দিল বেলুন লক্ষ্য করে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আট-পা ছড়িয়ে আছড়ে পড়ল উঠোনে। ছাদের মাকড়সাটাও তাল সামলাতে না পেরে ছিটকে গেল ছাদে।

হাওয়ার টানে বেলুন ধেয়ে গেল গুবরে শহরের দিকে। মাকড়সা শহরের এলাকা ছাড়াতে না ছাড়াতেই কেল্লাবাড়ির মাথায় ধক্ করে লাফিয়ে উঠল একটা কমলা রঙের পিণ্ড। তারপরেই ব্যাঙের [illegible] মত ছড়িয়ে পড়ল কালো ধোঁয়া।

পরক্ষণেই আরও কয়েকটা অগ্নিপিণ্ড আবির্ভূত হল প্রথম অগ্নিগোলকের চারপাশে। ধোঁযার কুণ্ডলি আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল শহরের ওপর।

গুরুগম্ভীর বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণের আওয়াজ গুলো ভেসে এল তারপরেই। মাটি কাঁপছে, বাতাস কাঁপছে, আকাশ কাঁপছে মুহুর্মুহু নিনাদে।

বাতাসের প্রবল আলোড়ন এর পরেই আছড়ে পড়ল বেলুনের ওপর। উল্টে পাল্টে ডিগবাজি খেতে খেতে, কখনো সিঁটিয়ে গিয়ে, কখনো ফুলে উঠে নক্ষত্রবেগে বেলুন ছিটকে গেল দমকে দমকে হাওয়ার ধাক্কায়।

দড়ি আঁকড়ে ধরে খাবি খাচ্ছিল হরিশ আর নিপুল দুজনেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেলুন সিধে হয়ে যেতেই মাকড়সা শহরের দিকে তাকিয়ে চক্ষুস্থির হয়ে গেল দুজনেরই।

পুঞ্জ পুঞ্জ কালো ধোঁয়া আর ধুলোর মেঘ ঢেকে দিয়েছে গোটা শহরটাকে। ঘন ঘন প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণে কি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল গোটা শহরটা !

না, তা হয়নি। ছড়িয়ে পড়া ধোঁয়ার মেঘের মধ্যে থেকে চড়া রোদে ঝিকমিকিয়ে উঠলো সাদা ইমারত—ঠিক তার মুখোমুখি মৃত্যুরাজার কালো কুচ্ছিৎ অট্টালিকাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল ধোঁয়া আর ধুলোর ওপরে।

বিস্ফোরণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল শুধু গোলাম মহল !

নিপুল বললে,—এতক্ষণে বুঝলাম মানুষ আর মাকড়সারা কেন চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

নিকাডোর পথ চেয়ে।—মুচকি হেসে বললে হরিশ।

—তুমিও বুঝেছো ?

—আলবৎ বুঝেছি বন্ধু। তোমার মত ঘোড়েল না হলেও ঘটে কিছু বুদ্ধি আছে। রশ্মি বন্দুক ছুঁড়ে অস্ত্রগারে ঢুকতে গেছিল বিশ্বাসঘাতক নিকাডো—জান দিয়ে সেবা করে গেল প্রভুদের। দুঃখের বিষয়, অত হাতিয়ার হাত ছাড়া হয়ে গেল বোকাটার জন্যে। একি ! আবার গা-হাত-পা অসাড় হয়ে যাচ্ছে কেন !

—নিচে তাকিয়ে দ্যাখো, হরিশ।—বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে বললে নিপুল।

—ওরে সর্বনাশ ! হারামজাদারা এখানেই দাঁড়িয়ে আছে। নিকাডো তাহলে ডাহা মিথ্যে বলে গেল। ব্যাটারা পক্ষাঘাতে পঙ্গু করতে চাইছে ইচ্ছাশক্তি ছুঁড়ে। ওঃ ! ও ! ও !

সত্যিই ধাপ্পা মেরেছে নিকাডো। কালো মাকড়সারা কাতারে কাতারে গুবরে শহর ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে ঢোকেনি একজনও। লাল পেঁচানো চুড়োওলা বাড়িগুলোর চারপাশে পিল পিল করছে সবুজ পিঠওলা গুবরেরা। কালো মাকড়সা নেই কোথাও। নিচু থেকে সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করছে—কিন্তু হরিশের কাঁধ ধরে নিপুল তা ঠেকিয়ে রেখেছে।

আচমকা হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে উঠল হলিশ,—ওরে বিটলে ! ওরে খিটকেল ! ওরে নচ্ছার মাকড়সা ! দেকে নে হরিশ আর নিপুলের আকাশবাজি।

বোতাম টিপে ধরে হরিশ বসে রইল নির্বিকার ভাবে। নির্ভুল লক্ষ্যে বুলিয়ে গেল কালো কালাম্বকদের সমাবেসের ওপর দিয়ে।

ফলটা হল দেখবার মত। নিমেষে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল অজেয় মাকড়সা বাহিনী। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে ছুট্‌! যে যেদিকে পারে। মড়ারা পুড়তে লাগল, ধোঁয়া হয়ে উড়ে যেতে লাগল—কিন্তু কেউ আর সেদিকে দেখল না।

পালা ! পালা ! পালা ! নিঃশব্দ ত্রাহিত্রাহি রবে যেন উন্মাদ হয়ে গেল কদাকার কুচুটে জীবগুলো।

অট্টহাসি হেসে দড়ি ধরে টান দিল হরিশ। গ্যাস বেরিয়ে এল ভাল্‌ভ দিয়ে। সেই সঙ্গে নাকে ভেসে এল পচাগন্ধ। বেলুন নেমে এল বেলুন শহরে।

প্যাঁচানো লাল চুড়োর পাশ দিয়ে ধেয়ে গিয়ে একটা গাছের ডালপালায় জড়িয়ে গিয়ে ভূতলে অবতীর্ণ হল চ্যাপ্টা দোলনা।

হাঁচড়পাঁচড় করে বেরিয়ে এল নিপুল আর হবিশ। হৈ হৈ করে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা এসে ঘিরে ধরল ওদের। দু-পাশের বাড়ি থেকে দৌড়ে এল মেয়ে পুরুষরা।

মানুষ মহলে নেমেছে বেলুন, তাই এত উল্লাস মানুষদের। মাকড়সা-বেলুনে চেপে মানুষ আকাশবিহার করে এল- এমন ঘটনা তো কখনো ঘটেনি।

☐ পনেরো ☐

ভিড়ের মধ্যে যখন বেরোবার পথ পাচ্ছে না দুজনে, ঠিক সেই সময়ে চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। লোকজন সরে গেল দুপাশে। হেলেদুলে একটা অতিকায় গুবরে এসে দাঁড়াল হরিশের সামনে। তার ব্যাঙের মত মুখখানায় শত্রুতা বা বিদ্বেষের ছায়া মাত্র নেই - যেমনটা থাকে প্রতি মাকড়সার বিকট মুখে। তার সবুজ শক্ত খোলা থেকে সূর্যকিরণ সবুজ রশ্মি হয়ে ঠিকরে যাচ্ছে চোখ ধাঁধানো দ্যুতির আকারে। শুঁড়গুলো নেড়ে গেল সে হরিশের সামনে।

সঙ্গে সঙ্গে যেন চুপসে গেল উচ্ছল হরিশ। বিজয়োল্লাস তিরোহিত হল এক নিমেষে। রীতিমত উদ্বেগ ঘনিয়ে উঠল চোখেমুখে।

অতিকায় গুবরে ঘুরে দাঁড়াল নিপুলের দিকে। হরিশ বললে, মালিক ডেকে পাঠিয়েছে।

মালিক বলতে কাকে বোঝাচ্ছে হরিশ, তা বুঝে নিয়েছে নিপুল। গুবরেদের সর্বময় অধীশ্বরকে। ক্ষমতায় যে মাকড়সাদের মৃত্যুরাজার সমান। উৎকণ্ঠায় তাই মুখ আমসি করে ফেলেছে নিপুল।

বললে,—চলো যাই।

হরিশ বললে,—শুধু আমিই যাই।

—আমি কোথায় থাকব?

—তাহলে এসো আমার সঙ্গে।

নীল কাঁচের মত বস্তু দিয়ে তৈরি বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে সবুজ পৃষ্ঠ গুবরেদের লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল দুজনে। দুপাশে কাতারে কাতারে সববয়সী নারী আর পুরুষ চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে ওদের দিকে। একটু পরেই পৌঁছালো চৌকোনা চত্বরে। মাঝের নীল গম্বুজওলা বিশাল বাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কাতারে কাতারে মানুষ আর গুবরে। কিছু ছেলেমেয়ে গুবরেদের পিঠে উঠে বসেছে।

চওড়া সিঁড়ির ওপরেও থিক থিক করছে অগুন্তি অতিকায় গুবরে। সবুজ পাথরের টিলার মত নিস্পন্দ সকলেই। সবারই চোখ কিন্তু নিপুল আর হরিশের দিকে। যেন এই দুজনের জন্যেই বিশাল এই জমায়েত। পথ ছেড়ে দিল ওদের দেখেই। থমথমে পরিবেশ বিরাজমান চারিদিকে। ফূর্তিবাজ গুবরেরা যেন অকস্মাৎ উৎকণ্ঠায় মেজাজ আর ঠিক রাখতে পারছে না।

সিঁড়ির ওপরের ধাপে, চাতালের পর সারি সারি প্রকাণ্ড থাম। প্রত্যেকটা থামের সামনে নিশ্চল টিলার মত দাঁড়িয়ে একজন করে গুবরে প্রহরী। এদেরই একজন হরিশকে নিয়ে গেল ভেতরে। নিপুল দাঁড়িয়ে রইল প্রহরীদের মাঝে।

আধ ঘন্টা পরেই ফিরে এল গুবরে প্রহরী। শুঁড় নেড়ে নেড়ে কি যেন বললে নিপুলকে। নিপুল ওদের ভাষা জানে না। তাই চেয়ে রইল প্রশান্ত চোখে।

সিঁড়ির তলা থেকে চিৎকার করে উঠল একজন মানুষ—তোমাকে ওর সঙ্গে যেতে বলছে।

সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালো নিপুল। গুবরে প্রহরী চলেছে সামনে সামনে। নিপুল তার পেছনে। মার্বেল মেঝে পেরিয়ে এসে ঢুকল একটা বড় হলঘরে। ঘরভর্তি গুবরে চুপচাপ বসে। কেউ কিচির মিচির করছে না। অসহ্য সেই নীরবতা বুক কাঁপিয়ে দেওয়ার মত। নিপুল কিন্তু সব ভয়কে জয় করেছে, তাই আর তার বুক কাঁপছে না। হলঘরের পর একটা লম্বা অলিন্দ। এখনকার আলো তেমন জোরালো নয়। মেঝে ঢালু হয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে। মেঝেও আর মসৃণ নয়—অসমতল এবং কর্কশ। দু'পাশের দেওয়ালও রুক্ষ। দেখতে দেখতে পাতালে চলে এল সুড়ঙ্গপথ। এখন এখানে দু'পাশে তেলের লম্ফ জ্বলছে। মেঝে আর দেওয়াল মাটি দিয়ে তৈরি। গুবরেরা মাটিতেই নিরাপদ বোধ করে। প্রশান্ত চিত্তে ভাবনার গভীরে প্রবেশের জন্যে গুবরে—অধীশ্বর তার নিরালা আলয়কে বানিয়ে রেখেছে এইভাবে।

পাঁচবার মোড় নিয়ে সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে গেল একটা মস্ত দরজার সামনে। কাঠ বা ধাতু দিয়ে তৈরি দরজা নয়। ঘাস দিয়ে বানানো কপাট। দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে হরিশ। দরদর করে ঘামছে। ওদের দেখেই প্রাণপণে ঠেলে ফাঁক করল একটা পাল্লা। ভেতরে ঢুকেই শুঁড়ের সামান্য ধাক্কায় দমাস করে পাল্লা বন্ধ করে দিল গুবরে—প্রহরী। শক্তির পর্বত বললেই চলে তাকে।

পাতাল-গর্ভের এই হলঘরটা খুব বড় নয়। এখানকার সিলিং, মেঝে, দেওয়াল শক্ত মাটি দিয়ে তৈরি। সারি সারি তেলের লম্ফ জ্বলছে দেওয়ালে। আধখানা চাঁদের আকারে সাজানো পনেরোটা মাটির বেদি। তাতে বসে পনেরোটা গুবরে। এদের সামনে মুখোমুখি বসে মালিক গুবরে স্বয়ং। অতি প্রাচীন গুবরে নিঃসন্দেহে। শক্ত বর্মতে চটা উঠে গেছে বেশ

কয়েক জায়গায়। একটা চোখে সাদাটে আস্তরণ পড়েছে। নির্নিমেষে সে চেয়ে রইল নিপুলের দিকে। নিমেষহীন সেই চাহনি দেখেই নিপুল বুঝে নিলে, অকপটে কথা বলাই শ্রেয়। মালিক—গুবরের চাহনিতে ভয়ঙ্কর শত্রুতা নেই। রক্তজমানো ইচ্ছাশক্তির বিচ্ছুরণও নেই। তবে যেন নিপুলের অন্তরের অন্দর পর্যন্ত সার্চলাইট বুলিয়ে বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে সুস্পষ্টভাবে। অবিশ্বাস্য অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী বিপুলকায় মহাবৃদ্ধ এই গুবরে। সহসা তার প্রতি বিলক্ষণ সম্ভ্রম বোধ করে নিপুল। প্রবীণ এই প্রাণীর অন্তর যে নিঠুর নির্মম নয়, তা বুঝেছে চোখ দেখেই।

শুঁড় নেড়ে নেড়ে নিপুলকে কি যেন বলে গেল মালিক। তর্জমা করে হরিশ বললে, - নিপুল, মালিক জানতে চাইছে তোমার বয়স কত?

বছর সতেরো হবে।—বললে নিপুল।

এ দেশে এসেছো কেন ? -মালিকের আবার শুঁড় নাড়ার তর্জমা করে দিলে হরিশ।

—ধরে এনেছে বলেই এসেছি। বাবাকে খতম করেছে মাকড়সারা।

কিছুক্ষণ আর প্রশ্ন করল না মালিক। তারপর বললে ঃ

—পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চাও ? যে মাকড়সা তোমার বাবাকে মেরেছে, তাকে খুন করতে চাও ?

না।—সত্যি কথাই বললে নিপুল।

—দুনিয়ার সব মাকড়সার ওপর বদলা নিতে চাও ?

—বদলা চাই না, স্বাধীনভাবে থাকতে চাই।

— মাকড়সারা যদি তোমাকে শান্তিতে থাকতে দেয়, খুশি হবে ?

—না।

—কেন না ?

জবাবটা কিভাবে দেবে ভাবছে নিপুল, এই সময়ে দেখল হরিশ একই প্রশ্ন আউড়ে যাচ্ছে কানের কাছে। তার মানে, মালিক-গুবরের চিন্তার কথা এখন সরাসরি বুঝতে পারছে নিপুল —দোভাষীর দরকার আর নেই। এ রকম অভিজ্ঞতা এর আগে হয়নি নিপুলের। মৃত্যুরাজা অথবা বিস্পে মাস্টারের টেলিপ্যাথিতে নিক্ষিপ্ত কথাগুলো যেমন বুকের মধ্যে অথবা মাথার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল, মালিক-গুবরের কথাগুলো যেন কানে শুনছে নিপুল। দোভাষীর প্রয়োজন মিটে গেল এরপর থেকেই।

নিপুল বললে,—নিজের দেশেও আমরা স্বাধীন নই। প্রাণের ভয়ে গর্তে লুকিয়ে থাকতে হয়। মাকড়সারা রেহাই দেয় না সেখানেও।

—তোমার দেশের সবাইকে যদি স্বাধীনভাবে থাকতে দেয় মাকড়সাবা, খুশি হবে কী ?

মালিক-গুবরে এবার আর শুঁড় নাড়ছে না। হরিশ তাই কিচ্ছু বুঝতে পারছে না, শুনতেও পাচ্ছে না। মালিকের মনের কথা শুনতে পাচ্ছে কেবল নিপুল।

—না, খুশি হব না। কেন না, চাকর বাকর আর গোলামদের সঙ্গে কি ধরনের নৃশংস ব্যবহার করে এই মাকড়সারা— তা আমার নিজের চোখে দেখা। ওদের আমি বিশ্বাস করি না। স্বদেশেও তাই সুখে থাকতে পারব না।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে কিচির মিচির গুঞ্জন আরম্ভ হয়ে গেল পনেরোজন সভাসদ গুবরেদের মধ্যে। মালিক-গুবরে কেবল মুখোশের মত মুখ ফিরিয়ে রইল নিপুলের দিকে। ব্যাপার কি ঘটছে, তা ঠাহর করতে না পেরে উদ্বেগে মুখ কালো করে ফেলেছে হরিশ।

মিনিট কয়েক পরে ঘর আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

মালিক-গুবরে, বললে, - তোমার কথায় আমরা বিচলিত বোধ করছি। মাকড়সাদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। তোমাকে তাদের হাতে তুলে দেব না কেন—তার পক্ষে কোনো যুক্তি দেখাতে পারবে ?

চিন্তা-দর্পণকে বুকের দিকে ঘুরিয়ে দিল নিপুল। মাথায় উচিত জবাবটা এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

বললে,—এক সময়ে এই পৃথিবীর অধীশ্বর ছিল আমার জাতভাইরা। এখন আমরা হয় পলাতক, নয় গোলাম। হয়তো সেইটাই আমাদের প্রাপ্য। আমাদের দুর্বলতার শাস্তি। অনেকেই গোলাম হয়ে বেশ সুখে আছে। সেটা তাদের পছন্দের ব্যাপার। আমাকেও গোলাম হতে বলা হয়েছিল। কিন্তু আমি দেখছি, আমার পক্ষে তা অসম্ভব। মাকড়সারা বাবাকে খুন করেছে বলেই যে গোলাম হতে চাইছি না তা নয়। আমি গোলাম হওয়ার জন্যে জন্মাইনি। স্বাধীনভাবে থাকবার জন্যেই এসেছি এই পৃথিবীতে।

শেষের কথাগুলো বেশ দৃপ্ত ভঙ্গিমায় বলে গেল নিপুল। কিন্তু আবেগের ছিটেফোঁটাও রাখল না কণ্ঠস্বরে। নিখাদ ঘটনাকে নগ্ন আকারে গুছিয়ে হাজির করল মালিক-গুবরের নিমীলিত নয়নের সামনে।

কিন্তু তুমি তো স্বাধীন ভাবেই রয়েছো। বেঁচে থাকা মানেই স্বাধীন ভাবে থাকা। —বললে মালিক-গুবরে।

ওইরকম স্বাধীনতা গুবরে আর মাকড়সাদের পক্ষে পরম সুখের ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু মানুষের কাছে নয়। আমরা চাই স্বাধীন কাজকর্ম। – থেমে থেমে সুস্পষ্ট উচ্চারণে বলে গেল নিপুল।

—স্বাধীন কাজকর্ম ! তার মানে ?

--আমাদের মনের কাজ শরীরের কাজের মতই স্বাধীন থাকবে। সব মানুষই তাই চায়। স্বাধীনভাবে ভাবনাচিন্তার অধিকার। শুধু বেঁচে থাকাটা কোনো মানুষের কাছে একমাত্র চাওয়া নয়।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর মালিক-গুবরে বললে,—তোমার কথার মধ্যে হয় গভীর পাণ্ডিত্য আছে, অথবা ডাঁহা উজবুকের মত বরফট্টাই মেরে যাচ্ছো। অন্ততঃ আমার মাথায় ঢুকছে না তোমার কথার অর্থ। স্বাধীন তো আমরা প্রত্যেকেই। আমি যেমন স্বাধীন, তুমিও তেমনি। এ ছাড়া আবার স্বাধীনতা হয় নাকি ?

- তাহলে আমি এখন যেতে পারি ?

না। এখনও সে সিদ্ধান্তে আসিনি। মাকড়সা রাজার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।—বলেই গুবরে প্রহরীকে ইশারা করে বললে মালিক-গুবরে ঃ নিয়ে এসো মাকড়সা রাজাকে।

স্তম্ভিত হয়ে গেল নিপুল। নিঃসীম আতঙ্কে খিঁচে ধরল হাত-পায়ের মাংসপেশী। হরিশের মুখের দিকে চেয়ে তার মুখে কিন্তু ভাবান্তর দেখতে পেল না। হরিশ তাহলে জানত মৃত্যুরাজা রয়েছে এই বাড়িতেই। তাই আমসি মুখে চেয়ে রয়েছে মেঝের দিকে। তাই অত মানুষ আর মাকড়সা জড়ো হয়েছে বাইরে। তাই সবাই এত উদ্বিগ্ন।

অপরিসীম প্রচেষ্টায় উথালি পাথালি হৃদ্‌যন্ত্রকে শান্ত করে আনল নিপুল। কিন্তু রক্তোচ্ছ্বাস অনুভব করল হাত আর পায়ের আঙুলের ডগায়। রক্তের চাপে আঙুল যেন ফেটে যেতে চাইছে। দপদপ করছে প্রতিটি শিরা আর উপশিরা। আর কোনো আশা নেই। মৃত্যুরাজাকে এখানে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে নিশ্চয় কোনো শর্তে শান্তি ক্রয় করার জন্যে। সময় যাবে বটে—কিন্তু শান্তির দাম তাকে দিতেই হবে।

দরজা খুলে গেল। গুবরে-প্রহরী ঢুকল প্রথমে—পেছনে শুচিতা।

মৃত্যুরাজা কোথায় ? দরজা বন্ধ করে দিয়েছে গুবরে-প্রহরী। ধীর চরণে এগিয়ে এসে নিপুলের পাশে দাঁড়িয়েছে শুচিতা। মুখ তার পাথরের মত কঠিন। নিপুলকে যেন চিনতেও পারছে না। এ যেন আর এক শুচিতা। মাকড়সা-শহরে প্রবেশের পর যে মেয়েটা নিতান্ত আপনজনের

মত নিপুলকে কাছে টেনে নিয়েছিল—সেই শুচিতা আর এই শুচিতার মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ রয়েছে।

বসুন মৃত্যুরাজা।' -বললে মালিক-গুবরে।

—দাঁড়াতেই ভাল লাগছে।

ফ্যাল ফ্যাল করে শুচিতার মুখের দিকে চেয়ে রইল নিপুল। কথাগুলো ঠোঁট নেড়ে নেড়ে বলে গেল শুচিতা। কিন্তু গলার আওয়াজটা তার নয়— মৃত্যুরাজার !

কথা বলার সঙ্গে শুচিতার মুখের চেহারাও পাল্টে গেছে। প্রাচীনার মুখের মতই এখন তা কঠোর ভাবলেশহীন।

অভিনন্দ জানাই মৃত্যুরাজাকে। - মালিক-গুবরে বললে অদ্ভুত হিস্-হিসে ভাষায়। নিপুল কিন্তু বুঝতে পারছে প্রতিটি বর্ণের অর্থ।

প্রতি-অভিনন্দন জানাচ্ছি। —ধীর কণ্ঠে বললে মৃত্যুরাজা।

—হবিশের সঙ্গে কথা বললাম। আপনার অভিযোগ সে মেনে নিয়েছে। অনুমতি ছাড়া আপনার শহরে ঢোকার জন্যে সে অনুতপ্ত। তবে একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই গেছিল -বিস্ফোরকের সন্ধানে।

অনুমতি ছাড়া কোনো কাজ করার অধিকার নেই চাকরবাকরদের। বললে মৃত্যুরাজা।

—হরিশ বলছে, বিস্ফোরক পণ্ডিত হিসেবে এ অধিকার তার আছে। আমরা কিন্তু এ অজুহাত মানতে রাজী নই।

– মাকড়সা নিধনের অধিকারও কি তার আছে ?

-মোটেই না। আইন বলছে, গুবরে অথবা মাকড়সাদের গায়ে হাত তুলতে পারবে না কোনো মানুষ।

—আইন যে ভাঙবে, তার শাস্তি কী ?

– মৃত্যু।

- এই সাজা দিতে প্রস্তুত আপনি ?

—যদি চাপ দেন—নিশ্চয় তাই হবে।

—সাজাটা নিজেরা দেবেন, না, আমাদের হাতে তুলে দেবেন হরিশকে ?

—আপনাদের হাতে তুলে দেব।

—এই অপরাধ করেছে আরও একজন। তার শাস্তি কি হবে ?

-- সে গোলাম নয়, কয়েদীও নয়। পালানোর অধিকার তার আছে।

মাকড়সা নিধনের অধিকারও কি তার আছে ?

—তার যুক্তি অনুসারে, মাকড়সারা তার বাবাকে খতম করেছে। মাকড়সা জাতটা তার পরম শত্রু। যুক্তিটা আমার মনে ধরেছে।

—কিন্তু সে নিজেই তো মাকড়সাদের শত্রু। আপনি আমাদের মিত্র। সুতরাং আমাদের শত্রুকে আমাদের হাতে তুলে দেওয়াটাই আপনার কর্তব্য।

—মানলাম। কিন্তু মতান্তর দেখা দিয়েছে আমার সভাসদদের মধ্যে। তাঁরা বলছেন, চুক্তিপত্র অনুসারে আমরা কেউ কাউকে আক্রমণ করব না। কারও ঝগড়ায় নাক গলানোর অধিকার চুক্তিপত্রে নেই।

—সেটা কিন্তু বন্ধুর কাজ নয়।

—বন্ধুত্ব অথবা অবন্ধুত্বের প্রশ্নই উঠছে না। আইন যা বলছে, তার বাইরে আমরা যেতে পারি না।

—মাকড়সাদের পরম শত্রুকে তাহলে রেহাই দিতে চান ?

মৃত্যুরাজার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে লক্ষ্য করে আশ্বস্ত হয় নিপুল—অধীরতা মানেই দুর্বলতা।

— এখনও সে সিদ্ধান্তে আসিনি। আপনার বক্তব্য শোনবার পর বসব আলোচনায়।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর বললে মৃত্যুরাজা,—মন দিয়ে শুনুন। এই মানুষ জীবগুলো এককালে পৃথিবীর অধীশ্বর ছিল। তখন আমাদের পূর্বপুরুষরা চেহারায় এত ছোট ছিল যে আমাদের দিকে খুব বেশি কুনজর দিতে পারেনি। কিন্তু নিজেরাই মারামারি করে মরেছে। পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখতে পারেনি কোনো দিনই। ঈশ্বর তিতিবিরক্ত হয়ে শেষকালে আমাদেরই পৃথিবী শাসন করার অধিকারটা দিলেন। সেই থেকে শান্তি রয়েছে দুনিয়ায়।

—আপনারা চাকরবাকরদের আশ্রয় দিয়ে মাথায় তুলেছেন। আমাদের মধ্যে ঝগড়টা হয়েছিল সেই কারণেই। চুক্তির পর ঝগড়ার অবসান ঘটে। তখন থেকেই ঠিক হয়, স্বাধীনভাবে থাকতে দেবেন না চাকরবাকরদের। সেই থেকে আমরা পরস্পরের বন্ধু ঠিক কিনা ?

ঠিক।—বললে মালিক-গুবরে।

—ঝগড়টা নতুন করে শুরু হোক, এটা কেউই চাইনা। আপনাদের এবং আমাদের উভয়ের স্বার্থেই বলব—চাকর থাকুক চাকরদের জায়গায়। আপনি হয়ত বলতে পারেন, একটা শত্রু মানুষকে স্বাধীনভাবে থাকতে দিলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু মানুষরা যেদিন থেকে আমাদের

গোলাম থাকবে না, সেইদিন থেকে জানবেন পৃথিবীতে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসবে। কেননা, শান্তিতে থাকতে জানে না এই জীবগুলো। পৃথিবীর মালিক না হওয়া পর্যন্ত এবং আপনাদের আর আমাদের গোলাম না বানানো পর্যন্ত একটার পর একটা অশান্তি সৃষ্টি করে যাবেই। তাই কি চান আপনি ?

উত্তর একটাই।—অধীর গলায় বললে মালিক-গুবরে ঃ অবশ্যই কেউ তা চাই না। কিন্তু আপনার যুক্তির ধারা অনুসরণ করতে আমি অপারগ। একজন মাত্র কিশোর মানুষকে মুক্তি দিলেই পৃথিবী রসাতলে যাবে—এই উদ্ভট ধারণায় সায় দিতে পারছি না। ওইরকম রোগাপটকা চেহারার জীব কখনো বিপজ্জনক হতে পারে না।

—ভুল করছেন সেইখানেই। এই ছোঁড়াই হরিশকে বুঝিয়ে নিয়ে গেছে আমাদের শহরে।

হরিশের দিকে তাকায় মালিক-গুবরে,—কথাটা সত্যি ?

কেশে গলা সাফ করে হরিশ বললে,—মনে তো হয় না।

নিপুলকে শুধোয় মালিক-গুবরে,—তোমার কি মনে হয় ?

না।—সাফ জবাব দিয়ে দেয় নিপুল।

মৃত্যুরাজা বললে,—ওকে জিজ্ঞেস করুন, গলায় কি ঝুলিয়ে রেখেছে ?

নিপুলের দিকে তাকায় মালিক-গুবরে,—কি ঝুলিয়েছো গলায় ?

চকিতে মনে পড়ে যায় নিপুলের—হরিশের গোঁয়ার্তুমি ভাঙতে শরণ নিয়েছিল এই চিন্তা-দর্পণের। মৃত্যুরাজা ধরেছে ঠিক।

জামার ভেতরে হাত গলিয়ে আশ্চর্য কবচকে বাইরে টেনে আনল নিপুল।

দাও আমার হাতে।—বললে মালিক-গুবরে।

কবচ হাতছাড়া করতে মন চাইল না নিপুলের। কিন্তু এখানে এখন অবাধ্যতা মানেই মৃত্যু। তাই গলা গলিয়ে কবচ খুলে এনে বাড়িয়ে ধরল সামনে। শুঁড়ে করে টেনে উল্টেপাল্টে দেখে বললে মালিক-গুবরে,—চিন্তা-বর্ধক কবচ। আমাদের মিউজিয়ামে আছে।

বলে নিপুলকে তা ফিরিয়ে দিয়ে বললে,—হরিশের চিন্তায় প্রভাব বিস্তার করার জন্যে কি এই জিনিস কাজে লাগিয়েছিলে ?

—সঠিক মনে করতে পারছিনা।

'হ্যাঁ' অথবা 'না'—এই দুটো জবাবকেই এড়িয়ে গেল নিপুল।

মৃত্যুরাজার দিকে চোখ তুলে বললে মালিক-গুবরে,—আপনার কি বিশ্বাস, এ কাজ ও ইচ্ছে করেই করেছে ?

—সে বিশ্বাস আছে বলেই বলছি। ছোঁড়া ভয়ানক বিপজ্জনক।

একটু বিরতি দিয়ে বললে মৃত্যুরাজা, —সভাসদদের সিদ্ধান্ত নিতে কতক্ষণ লাগবে ?

—তা বলা মুশকিল। তবে বেশি দেরি হবে না।

—তাহলে শেষ কথাটা বলে যাই। আমাদের এই শত্রুকে যদি মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে যুদ্ধ লাগবেই।

মালিক-গুবরে নির্নিমেষে চেয়ে রইল মৃত্যুরাজার চোখের দিকে। চোখে চোখে টক্কর লেগেছে দুই অতিশক্তির। সভাসদদের সামনেই হুমকি দিয়েছে মৃত্যুরাজা। মালিক-গুবরে অসম্ভব রেগেছে সে জন্যে। কিন্তু পরের কথায় উষ্মা প্রকাশ পেল না একটুকুও,--আপনি বলতে চান, মাকড়সারা যুদ্ধ শুরু করবে গুবরেদের সঙ্গে ?

– আমি বলতে চাই, সঙ্গীন মুহূর্তে জ্ঞানবান কখনো নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না।

– মানে ?

– এখনই তো কাজেব সময়।

বলেই আচমকা দু'হাতে নিপুলেব গলা টিপে ধরল শুচিতা ওরফে মৃত্যুরাজা।

শেষ কথাটা শুনে সচকিত হয়েছিল বলেই পাশ থেকে ছিটকে সরে গিয়েছিল নিপুল। মৃত্যুবাজার সাঁড়াশিব মত আঙুল তাই কণ্ঠনালীর ওপরে না বসে সরে গেল চোয়ালের হাড়ের নিচে। জায়গাটা নিমেষের মধ্যে ফেটে পড়ল দশখানা আঙুলে' মধ্যে। কণ্ঠানালীটা ছিঁড়ে গেল না বটে, কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণায় চোখে ধোঁয়া দেখল নিপুল। গোটা শরীরটা একঝটকায় শূন্যে উঠে গেল। পরমুহূর্তেই . . .

ঘোর কেটে গেল হরিশের হাতের স্পর্শে। দু'হাতে ওকে জাপটে ধরে মাটি থেকে তোলবার চেষ্টা করছে হরিশ।

শুচিতা পাশে নেই। প্রাণহীন দেহ' বিকৃত ভঙ্গিমায় লুটিয়ে রয়েছে মেঝের ওপর। মুণ্ডুখানা ধড় থেকে প্রায় ছিঁড়ে এসেছে। খুলি চুরমার হয়ে গেছে। মাথার ঘিলু ছিটকে পড়ছে দেওয়ালে।

নিপুলের সামনে দাঁড়িয়ে গুবরে প্রহরী। হতচকিতভাবে তাকিয়ে মৃতদেহটার দিকে। ঝটকান মেরে গলা টিপুনি ছাড়িয়ে নিয়ে দেওয়ালে

আছাড় মেরেছিল সে ক্ষণিকের উন্মাদনায়। এতটা শক্তির প্রকাশ পাবে, নিজেও ভাবতে পারেনি নিপুল।

হরিশ ধরে দাঁড় করিয়ে দিল নিপুলকে। নিপুল পায়ে জোর না পেয়ে ফের বসে পড়ল মাটির মেঝেতে। কানে ভেসে এল হিস্-হিস্ কিচির-মিচির শব্দে, বিষম উত্তেজিত ভাবে কথাবার্তা চলছে সভাসদদের মধ্যে। আচ্ছন্নের মতো মালিক-গুবরের দিকে চেয়ে রইল নিপুল।

শুঁড় নেড়ে গুঞ্জন স্তব্ধ করে দিয়ে বললে মালিক-গুবরে,—বন্ধুগণ, এইমাত্র যা দেখলেন তা চরম বিশ্বাসঘাতকতা সভা অবমাননার ঘটনাও বটে। যে কয়েদী আমাদের আশ্রিত, একটু আগেই তাকে হত্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেল কুচক্রী মৃত্যুরাজা। এর ফলে আমাদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত করলাম মাকড়সাদের। কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই এখন।

কথা বলতে গেল নিপুল। কিন্তু গলা দিয়ে বেরোলো খানিকটা কর্কশ আওয়াজ। তবে তার চিন্তা ছুঁয়ে গেছে মালিক-গুবরেকে। কথার আর প্রয়োজন নেই।

নিপুলকে বললে মালিক-গুবরে,—যেখানে খুশি যেতে পারো। তোমার স্বাধীনতা হরণ করার অধিকার আমাদের নেই। তবে আমার উপদেশ যদি নাও, তাহলে নিজের দেশে ফিরে যাও। এখন থেকে মাকড়সারা তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াবে ধ্বংস না করা পর্যন্ত। ওদের সেই প্রচেষ্টা সফল হলে সবচেয়ে বেশি দুঃখ পাব আমি। ওদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম—তোমার স্বাধীনতা। যাও।

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেল নিপুল। পাশ থেকে ধরে নিল—হরিশ।

সমাপ্ত